প্রথম প্রকাশ
১৫ই বৈশাখ ১৩৫৮
২৮শে এপ্রিল ১৯৫১

প্রকাশক
দেবকুমার বসু
৬ বঙ্কিম চাটার্জি ষ্ট্রীট.
কলিকাতা-১২

প্রচ্ছদ
গণেশ বসু

মুদ্রাকর
শ্রীসুশীলকুমার ঘোষ
মা মঙ্গলচণ্ডী প্রেস
১৪বি, শঙ্কর ঘোষ লেন,
কলিকাতা-৬

চার টাকা

আহির ভৈরোঁ

শ্রীপারাবত

AHIR BHAIRON

A Novel by

SREE PARABAT

ছোট-মামীমাকে

এই লেখকের :

ঝড় থামবে

আমি সিরাজের বেগম

স্বর্ণালী সন্ধ্যা

যে জীবন দীন

সীমান্ত থেকে পশ্চিমে পাঁচ মাইল হাঁটলে সাগরখালি নদীর ধারে ছায়াশীতল হংসপুর গ্রাম। ঘোষপ্রধান এ গ্রামের লোকেদের উপজীবিকা আশেপাশের আর পাঁচটা গ্রামের অধিবাসীদের মত চাষবাস, গো-পালন আর মুনিষ-খাটা হলেও, এদের বৈশিষ্ট্য এই যে এরা একেবারে নিরক্ষর নয়। জগবন্ধু পণ্ডিতের পাঠশালা পঁচিশ বছর আগে একদিন যেমন হঠাৎ খুলেছিল, দশ বছর আগে তেমনি হঠাৎ বন্ধ হয়ে গেলেও সেদিনের সে শিক্ষাধারা আজও শুকিয়ে যায়নি। তাই বৃদ্ধ আর বয়স্ক স্ত্রীলোকদের কথায় গ্রাম্য ছাপ থাকলেও এখানকার যুবকদের ভাষা মার্জিত। পাঠশালার দৌলতে কোন ঘোষের-পো কেউ-কেটা হয়নি বটে, কিন্তু তাদের চিন্তাধারা সাধারণের চেয়ে যে একটু স্বতন্ত্র এ বিষয়ে তারা সচেতন আর গর্বিত।

দেশবিভাগের আঁচ হংসপুর গ্রামেও এসে লাগে; কারণ দেশ-বিভাগের লাইনটা গ্রাম থেকে বেশী দূরে নয়—যা ম্যাপের ওপর দেখা যায়। লাইনটা ম্যাপের ওপরই টানা হয়েছিল, দেশের ওপর নয়। তাই, মৈজুদ্দিনের বাস্তুভিটে আর অবনী মণ্ডলের ক্ষেত দেখার প্রয়োজন হয়নি লাইন টানার সময়। মৈজুদ্দিনের রান্নাঘর লাইনের ওপারে আর শোবার ঘর এপারে। অবনী মণ্ডলের

সামান্ত কয়েক বিঘে ধেনো-জমি এপারে, বাদবাকী সব ওপারে। প্রিয়নাথের বসতবাড়ি এপারে আর পুকুর ওপারে।

নির্মম লাইন। লোককে হাড়ে হাড়ে জানাচ্ছে যে দেশটা ভাগ হ'লো। কিন্তু বাড়ি-ঘর দেখবে না, জোত-জমির দিকে তাকাবে না সোজা দাগ টেনে দেবে, এ বড় মুশকিলের কথা। দেশ ভাগ হোক ক্ষতি নেই। একদিকে থাকলেই হলো। কিন্তু একটু দেখে শুনে ভাগ করুক। মৈজুদ্দিনের রান্নাঘর যে থানায় পড়েছে, শোবার ঘর নাকি সে থানায় নয়। শোনো কথা। আবার শুধু থানাই নয়,—মহকুমা, জেলা, এমন কি রাজ্যই নাকি আলাদা। রান্না ঘরের এক রাজা আর শোবার ঘরের অন্য রাজা—এমন কথা বাপের জন্মে শুনেছে কেউ?

বৃদ্ধেরা শুনে হেসেছিল। বলেছিল, সব বাজে কথা। তিন কুড়ি, চার কুড়ি বয়স হ'তে চলল এক একজনের—তারা কখনো এমন শোনেনি। সম্ভব অসম্ভব ব'লে একটা জিনিষ আছে তো!

কিন্তু দুদিন পরেই টের পাওয়া গেল যে অসম্ভবই সম্ভব হয়। দুদিকে দুরকম পুলিশ এলো—তাদের পোষাক-পরিচ্ছদ সব আলাদা। মৈজুদ্দিনের শোবার ঘরে এদিককার সিপাই এসে বিশ্রাম করে, তার রান্নাঘরে ওদিককার পুলিশ এসে পানি খেয়ে যায়। মৈজুদ্দিন হতভম্ব—কাকে যে তুষ্ট করবে বুঝে উঠতে পারে না। রান্নাঘর আর শোবার ঘর দুটোরই সমান দরকার। সে দুপক্ষের সিপাইদেরই তুষ্ট করে।

এসব ব্যাপার অনেকটা স্বাভাবিক হ'য়ে এলো—বিশেষ করে হংসপুরের অধিবাসীদের কাছে। কারণ তাদের গ্রামখানা আস্তই আছে। মৈজুদ্দিন আর অবনী মণ্ডলের মত তাদের কপাল

খারাপ নয়। তাদের গ্রামের পরেও আরও কত গ্রাম পার হ'য়ে তবে তো 'বডার'। সীমানাকে সবাই 'বডার' বলতে শিখেছে। আসলে 'সীমানা' কথাটা তত না বুঝলেও 'বডার' কথার যা অর্থ তার একটা স্পষ্ট ছাপ তাদের মনের মধ্যে আছে। একটু সুবিধে পেলেই নতুন শেখা কথাটা তারা ব্যবহার করে। গুয়োবাড়ির হাট সীমান্তের কাছে। তারা 'হাটে যাচ্ছি' না বলে, বলবে 'বডারে যাচ্ছি'। ফলে, সীমান্তের গ্রামগুলোর যে নাম ছিল, সে নামের ব্যবহার কমে গিয়ে, এক এবং অবিচ্ছিন্ন নাম হ'লো 'বডার'।

হংসপুরের হরেকেষ্ট ঘোষ বর্ডার থেকে ফিরছিল। বর্ডারে তার শ্বশুরবাড়ি। হরেকেষ্টর সংগে তার সাত বছরের বউ খুদি। খুদির সিঁথিতে চওড়া সিঁদুর আর কপালে বড় গোল টিপ। লাল রঙের শাড়ী পরে আলতা পায়ে সে স্বামীর সংগে পাল্লা দিয়ে চলার চেষ্টা করছিল, কিন্তু চলতে পারছিল না। একে চৈত্র মাস তার ওপর সময়টা ছিল দুপুর। শ্বশুরবাড়ির নিষেধ না শুনেই এই অসময়ে হরেকেষ্ট যাত্রা করেছে। আর কিছু সে না মানুক, বৃহস্পতিবারের বারবেলাটা মানে। জগবন্ধু পণ্ডিতের কাছ থেকে সময় জেনে নিয়ে গিয়েছিল। তাই বারবেলা সুরু হবার আগেই শ্বশুরের ভিটে ছেড়ে রাস্তায় পা দিয়েছে।

কিন্তু খুদিকে নিয়ে মুশকিল হ'লো। লাল শাড়ীখানা উঠতে উঠতে হাঁটুর ওপর চলে এসেছে। সারা শরীর দিয়ে দরদর করে ঘাম বার হচ্ছে। সে রীতিমত হাঁপাচ্ছে। খানিক দূর গিয়ে বলে, 'জল খাবো।'

তার কথা শুনে হরেকেষ্ট চোখে সরষের ফুল দেখে। সামনে আর পেছনে ধু ধু করছে শুধু মাঠ—লোকালয় নেই। পাশে নদী থাকলেও সে নদীর জল দিতে তার সাহস হ'লো না। এগ্রামে ওগ্রামে দুধ দিতে যাবার সময় দুচারটে কলেরার খবর সে পায়। খুদিকে জল দিতে হলে আরও আধ-ক্রোশ রাস্তা হাঁটতে হবে। নিশীথগঞ্জের বটতলায় জল পাওয়া যাবে। সেখানে ইউনিয়ন বোর্ড একটী টিউবওয়েল বসিয়েছে। কিন্তু তার মুখ যেরকম লাল হয়ে উঠেছে তাতে হরেকেষ্টর ভয় হলো—সর্দি-গর্মি না হয়। শ্রীমন্ত ডাক্তারের বাবা শ্রীকান্ত তালুকদার তো সর্দি-গর্মিতে মারা গেল এবছর। একদিনের অসুখেই শেষ। ছেলে ডাক্তার হয়েও কিছু করতে পারল না। খুদির যদি অমন কিছু একটা হয়?

মাঠের চারদিকে একবার ভাল করে দেখে নিয়ে হরেকেষ্ট বলে—"কোলে উঠবি রে খুদি।"

খুদি ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

—"তো আয়। টক্ করে আয়।"—হরেকেষ্ট আর একবার মাঠের চারদিকে সন্ধানী দৃষ্টি বুলিয়ে নেয়। চেনা লোকে দেখে ফেললে কী লজ্জা।

—"বেজায় কষ্ট হচ্ছে, না রে খুদি?" তাকে কোলে নিয়ে সে বলে।

—"হুঁ"—

—"হবেই তো। যা গরম পড়েছে, আমারই আই-ঢাই অবস্থা। তুই তো বাচ্চা।"—খুদি স্বামীর গায়ের ওপর নিজেকে সম্পূর্ণ ছেড়ে দেয়। সাত বছরের শিশু তিন মাইল পায়ে চলার পর অবলম্বন পেয়ে একেবারে ভেঙে পড়ে।

একটু পরে সে ঘুমিয়ে পড়ে। হরেকেষ্ট নিশ্চিন্ত হয়। রোদ্দুর থেকে আড়াল করবার জন্যে সে তার ডান হাতখানা খুদির মাথার ওপর আলগোছে রেখে ধীরে ধীরে উঁচুনীচু আলের রাস্তার ওপর দিয়ে চলতে থাকে। জোরে চলতে সাহস হয় না, পাছে ঝাঁকি লেগে খুদির ঘুম ভেঙে যায়। ঘুম ভাঙলেই তো জল চেয়ে বসবে।

সে চারদিকে চোখ রেখে চলছিল, চেনা মানুষের ভয়ে। অচেনা লোকে তার আর খুদির সম্পর্ক আন্দাজ করতে পারবে না। কারণ তাদের বয়সের পার্থক্য বাইশ বছর। এমনটা ঘটত না, যদি তার শ্বশুর মানুষ হ'তো। কিন্তু শ্বশুর মানুষ নয়—অর্থপিশাচ। হরেকেষ্টর মনে মনে রাগ আছে শ্বশুরের ওপর।

খুদির বড় বোন উমার সংগে তার বিয়ে একেবারে ঠিক হ'য়ে গিয়েছিল। তার জন্যে সে শ্বশুরকে আগে থেকেই দুশো টাকা গুনে দিয়েছিল। কিন্তু বিয়ের রাতে শ্বশুর বলে বসল, আরও একশো টাকা দিতে হবে। শুনে সে অবাক। তেমন কোন কথা আগে হয় নি, আভাযও পাওয়া যায়নি। আভাষ পেলেও দেওয়া সম্ভব হ'তো না, গরু বিক্রি করা ছাড়া। বিয়ের জন্যে গরু বিক্রি? মরে গেলেও নয়।

শ্বশুর বলল—"তাহলি তোমার সংগে উমার বিয়ে হবি না।"

—"কিন্তু আমি যে দুশো টাকা দিলাম, তার কি হবে?"

শ্বশুর বলল—"তুমি খুদিকে বিয়ে কর। উমার ছোট সে—"

হরেকেষ্ট ভাবল, উমা রূপসী, তাই তার বেলায় টাকার চাহিদা বেশী। কিন্তু সে রূপ নিয়ে কি করবে? সে চায় শান্তশিষ্ট কাজের মেয়ে। দুই বোনের মধ্যে কে শান্ত আর কে অশান্ত তা যখন

জানে না, তখন খুদির সংগে বিয়ে হ'তেই বা আপত্তি কি। সে সংগে সংগে রাজী হয়ে গেল। সে রাজী হয়েছিল শ্বশুরের গ্রামের আরও পাঁচজন মাতব্বরের সামনে। তাই ছাতনা-তলায় যখন একটি ঘুম-কাতর শিশুকে চেলি পরিয়ে আনা হ'লো, তখন সে স্তম্ভিত হলেও প্রতিবাদ করতে পারেনি। উমার ছোট বোন্ যে এত ছোট, তা ভাবতেও পারেনি আগে। তার চোখ ফেটে জল বার হয়েছিল।

ভাঙা গলায় সে বলেছিল--"ভরা-যৌবনে যে মেয়েটা বিধবা হবে।"

"কপাল বাবা, কপাল। ওর কপাল ভাল হলি তোমার একশো বছর পেরমায় হবি।"

শ্বশুরের কথায় হরেকেষ্টর মাথায় রক্ত উঠেছিল। কিন্তু সে নিজেকে সামলে নিয়েছিল। সে তার দুর্বলতা জানত, রাগলে মাথার ঠিক থাকে না।

একজন বৃদ্ধ হরেকেষ্টর কথার জের টেনে বলেছিল—"বিধবা হ'লি ক্ষতিডা কি? আবার বিয়ে হবি। তোমার মায়ের তো আগে বিয়ে হইয়েছিল অনাদি ঘোষের সাথে।"

হরেকেষ্ট জানত সেকথা। বৃদ্ধের কথায় প্রতিবাদ করল না সে। বুঝল, শ্বশুর মশায়ের কাছ থেকে বৃদ্ধ দু'চার টাকা পাবে।

পরদিন খুদিকে নিয়ে সে চলে এসেছিল। হরেকেষ্টর বাবা অভিশাপ দিয়েছিল। বোন লক্ষ্মী কান্নাকাটি করেছিল। লক্ষ্মীর কতদিনের সাধ মনের মত বৌদি আসবে। হরেকেষ্ট যখন বুঝিয়ে বলল যে বিয়ে না করলেও টাকা ফেরত পাবার কোন আশা ছিল না, তখন তার বাবা শান্ত হ'লো। সে জানত, নতুন ক'রে

হুশো টাকা জমিয়ে বিয়ে করা এ-জীবনে সম্ভব হবে না হরেকেষ্টর পক্ষে। এ তবু বউ তো এলো—ছোট হোক্ আর বড় হোক্।

শুধু বন্ধুদের খোঁচা হরেকেষ্ট ভুলতে পারে না। খোঁচাটা সত্যি বলেই তার মনের মধ্যে গেঁথে থাকে সব সময়—আর অশান্তিতে ভেতরটা জলে পুড়ে যায়।

বন্ধুরা বলে—"ভাল ক'রে তা' দে তোর বউকে হরেকেষ্ট—হাঁস যেমন ডিমে তা' দেয়। কিন্তু মুশকিলটা কি জানিস? তা দিয়ে দিয়ে যখন তুই পাকিয়ে তুলবি, তখন তুই বুড়ো। বারভুতে পাকা জিনিসটা লুটেপুটে খাবে রে,—আহা-হা।"

প্রথম এ-কথা যখন হরেকেষ্ট শোনে তখন সে চমকে উঠেছিল। সে চমক-ভাব এখনো যায়নি। রাতের বেলাতে অনেক সময় দুঃস্বপ্ন দেখে ঘুম ভেঙে যায়। স্বপ্ন দেখে—যেন বয়েস হয়েছে তার। বসে রয়েছে দাওয়ার ওপর। নিটোল দেহখানা নিয়ে খুদি ঘুরে ঘুরে বেড়াচ্ছে বাড়ির উঠোনে। হঠাৎ একসময় তাকে দেখতে পায় না সে। খুঁজতে গিয়ে দেখে, বাড়ির পেছনে বেড়ার ফাঁক দিয়ে কার হাত চেপে ধরে হাসাহাসি করছে। লুকিয়ে দেখে, বেড়ার ওপাশে তারই বন্ধু নন্দ, যে সব চেয়ে বেশী খোঁচা দেয়। কিন্তু আশ্চর্য, হরেকেষ্টর বয়স হ'লেও নন্দর চেহারা একই রকম রয়েছে। ঘুম ভেঙে যায় তার। বুঝতে পারে স্বপ্ন। তবু রাগ আর দুঃখ মেশানো এক জ্বালা বহুক্ষণ ধরে কাঁকড়াবিছের বিষের মত তার শরীরে রি রি করে।

ঝাঁ ঝাঁ রোদ্দুর। কাঁধের ওপর মাথা রেখে তখনো ঘুমোচ্ছে খুদি। হরেকেষ্ট তাকে ধরে নাড়া দেয়, তবু ঘুম ভাঙে না। সে

আরও জোরে ঝাঁকায়। ঘুমের ঘোরে খুদি—উঁ উঁ ক'রে ওঠে।

হরেকেষ্ট ভাঙাগলায় বলে—"তুই বড় হবি না খুদি ?"

—"হুঁ"—খুদি ঘুমের মধ্যে জবাব দিয়ে কাঁধের ওপর আবার ঢুলে পড়ে।

—"তাড়াতাড়ি হ'। বুঝলি, খুব তাড়াতাড়ি"—সে যেন প্রার্থনা করছে খুদির কাছে।

নিশীথগঞ্জের বটগাছ দেখা যায়। হরেকেষ্ট ভাবে উমার কথা। এবার শ্বশুরবাড়িতে তাকে দেখল—ছেলেপেলে হবে তার। কী সুন্দর চেহারা হয়েছে—আহা! সে দীর্ঘশ্বাস ফেলে। ওই উমা তো তারই হ'তো। শুধু পাষণ্ড শ্বশুরের জন্যে হলো না। বিয়ের রাতে তিনশ টাকা পেলো চৌতুয়ারের ট্যানা ঘোষের কাছে—ব্যস্। পঞ্চাশ বছরের ট্যানা ঘোষ শুধু টাকার জোরে উমাকে ছিনিয়ে নিয়ে গেল, তেমনি শাস্তিও পেয়েছে! ছমাস হ'লো পা ভেঙে পড়ে রয়েছে বিছানায়। রুজি-রোজগার নেই। তাই পোয়াতী বৌটাকে বাপের বাড়ি পাঠিয়েছে। উমা বলেছিল, বিছানায় শুয়ে থাকতে থাকতে নাকি পিঠে ঘা হ'য়ে গিয়েছে ট্যানা ঘোষের।

উমার চোখে যেন বিদ্যুৎ খেলে। সেদিকে তাকাতে পারতো না হরেকেষ্ট, উমা যখন আনমনা থাকত তখন তাকে চোরের মত দেখে নিত সে। তবু উমা কেমন করে যেন টের পেতো। মাঝে মাঝে ঘুরে দাঁড়িয়ে হেসে যেভাবে কথা বলেছে তাতে তার লজ্জা হ'য়েছে। হরেকেষ্টর সন্দেহ হয় যে, সে আনমনা থাকার ভাণ করত। নিশ্চয় তাই। আনমনা থেকে হরেকেষ্টর হাবভাব লক্ষ্য করত।

উমার মত রূপ খুদিরও হবে। বরং তার চেয়ে ভালই হবে।

রঙটা আরও মাজা, নাক আরও তোলা, চোখদুটো আরও টানা। কিন্তু কবে হবে? তখন কি হরেকেষ্টর এ চোখ থাকবে?

নিশীথগঞ্জের বটতলার প্রায় কাছাকাছি এসে পড়ে হরেকেষ্ট। পেছনে সাইকেলের ক্রিং ক্রিং শব্দে চমকে ওঠার আগেই সাইকেল আরোহীর অট্টহাসি তার কানে এলো। নন্দ! হরেকেষ্ট বুঝলে এত সাবধান হওয়া সত্ত্বেও সে ধরা পড়ে গিয়েছে! উমার কথা ভাবতে ভাবতে অন্যমনস্ক হয়ে যাওয়ার ফল। নন্দ ফিরছে বর্ডারের ওদিক থেকে। সে প্রায়ই বর্ডারে যায়। আর একটু সাবধান হওয়া উচিত ছিল।

খুদিকে কোল থেকে নামিয়ে দিতে চায় হরেকেষ্ট। কিন্তু তার আগেই নন্দ বলে ওঠে—"থাক্ থাক্, সোহাগী বউকে আর নামাতে হবে না। পায়ে মাটি লাগবে যে।"

একে তো গরম, তার ওপর খুদিকে এতদূর বয়ে নিয়ে আসার ক্লান্তি; নন্দর বিদ্রূপ শুনে তার কান্না পেলো। বলল, "তোরা আমার বন্ধু না, শত্রু। আমার যখন কষ্ট তোরা তখন হাসিস।"

নন্দ ততক্ষণে সাইকেল থেকে নেমে তার পাশাপাশি চলছিল। সে বলল, "কি করি বল? আমাদের বন্ধু যে এমন বোকা হবে তা কি জানি? ঠিক সময়ে বিয়ে করলে তোর মেয়েও যে এর চেয়ে বড় হতো রে…"

হরেকেষ্ট কোন উত্তর দেয় না, সে জানে এরা শুধু মন্তব্য করে, সাহায্য করে না। বন্ধুদের মধ্যে একমাত্র নীলুই তার ব্যথা বোঝে। অথচ নীলু তার চেয়ে ছোট, তাকে দাদা বলে ডাকে। নীলুকে তার খুব ভাল লাগে। মায়ের ইচ্ছে ছিল নীলুর সংগে তার বোন লক্ষ্মীর বিয়ে হয়। তারও তাই ইচ্ছে। কিন্তু বাবা

গোলমাল বাধিয়েছে। শ্বশুর মশায়ের মত পয়সার দিকে নজর গিয়েছে তার। নীলুকে পছন্দ করলেও তাকে জামাই করতে রাজী নয়। কারণ নীলুরা গরীব। পরের বাড়ি মুনিষ খেটে সংসার চালায়। বাবার ইচ্ছে নন্দর সংগে লক্ষ্মীর বিয়ে হয়। নন্দর সাইকেল আছে। সে হামেশা সাইকেল চালিয়ে বিশ মাইল দূরের জেলা সহরে যায়। পয়সাও করেছে সে। কিসের যেন ব্যবসা করে নন্দ—হরেকেষ্ট ঠিক খবর রাখে না। কিন্তু পয়সার সংগে সংগে কি সব ব্যারামও হয়েছে বলে কানে এসেছে তার। নন্দ মুখে পাউডার মাখে, মাথায় গন্ধ তেল দেয়—কিন্তু তার চেহারা কেমন যেন রুক্ষ। আগে অমন ছিল না। হরেকেষ্ট দুচোখে দেখতে পারে না তাকে।

নন্দর কথার জবাব না দিয়ে সে টিউবওয়েলের কাছে এসে ধীরে ধীরে খুদিকে কোল থেকে নামায়। তার মুখের লালায় আর গায়ের ঘামে কাঁধটা চটচট করে। খুদি দাঁড়িয়েও ঢুলতে থাকে!

নন্দ হেসে বলে—"মহারাণীকে ধর। প'ড়ে যাবে যে—"

হরেকেষ্ট আস্তে আস্তে খুদিকে বলে—"এই খুদি, খুদি রে—জল খাবিনে? এই দেখ টিউ-কল।" সে টিউবওয়েলের হাতল ধরে নাড়া দেয়।

শব্দ শুনে খুদির ঘুম ভেঙে যায়। সে চোখ মেলে বলে "মা কই?"

হরেকেষ্টর কেমন যেন মায়া হয়। ভাবে, একে রেখে এলেই ভাল হ'তো। কিন্তু তার বাবার জন্যে সে উপায় নেই। বাবা বলে, বাড়ির বউ বাড়িতে থাকবে। বউ বাড়িতে না থাকলে নাকি লক্ষ্মী থাকে না।

সে খুদিকে বলে—"মা তো তোর বাপের বাড়িতে। তুই হংসপুরে যাচ্ছিস্ যে। ঘুমিয়ে সব ভুলে গিয়েছিস ?

খুদির এতক্ষণে সব মনে হয়। সে সোজা হয়ে দাঁড়ায়। পাশে নন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে, থতমত খেয়ে হরেকেষ্টর হাঁটুতে মুখ লুকোয়।

নন্দ হো হো করে হেসে ওঠে। বলে, "লজ্জা কি বৌঠান; হরেকেষ্ট আমার চেয়ে বড়। তুমি তো আমার গুরুজন।"

খুদি শক্ত করে স্বামীকে চেপে ধরে তেমনি ভাবেই মুখ লুকিয়ে রইল। হরেকেষ্ট নন্দকে বলে—"তুই একটু বটগাছের ওপাশে যাবি নন্দ ? আগে একে জল খেতে দে, তারপরে যত পারিস ঠাট্টা করিস।"

—"যাবো যাবো, নিশ্চয়ই যাবো। বাড়ির বউ, অন্যের সামনে জল খাবে কেন ?"—সে হাসতে হাসতে চলে যায়।

হরেকেষ্ট খুদিকে জল খাইয়ে তার চোখমুখ ভাল করে ধুইয়ে দেয়। মাথায় অল্প একটু জলের ছিটে দিয়ে ভাল করে মুছে নিয়ে বলে—"এবারে হাঁটতে পারবি তো ? আমার হাত ব্যথা করছে।"

খুদি ঘাড় নেড়ে বলে—"হ্যাঁ।"

নন্দ আবার এসে জোটে বট গাছের আড়াল থেকে। এবার তাকে দেখে খুদির আর লজ্জা হ'লো না। ঘুমের ঘোর কেটে গিয়েছে বলে হয়তো।

—"কি গো বৌঠান, লজ্জা ভাঙল ?"

হরেকেষ্ট বলে—"কোথা থেকে এলি নন্দ, বর্ডারে গিয়েছিলি ?"

—"হ্যাঁ, তোর মত শ্বশুরবাড়ি গিয়ে বসে থাকলে কি আমার চলে ?"

—"শ্বশুরবাড়ি গেলে আমারও চলে না। বুড়ো বাপকে কে খাটাতে চায় বল? তার ওপর হাঁপানিটা তার দিনদিনই বাড়ছে। বাড়ি বাড়ি দুধ নিয়ে যাওয়া কি কম কথা? নীলুকে সব সময় পাওয়া যায় না। সময় পেলে নীলুই করে দেয়। তুই বিয়ে করলে বরং দুদণ্ড বসতে পারতিস শ্বশুরবাড়ি। আমার তাও হয়ে ওঠে না।"

"তবে যাস কেন?"

—"যেতে হয়—"

—"কেন, অন্য কোন ব্যাপার আছে নাকি?" নন্দ তার বাঁ চোখটা বিশ্রীভাবে বন্ধ করে। আগে অমন করত না। নতুন শিখেছে।

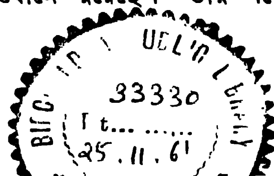
তার কথায় হরেকেষ্ট অস্বস্তি অনুভব করে। তার মনের ভেতর ভেসে ওঠে উমার মুখ। কিন্তু উমাকে সে শুধু এবারই দেখল, বিয়ের পরে আর কখনো দেখেনি। নন্দও আগে এভাবে প্রশ্ন করেনি। ওর মনটা বড় কুৎসিত। লক্ষ্মী ওর হাতে পড়লে মরবে।

—"কথা বলছিস না যে—" নন্দ চোখ নাচিয়ে প্রশ্ন করে।

—"তোর কথার উত্তর হয় না। তুই বড় খারাপ হয়ে যাচ্ছিস—"

নন্দ হেসে ওঠে। কিছুক্ষণ নীরবে পথ চলার পর সে হঠাৎ প্রশ্ন করে—"হ্যাঁরে হরে, সেই মেয়েটাকে দেখিস না তোর শ্বশুরবাড়িতে?"

হরেকেষ্ট বুঝল, সে কার কথা বলছে। তার ভয় হলো সে হয়তো জানে উমা ওখানে রয়েছে। তার পক্ষে কিছুই বিচিত্র



নয়, সাইকেলে সব জায়গাতেই ঘুরে বেড়ায়। বিশেষ করে বর্ডারের ওদিকে তো সে প্রায়ই যায়। কোন সময় হয়তো উমাকে দেখে ফেলেছে।

সে কিছু না বোঝার ভাণ করে প্রশ্ন করে—"কোন মেয়েটা ?"

—"তোর বড় শালী রে, যে তোর বউ হ'তে হ'তে হ'লো না।"

সত্যিকথা হরেকেষ্ট বলতে পারত। কিন্তু নন্দকে বলার অর্থ সে জানে। তাছাড়া উমাকে এবার দেখার পর থেকে সত্যিকথা বলার মত জোরও যেন নেই তার। তাই ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা থাকা সত্ত্বেও সে বলে—"সে ওখানে নেই। যখন ছিল তখন আমি যাইনি।"

—"গেলেই পারতিস, কিছু হ'তো।" নন্দ হাসে।

—"কি হ'তো।" হরেকেষ্টর চোখ জ্বলে ওঠে। নন্দ যেন তার মনের অতি গোপন কোণে নাক গলাতে চায়।

তার কথার ধরণে নন্দ বুঝতে পারে যে সে চটে গিয়েছে। তাকে রাগাতে সবাই ভয় পায়। তাই উড়িয়ে দেবার ভংগীতে বলে—"হ'তো আবার কি, ঠাট্টা ইয়ার্কি। শালীর সংগে মিষ্টি কথা হয় না ?"

—"ওসব আমি ভালবাসিনে।"

—"ও: তাই নাকি ? তুই কি ভালবাসিস রে হরে ? বউকে ঘাড়ে ক'রে বয়ে বেড়াতে ? তুই একটা আহাম্মক, আমি হলে বড় শালীর দিকে নজর দিতে ছাড়তাম না। শ্বশুরব্যাটা যেমন ঠকিয়েছে, কড়ায় গণ্ডায় তা পুষিয়ে নিতাম।"

নন্দর দিকে তাকাতে হরেকেষ্টর ঘৃণা হয়। সহরে গিয়ে তার শুধু পয়সাই হয়েছে, আর কিছু নয়। স্বভাবটা একেবারে নষ্ট

হয়ে গিয়েছে। এমন বিশ্রীভাবে চিন্তা করার কথা সে ভাবতেও পারে না।

সে বলে—"আমি আহাম্মক আছি, ভালই আছি নন্দ। নাহ'লে তোর মত জাহান্নামে যাবো যে।"

নন্দ সে-কথার জবাব দেয় না। সে বিন্দুমাত্র আহত হয়েছে বলেও মনে হ'লো না। তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে হরেকেষ্টর মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে কি যেন দেখল, তারপর আপন মনেই বলে উঠল—"হায় হায়।"

—"কি হ'লো।" হরেকেষ্ট একটু অপ্রস্তুত হয়। বুঝতে পারল তাকে লক্ষ্য করেই কথাগুলো উচ্চারণ করেছে নন্দ!

—"হবে আর কি, দাড়ি পেকেছে। আয়না আছে বাড়ীতে? না থাকে তো আমার কাছ থেকে ধার নিয়ে যাস। থুতনীর নীচে দুটো দাড়ি পাকা।"

হরেকেষ্টর মুখ ফ্যাকাসে হয়ে যায়। মুহূর্তে তার মনে পড়ে সেই স্বপ্নের কথা। খুদি আপনমনে পথ চলছিল। তার কচি হাত হরেকেষ্টর হাতের মুঠোর মধ্যে ঘেমে উঠেছে। হরেকেষ্ট ছেড়ে দেয় তার হাত। খুদি বোকার মতো স্বামীর মুখের দিকে তাকায়—সে-মুখে প্রচণ্ড ভয়ের ছাপ পরিস্ফুট হয়ে উঠলেও তা বোঝবার মত বয়স তার নয়। চোখ নামিয়ে নিয়ে নিজেই সে হরেকেষ্টর হাতের আঙুল ধরে চলতে থাকে।

নন্দ আপন মনে সাইকেল ধরে হেঁটে চলছিল। সে বলে—"তোকে জাহান্নামে যেতে দেখলে শান্তি পেতাম হরে। যৌবনটা এমনি এমনি নষ্ট করলি। বংশও থাকবে না।"

বংশ থাকবে না! নন্দর এই কথা তীরের মত এসে বেঁধে

হরেকেষ্টর মনে। নন্দ সত্যি কথাই বলছে। কিন্তু উপায় কি? কিছুই করার নেই। নন্দ বংশ রক্ষার কোন পথ বলে দেয়নি। সে প্ররোচিত করছে অনাচারের পথ বেছে নিতে। এ-পথে শিয়াল কুকুরের মত বংশ রক্ষার হয়তো সম্ভাবনা রয়েছে—কিন্তু তা সম্মানের নয়। সমাজের সামনে বুক ফুলিয়ে সে বংশের গর্ব করা যায় না। তাই নন্দর কথা সত্যি হলেও সে অমানুষ হ'তে পারে না। মাথার মধ্যে নানান চিন্তা জোট পাকিয়ে অস্থির করে তোলে তাকে। পাগলের মত খুদিকে কোলে তুলে আঁকড়ে ধরে বলে—"তুই বেঁচে থাক খুদি, তুই আমার বংশ রাখিস, তোকে যে কোলেপিঠে করে মানুষ করেছি, তার দাম দিবিনে?"

হরেকেষ্টর গলা কেঁপে ওঠে। সে খুদিকে কোলে নিয়ে ছুটতে থাকে।

নন্দ হো-হো ক'রে হেসে বলে—"আস্ত পাগল।"

সে খুব জোরে সাইকেলের বেল বাজিয়ে হরেকেষ্টর পাশ দিয়ে সাঁ করে চলে যায় হংসপুরের দিকে।

হরেকেষ্ট বাড়ি পৌছে দেখে তার বাবা প্রাণকেষ্ট দুধের জোগান দিয়ে সবেমাত্র ফিরে দাওয়ার ওপর খেতে বসেছে। এত বেলায় খেতে দেখে বাপের ওপর মায়া হয় তার। বাঁকে করে দুধ নিয়ে হরেকেষ্ট লতিফ ডাকহরকরার মত জোরে ছুটতে পারলেও প্রাণকেষ্ট তা পারে না। বুড়ো হয়েছে বলে একটু জোরে চলতে গেলেই তার কাঁধ থেকে বাঁক ফসকে যায়। আসলে দীর্ঘদিনের অনভ্যাসের দরুণ বাঁকের দোলানির তালজ্ঞান নষ্ট হয়েছে তার। যে তালে বাঁক ওঠানামা করে সেই তালে না চলতে পারলে তো

ফসকাবেই পিঠ থেকে। তাছাড়া কাঁধের কড়াও নষ্ট হয়ে গিয়েছে প্রাণকেষ্টর। এখন কাঁধে লাগে, নতুন ফোস্কা পড়ে।

হরেকেষ্ট বাড়িতে ঢোকার মুখে খুদিকে নামিয়ে দিয়েছিল কোল থেকে। প্রথমে প্রাণকেষ্টই তাদের দেখল। খেতে খেতে একটু জোরেই বলে ওঠে—"আলি? বাঁচন্ন।"

সে যে কেন বাঁচল, হরেকেষ্টর বুঝতে কষ্ট হলো না। সে একটু হাসে। বাবার কথা শুনে লক্ষ্মী রান্নাঘর থেকে বলে ওঠে—"কে এল বাবা, দাদা নাকি?"

—"হ্যাঁ রে"—প্রাণকেষ্ট ভাত চিবোতে চিবোতে বলে।

—"বউ এলো না?" লক্ষ্মী বলে।

—"আসবি না ক্যান। বার হ'য়ে দেখ্ না। মুখখান শুকায়ে এতটুকু হইয়েছে।"

লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি বাইরে আসে। খুদির মুখের দিকে চেয়ে হরেকেষ্টকে বলে—"তোমার আক্কেলখানা কি দাদা? এই গরমের মধ্যে দুপুরে আসতে হয়? এর মুখের দিকে একবার চেয়েও দেখোনি?"

হরেকেষ্ট ভাল করে তাকিয়ে দেখে এতখানি রাস্তা কোলে উঠে এসেও সত্যিই তার চোখেমুখে কোন পরিশ্রমের চিহ্ন ফুটে উঠেছে কি না। সে হেসে বলে—"একটু খেতে দে' ঠিক হয়ে যাবে। ঘোল আছে না ঘরে? তাই দে একটু।"

লক্ষ্মী খুদির হাত ধরে ঘরের মধ্যে নিয়ে যায়। হরেকেষ্টর মা নেই, লক্ষ্মীই বাড়ির গিন্নি। সে খুদির ভাল শাড়ীখানা খুলে রেখে একটা আটপৌরে শাড়ী পরিয়ে দেয়। তারপরে তার চিবুক ধরে বলে—"তোর খুব কষ্ট হয়েছে, না রে বউ?"

খুদি জবাব দেয় না।

—"দাদার যেমন কাণ্ড। এতদূর হাঁটিয়ে আনল।"

—"না, কোলে করল যে—"

—"ওমা, তাই নাকি?" লক্ষ্মী গালে হাত দিয়ে চোখ বড় বড় ক'রে অনেকক্ষণ তাকিয়ে থাকে। কথাটা সে যেন বিশ্বাস করতে পারে না। বিস্ময় ভাব কাটলে সে হেসে লুটোপুটি খায়। খুদি তার দিকে ফ্যাল ফ্যাল করে চেয়ে থাকে। কোলে উঠলে হাসির কি আছে তার মাথায় ঢোকে না।

লক্ষ্মী ভাবে দাদা ঠিক কাজই ক'রেছে। এই দুধের মেয়েকে কোলে না ক'রে উপায় কি? দাদার যদি অতবড় মেয়ে থাকত, তাকে কি হাঁটিয়ে আনত? সে তাড়াতাড়ি হরেকেষ্টর কাছে যায়। হরেকেষ্ট তখন হাতমুখ ধুয়ে ঠাণ্ডা হ'য়ে বাবার পাশে গিয়ে বসেছে।

—"দাদা শুনে যাও তো?" লক্ষ্মী ডাকে একটু দূর থেকে। প্রাণকেষ্টর সামনে দাদাকে কিছু বলা যাবে না।

—"এখানে আয় না। একটু জিরোতে বসলাম, আর ডাকতে এলি।"

—"শোনো না—"

হরেকেষ্ট অনিচ্ছাসত্ত্বেও উঠে যায় লক্ষ্মীর কাছে।

লক্ষ্মী নীচু গলায় বলে—"হ্যাঁ দাদা, কেউ দেখেনি তো?"

হরেকেষ্টর বুকের ভেতরে ছ্যাঁৎ ক'রে ওঠে। কিসের কথা বলছে লক্ষ্মী? উমার কথা নয় তো?

—"হাঁ ক'রে দেখছ কি, বল?"

—"তুই কিসের কথা বলছিস্?"

—"ওকে যে কাঁধে করে নিয়ে এলে, কেউ দেখেনি তো?"

হরেকেষ্ট এবারে নিশ্চিন্ত হ'য়ে বলে—"দেখেছে।"

—"এ্যাঁ, কে দেখেছে?" লক্ষ্মীর মুখে আতঙ্ক।

—"ভাল লোকই দেখেছে রে। গাঁয়ের সবাই জানবে।"

—"কে—"

—"নন্দ। বর্ডার থেকে সাইকেলে ক'রে ফিরছিল। আমি আগে দেখতে পাইনি। নিশীথগঞ্জের বটতলায় ধরা পড়ে গেলাম।"

—"ভাল কাজ করনি দাদা। নন্দ খারাপ লোক।"

—"আমার চেয়ে ভাল ক'রে কেউ জানে না নন্দকে। সে একটা অমানুষ। বাবা আবার তার সঙ্গে তোর বিয়ে দেবে বলে ক্ষেপেছে। টাকা পাবে কিনা। বিয়ে করিসনে লক্ষ্মী। তার চেয়ে গলায় দড়ি দিস।"

"সে আমি জানি দাদা। তোমার ভাবতে হবে না।"

লক্ষ্মীর কথায় হরেকেষ্ট বিস্মিত হয়। এমন নিশ্চিন্ত ভাবে সে কথাটা বলল, যেন মৃত্যুর জন্যে প্রস্তুত হয়েই রয়েছে। হয়তো সেটাই সত্যি। কারণ নন্দর সঙ্গে বিয়েতে তার অমত থাকা সত্ত্বেও কোন প্রতিবাদ করে না কোনদিন। অন্ততঃ তাকেও তো বলতে পারত। সে তো শুধু লক্ষ্মীর দাদা নয়। তার বন্ধুও।

হরেকেষ্টর ব্যথাতুর মুখের দিকে একবার চেয়ে লক্ষ্মী ধীরে ধীরে চলে যায়।

বর্ডারে নাকি গরু চুরি যাচ্ছে। সাহাপুরের আলিমদ্দিন এসে খবর দিল তার সাদা গরুটা পাওয়া যাচ্ছে না। বর্ডারে চরাতে

নিয়ে গিয়ে একটা অশ্বত্থগাছের ছায়ায় ঘুমিয়ে পড়েছিল সে। উঠে দেখে গরু নেই। নেই তো নেই-ই। অনেক খোঁজ ক'রেও আর পাওয়া গেল না। আলিমদ্দিন বলতে বলতে কেঁদে ফেলল। আহা, কাঁদবে না? গরুও যা, ছেলেও তাই। কত মায়া হয়। কী তাগ্ড়াই চেহারা ছিল গরুটার।

আলিমদ্দিন থানায় গিয়ে লিখিয়ে এসেছে। থানার বাবু বলেছে গাইটা বর্ডারের ওপারে চলে গেলে তাদের কোন হাত নেই। তবে সরকার খবরটা পাবে।

তার গরু চুরির পর আরো আট-দশটা গরু হারালো বর্ডার থেকে। দুর্ভাবনা হ'লো সকলের। তারা আবার বুঝল, দেশটা সত্যিই ভাগ হ'য়েছে। গরু চুরি হ'লে পুলিশ কিছু করতে পারে না, ম্যাজেষ্টার কিছু করতে পারে না,—এ আবার কি!

ছোট সাহেব একদিন এসে মিটিং করলেন বটে, কিন্তু চুরি বন্ধ হলো না। সকলে মিলে শেষে একটা দরখাস্ত করল। তাতে কিছু ফল হলো। বর্ডারে পুলিশের ঘন ঘন ঘাঁটি বসল। সবাই জানল ঘাঁটিগুলোর নাম থানা নয়, বি. ও. পি। তারা জানল থানা যেমন বাংলা কথা বি. ও. পিও তেমনি বাংলা কথা। ইংরেজ চলে গিয়ে 'বর্ডার' আর 'বি. ও. পি' এই দুটো ইংরেজী কথা শিখিয়ে দিয়ে গেল নিরক্ষর গ্রামবাসীদের।

গরু চুরির ঘটনায় হংসপুরের ঘোষেরা চঞ্চল হ'য়ে উঠল। কারণ বর্ডারের দিকে ফসল ভাল। ফসল সমেত জমি কিনে বছরে একমাস দু'মাসের জন্যে বাথান খুলতে তারা ওদিকেই যায়। এবার আর যাওয়া হবে না।

প্রাণকেষ্ট ভ্রূকুঞ্চিত ক'রে বলে—"কি করবি রে হরে?"

—"করব আর কি, বর্ডারে যাবো না। এদিকে খুঁজে পেতে নিতে হবে।"

—"সবাই যে ইদিক পানে যাবি। অত ক্ষ্যাত পাবি কোনে?"

—"নীলু হবিবপুরের মিঞাদের বলে রেখেছে। তাদের ভাল ক্ষেত আছে।"

—"নীলু ছোঁড়াটা ভালই রে।"—প্রাণকেষ্টর মুখে হাসি দেখা দেয়।

—"নন্দর চেয়ে ভাল না।"—বাবাকে একটু খোঁচা দিতে ছাড়ে না সে।

বুড়ো খোঁচা বোঝে না। বলে—"নন্দর সাথে কার কথা? কত ট্যাকা ওর।"

—"সে তো জানি। কিন্তু অত টাকা হ'লো কি করে? নীলুর মতই ওর অবস্থা ছিল। হঠাৎ গায়ে জামা উঠল, সাইকেল কিনল। সাইকেল ছাড়া তো একপাও চলে না আজকাল। লক্ষ্মী বলছিল, ও নাকি সাইকেল-অফিসার হবে—" কথাটা যে 'সার্কেল-অফিসার' হরেকেষ্ট তা জানে। জগবন্ধু পণ্ডিতের ছাত্র সে। কিন্তু গ্রামের সবাই যে ভাবে বলে, সেও তাই বলল।

প্রাণকেষ্ট কথাটার গুরুত্ব দিল। সে অতশত বোঝে না। আকর্ণ হেসে বলে—"লক্ষ্মী বলিছিল? তা তো বলবিই। দুদিন পর বিয়ে হবি, তাই এখন থেকেন খপর রাখে। মিয়েটার বুদ্ধি আছে! অত সাইকেল চড়লি সাইকেল-অপিচার হবি না তো কি নীলুর নাকাল ঘোড়ার ঘাস কাটবি?"

হরেকেষ্টর হাসি পায়। তার বাবা কথাটাকে ধ্রুবসত্য বলে মেনে নেবে একথা সে ভাবেনি। চোখে আঙুল দিয়ে ভুল ধরিয়ে

দেবার চেষ্টা করল না সে। তবে নন্দর কথা যখন একবার উঠলই তখন সহজে কথাটার ছেদ টানতেও চাইল না।

খুদি দাওয়ার এক কোনে ব'সে হরেকেষ্টর মুখের দিকে একদৃষ্টে তাকিয়েছিল। তার সামনে এক বাটি মুড়ি আর একটু আখের গুড় দিয়ে লক্ষ্মী বসিয়ে রেখে গিয়েছে। সে বসে আছে ঠিকই কিন্তু খাচ্ছে না। হরেকেষ্ট বুঝল, গুড়টুকু ইতিমধ্যে সাবাড় ক'রে ফেলেছে সে। গুড় খেতে বড্ড ভালবাসে তার বউ! লক্ষ্মী রান্নাঘরে কাজ করছে। একটু গুড় দিয়ে যেতে বলতে ইচ্ছে হলো তার, কিন্তু সামলে নিল। লক্ষ্মী রান্নাঘরেই থাকুক। নন্দর প্রসঙ্গটা শেষ হোক।

হরেকেষ্ট বাবাকে বলে—"নন্দর সঙ্গে তাহলে লক্ষ্মীর বিয়ে দেবে ?"

প্রাণকেষ্ট বলে—"সব তো ঠিকই আছে।"

—"টাকা পেয়েছো ?"

—"এ মাসেই দিয়ে দিবি বলিছিল।"

—"পাঁচ শো টাকাই দেবে তো—"

—"সাড়ে চারশো দিবি।"

—"ইচ্ছে করলে হাজার টাকাও পেতে পার বাবা।" —হরেকেষ্টর মুখ ঘৃণায় কুঁচকে ওঠে।

—"ক্যামনে ?" প্রাণকেষ্টর চোখ উজ্জ্বল হয়।

—"মেয়ে বিক্রী কর। কলকাতায় অমন হয় শুনেছি।" হরেকেষ্ট তার ঠোঁট কামড়ে ধরে। কথাটা বলতে তার বাধো বাধো ঠেকেছে। উচ্চারণের সময় যথেষ্ট কষ্ট হ'য়েছে। তবু বাধ্য হ'য়ে বলে ফেলল। লক্ষ্মীকে বাঁচাতে হবে। তার একমাত্র বোন লক্ষ্মী।

প্রাণকেষ্ট জ্বলে ওঠে—"বাপের সাথে ঠাট্টা, তাই না? খুব লায়েক হইয়েছিস? বিক্রি আর বিয়ে এক হলো!"

—"নন্দর সাথে বিয়ে দিলে, একই হ'লো।"

—"ক্যান, কিসে এক হলো ক'। বলতি হবি তোরে। না বললি ছাড়ান নেই।"—দাওয়ার ওপর হুঁকো ঠুকে প্রাণকেষ্ট চেঁচিয়ে ওঠে।

—"লক্ষ্মী গলায় দড়ি দেবে।"

—"কি? কি বললি? গলায় দড়ি দিবি? বলিছে তোকে? ডাক লক্ষ্মীরে।"

—"এ কথা আবার ডেকে শুনতে হয় নাকি? নন্দর সংগে যার বিয়ে হবে সে মেয়েই গলায় দড়ি দেবে। নন্দর মুখের দিকে একবার ভাল করে তাকিয়ে দেখো, তুমিই বুঝবে।"

—"কি বুঝব, এঁ্যা? কাম নাই বুঝে। এমাসে বিয়ে হবি, হবি, হবি। ঠাট্টা—না? বাপের সাথে ঠাট্টা।" প্রাণকেষ্ট রাগে থর থর ক'রে কাঁপতে থাকে।

হরেকেষ্টর ভয় হয়। আজকাল রাগলে তার বাবা মাঝে মাঝে অজ্ঞান হয়ে পড়ে। সে নিরুপায় হ'য়ে এদিক ওদিক চাইতে রান্নাঘরের দরজায় লক্ষ্মীকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে। লক্ষ্মী তাকে ইসারায় সরে যেতে বলল।

বসে থাকা ঠিক হবে না ভেবে সে উঠে দাঁড়ায়। দাওয়া থেকে উঠোনে নামে। তাকে চলে যেতে দেখে খুদি বলে উঠল —"গুড়।"

হরেকেষ্ট তার কথা ভুলেই গিয়েছিল। সে লক্ষ্মীকে একটু গুড় দিতে বলে বাইরে চলে গেল। সে বাড়িতে থাকলে প্রাণকেষ্ট

সুস্থির হতে পারবে না।

হরেকেষ্ট বাইরে চলে যাবার পরও লক্ষ্মী রান্নাঘরে খুট খুট করে। খুদিকে গুড় দেবার কথা সে ভুলে যায়। তার মাথার মধ্যে ঘুরছিল বাবা আর ভাইয়ের কথাবার্তা। সবই শুনেছে সে—প্রতিটা কথা। হরেকেষ্ট অনর্থক কথা কাটাকাটি ক'রে মাথা গরম করে দিয়ে গেল তার বাবার। প্রাণকেষ্টর জিদ তো তার অজানা নয়। একবার যখন বলেছে নন্দর সংগে বিয়ে দেবে তখন না দিয়ে ছাড়বে না। এই জিদের বশেই মায়ের মৃত্যুর সময়েও কথা বলেনি তার বাবা। মায়ের সেই অপেক্ষা-করুণ মুখ এখনো চোখের সামনে স্পষ্ট ভাসে। কান্না পায় সে কথা মনে পড়লে।

মা বার বার তাকে বলেছিল—"তোর বাপ সত্যিই আসবিনা লক্ষ্মী? আমি তো আর তারে জ্বালাতি আসবো না।"

লক্ষ্মী আঁচলে মুখ চেপে কান্না থামিয়েছিলো সেদিন। কী জবাব দেবে মায়ের কথার? কতবার বাবার পায়ে ধরেছে, শুধু একবার গিয়ে মায়ের সামনে দাঁড়াবার জন্যে। রাজী করাতে পারেনি। তার মা স্বামীর দেখা পায় নি, শেষ সময়ে।

হরেকেষ্ট সেদিন মরিয়া হ'য়ে বলেছিল—"এতো'ই যদি তোমার গোঁ, মাকে বিয়ে করেছিলে কেন? দেশে অন্য মেয়ে ছিল না?"

প্রতিফল সংগে সংগে পেয়েছিল সে। বাপের হুঁকো ছুটে এসে তার মাথায় লেগে মাথা ফেটে রক্তারক্তি। এত রক্ত পড়েছিল যে, মৃতদেহের সংগে শ্মশানে যেতে পারেনি সে। উঠোনের তুলসী তলায় যখন নামানো হয়, তখন কোন রকমে

উঠে মায়ের মুখে আগুন ছুঁইয়ে দিয়ে আবার শুয়ে পড়েছিল।

অথচ ঘটনাটা কত সামান্য। হরেকেষ্টর মায়ের প্রথম বিয়ে হয়েছিল অনাদি ঘোষের সংগে। বিয়ের অল্প দিন পরে অনাদি ঘোষ মারা গেলেও, হরেকেষ্টর মা অনাদির ছোট ভাই ভোলা নাথের স্নেহ বন্ধনে জড়িয়ে পড়ে। মাতৃহারা ছেলেটি ভাই-বউকে পেয়ে আঁকড়ে ধরেছিল। ভোলানাথের চেয়ে যদিও সে মাত্র পাঁচ বছরের বড়, তবুও তো সে মেয়ে। তেরো বছরের কিশোরীর মধ্যে ভোলানাথ মাতৃস্নেহের স্বাদ পেয়েছিল। তাই অনাদি ঘোষের সংসার থেকে তাকে ছিনিয়ে আনা হলেও ভোলা নাথের জন্যে অনেক সময়ই তার চোখ দুটো সজল হয়ে উঠত। বুক ভারী হতো।

অনাদি ঘোষ যখন মারা যায়, তখন হরেকেষ্টর মায়ের সংগে ভোলানাথও কেঁদে ভাসিয়েছিল। শেষে কান্না থামিয়ে বলেছিল —"দাদা আর আসবি না। নারে বৌদি?"

—"আসবি"—হরেকেষ্টর মা কথাটা ভেবে বলেনি।

—"কি করে আসবি। মরলে যে পুড়ায় ফেলে। না পুড়ালে আসতো। তুই যখন মরবি, আমি পুড়াতে দেবো না।"

হরেকেষ্টর মায়ের শোকও বেশীক্ষণ ছিল না। স্বামী মরলে কাঁদতে হয়, তাই কেঁদেছিল। না কাঁদলে বদনাম হয়। আবার শুধু কাঁদলেই হয় না,—চিৎকার ক'রে সুর ক'রে কাঁদতে হয়। তাই সে চেঁচিয়ে কেঁদেছিল,—পাশের বাড়ির হরেন মরলে তার বউয়ের হ'য়ে পেলা যেমন কেঁদেছিল। আসলে হরেনের বউ নিজে তো একটুও কাঁদে নি। কাঁদবে কি, হরেনের কাছে দু'বেলা শুধু মারই খেতো সে। স্বামীর ওপর কিছুমাত্র টান ছিল না তার।

স্বামী মরলে সে বেঁচেছিল। বহুদিনের উদরী ছিল হরেনের। সে যে মরবে, সকলেই জানত। তাই হরেনের বউ পেলাকে আগে থাকতেই ঠিক ক'রে রেখেছিল। কথা ছিল, পেলা যদি তার হ'য়ে কেঁদে দেয় তাহ'লে দু'কাঠা ধান পাবে। পেলা ঠিকই কেঁদেছিল। কিন্তু শেষের দিকে হরেনের বউয়ের রকম-সকম দেখে তার সন্দেহ হ'লো। ভাবল, হয়তো কাজ ফুরোলে দু'কাঠার জায়গায় এককাঠা ধান দিয়ে তাকে বিদায় করা হবে। তাই কান্নার মধ্যে সে সুর ক'রে বলেছিল—"আমাকে এক কাঠা দি-বি, কি দুই কাঠা দি-বি —মা-গো-মাঃ।"/ বাইরের লোকে বুঝতে পারেনি। কিন্তু হরেকেষ্টর মা পাশেই ছিল। সে সব শুনেছে।

হরেনের বউয়ের মত অতটা না হলেও অনাদি মরলে হরেকেষ্টর মায়ের এমন কিছু দুঃখ হয়নি। অনাদির চেয়ে ভোলানাথ তার প্রিয় ছিল। অনাদি যে-কারণে তার প্রিয় হ'তে পারত, সে বোধ তখনো জন্মায়নি হরেকেষ্টর মায়ের—দেহেও নয়, মনেও নয়।

অনাদির সংসার ছেড়ে আসার পূর্ব-মুহূর্তের কথা হরেকেষ্টর মা জীবনেও ভুলতে পারেনি। পারলে, জীবনের শেষ পনেরো বছর স্বামীর সংগে বাক্যালাপ বন্ধ হ'তো না—যার জন্যে মনের মধ্যে এক দুঃসহ ব্যথা নিয়ে সে পৃথিবী থেকে বিদায় নিয়েছে।

অনাদির সংসার থেকে চির-বিদায় নিয়ে সে যখন তার বাবার সংগে গরুর গাড়িতে গিয়ে উঠল তখন ভোলানাথ ছিল না সেখানে। সে তার ছাগলকে কাঁঠালের পাতা খাওয়াতে গিয়েছিল মণ্ডলদের বাগানে। তাকে অনুপস্থিত দেখে হরেকেষ্টর মায়ের কষ্ট হ'লেও মনে মনে সে নিশ্চিন্ত হ'য়েছিল। ভোলানাথের

চোখের সামনে বাড়ি ছেড়ে আসার কথা সে কল্পনাও করতে পারত না।

এক ক্রোশের ওপর রাস্তা চলে আসার পরে হঠাৎ পেছনে ভোলানাথের চিৎকার শুনে হরেকেষ্টর মা চমকে উঠেছিল। আট বছরের বালক ছুটে এলো—সম্পূর্ণ উলংগ সে। কাপড় পরে ছুটতে অসুবিধে হয় বলে রাস্তার ওপর কোনখানে সেটা ফেলে রেখে এসেছে।

সে যখন এসে গরুর গাড়ি ধরে ফেলল তখন সে হাঁপাচ্ছিল, তার চোখ দিয়ে জল গড়াচ্ছিল। কিন্তু বৌদিকে ধরতে পেরে তার মুখে তৃপ্তির হাসি ফুটে উঠল। হরেকেষ্টর মা তার মুখের দিকে চেয়ে ভয় পেলো। মুখ ক্ষতবিক্ষত, নাক দিয়ে রক্ত গড়াচ্ছে, কপাল ফুলে উঠেছে।

—"রক্ত ক্যান রে ভোলানাথ—"

—"ও কিছু নারে বৌদি, আছাড় খেইয়েছিলাম।"

হরেকেষ্টর মা গরুর গাড়ি থেকে হাত বাড়িয়ে আঁচল দিয়ে তার মুখ মুছে দেয়।

—"নেমে আয় বৌদি—"

—"ক্যান—" হরেকেষ্টর মা দাঁত দিয়ে ঠোঁট চেপে ধরে নিজেকে সামলালো।

—"বারে, বাড়ি যাবি না—" ভোলানাথের কথায় বিস্ময়।

—"বাপের বাড়ি যাবো! দেখছিস্ না সামনে বাপ বসে!"

—"থাকতি দে তোর বাপরে, তুই আয়। ছাগলডারে মণ্ডল-দের বাগানে ছাড়ে আইছি! শেয়ালে খাবি। তাড়াতাড়ি চ।"

—"তুই শিগ্‌গির যা ভোলানাথ—" হরেকেষ্টর মায়ের মুখে

দুর্ভাবনা ফুটে ওঠে। ছাগলটাকে সেও ভালবাসত।

—"তুই না গেলি, ক্যাম্‌নে যাই? তুই আয়—"

সামনের লোকটা পেছন ফিরে বলে, "কেডারে শশী?"

ভোলানাথ বলে—"বৌদিকে নিতে আইছি, নামায় দেও।"

কথার জবাব না দিয়ে লোকটা বলে—"অনাদির ছোট ভাইডা না?"

—"হ্যাঁ বাবা, আমি ওর সাথে যাবো।"

—"আর যাতি হবি না! হংসপুরের প্রাণকেষ্টর সাথে তোর বিয়ে ঠিক হইয়েছে।"

—"আমি বিয়ে করতি পারব না। ভোলার সাথে যাবো।"

—"না।" গুরুগম্ভীর আওয়াজ লোকটার গলায়।

—"আমি যাবোই।" হরেকেষ্টর মা গরুর গাড়ির পেছন দিক থেকে নেমে পড়ে। লোকটা ছুটে এসে তার গালে জোরে চপেটাঘাত করে। হরেকেষ্টর মা রাস্তার ওপর পড়ে যায়। তাতেও সন্তুষ্ট হ'লো না লোকটা, রাস্তা থেকে একটা বাঁশের কঞ্চি তুলে নিয়ে ভোলানাথকে পিটতে শুরু করল। কঞ্চির আঘাতে ভোলানাথের সর্বাংগ ক্ষতবিক্ষত হ'লো। সে চীৎকার করে কাঁদল কিন্তু বৌদিকে ছেড়ে পালাল না।

হরেকেষ্টর মাকে জোর করে গাড়িতে টেনে তোলা হ'লো। নিরুপায় ভোলানাথ বুঝল তার বৌদি আর ফিরবে না। কিন্তু কেন এমন হ'লো সে জানে না। তার বৌদিকে যে অন্য কেউ এসে নিয়ে যেতে পারে একথা তার মনেও হয়নি কখনো। সে ধুলোয় লুটিয়ে পড়ে আর্ত চীৎকার ক'রে উঠে—"বৌদিরে তুই যাসনে। তুই মর্‌লি ওরা তোরে পুড়ায় ফেল্‌বি।"

গাড়ির মধ্যে বসে হরেকেষ্টর মা ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সেদিনের সেই শিশুকণ্ঠের আর্তচিৎকার শেষ দিন পর্যন্ত হয়তো তার কানে ভাসতো। নইলে প্রাণকেষ্টর সংগে কথা বন্ধ হবে কেন?

ঘটনাটা সামান্য। ভোলানাথের তখন বয়স হ'য়েছে। হরেকেষ্টর মায়েরও অনেক বয়স। লক্ষ্মী জন্মেছে সে সময়। এক সন্ধ্যাবেলায় ভোলানাথ এসে হাজির এই বাড়িতে। সোজা হরেকেষ্টর মায়ের সামনে গিয়ে তাকে প্রণাম করে হাসিমুখে জিজ্ঞাসা করে—"আমারে চিনতি পার বৌদি?"

হরেকেষ্টর মা লম্বা ঘোমটা টেনে দিয়েছিল মাথায়। সে চেনেনি, চিনবার কথাও নয়।

—"চিনতি পারলে না?"—গলা কেঁপে উঠল ভোলানাথের।

সেই কাঁপা গলা শুনে কি অনুমান করল সেই জানে, হরেকেষ্টর মা ছুটে এসে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—"ভোলা আইছিস্?"

হয়তো ভোলার কণ্ঠস্বরে গরুর গাড়ির পেছনের আর্ততা ফুটে উঠেছিল। নইলে এমন পাগলের মত আচরণ করবে কেন, হরেকেষ্টর মা।

প্রাণকেষ্ট ঠিক সেই সময় বাড়ি ঢুকেছিল। ভোলানাথকে সে চেনে না। অপরিচিত একজন যুবককে এভাবে জড়িয়ে ধরা সে সহজ ভাবে দেখেনি। কেই বা দেখে? তবে সে কোন রকম অশোভন ব্যবহার করেনি।

অনেকদিন পরে ভোলানাথকে পেয়ে হরেকেষ্টর মা কত গল্প করল,—কত যত্ন। ভোলানাথ যেন সেই ছোট্টটিই রয়েছে। সে

চলে গেলে হরেকেষ্টর মা স্বামীর কাছে এসে ভোলানাথের কথা বলল। প্রাণকেষ্ট কথা বলে না। কিন্তু পর পর সাতদিন যখন সে কথা বন্ধ করে থাকল তখন হরেকেষ্টর মা ব্যাপারটা অনুমান করল। সে সব কিছুই বুঝিয়ে বলল স্বামীকে। ফল হল না। প্রাণকেষ্টর প্রচণ্ড ধমকে থেমে যেতে হলো। সেই শেষ। জীবনে আর তাদের বাক্যালাপ হয়নি।

লক্ষ্মী রান্নাঘরে বসে এটা ওটা নেড়ে খুট্ খুট্ শব্দ করছিল, আর ভাবছিল মায়ের কথা। জন্মে অবধি সে বাবা-মায়ের বাক্যালাপ শোনেনি। তাই তেমন অস্বাভাবিক মনে হয়নি ছেলেবেলায়। কিন্তু যখন একটু বুদ্ধি হলো, যখন পাঁচ জায়গায় দেখে শুনে বুঝতে শিখল যে এটা ঠিক নয়, তখন থেকে সে মাকে প্রশ্ন শুরু করল। মা তাকে থামিয়ে রাখত,—কখনো মিষ্টি কথা বলে, কখনো ধমক দিয়ে আবার কখনো চোখের জল ফেলে। শেষে যখন বুঝল যে তার আয়ু ফুরিয়ে আসছে তখন সব কথা খুলে বলেছিল লক্ষ্মীকে। নিজের মেয়ে বলে কিছু গোপন রাখেনি।

মায়ের কথা ভেবে চোখে জল এলো লক্ষ্মীর। মায়ের মৃত্যুর সময়ও যে বাবার পনেরো বছরের প্রতিজ্ঞা টললো না, সামান্য এক বিয়ের ব্যাপারে তাকে টলানো কখনই সম্ভব নয়। হরেকেষ্ট অনর্থক বাবার মাথাটা গরম করে দিয়ে গেল।

লক্ষ্মী একসময় উঁকি দিয়ে দেখল প্রাণকেষ্ট তেমনি বসে রয়েছে চোখ লাল করে, আর ঘন ঘন তামাক টানছে। রাগ হ'লে আজকাল অমন ঘন ঘন টানে সে। সেয়ানা ছেলের মাথাতো আর হুঁকো দিয়ে ফাটিয়ে দিতে পারে না। এখন যে হরেকেষ্টর

ওপর সম্পূর্ণ নির্ভর করতে হয়। তিন বছরের হাঁপানীতে স্বাস্থ্যটা ভেঙে না পড়লে আজকে কি অত সহজে ছেলে পার পেতো ?

লক্ষ্মী দাওয়ার ওপর খুদিকে দেখতে পেল না। তাকে গুড় দেবার কথা একদম ভুলেগিয়েছিল সে। আহা বেচারা, মুড়ির বাটিটা পড়ে রয়েছে তেমনি। কিন্তু গেল কোথায় বউটা ?

শেষে রান্নাঘরেরই কোনে পিঁড়ির ওপর তাকে নিদ্রিতাবস্থায় দেখতে পায়। কোন্ ফাঁকে এসে শুয়ে পড়েছে কে জানে। তার কি অত খেয়াল ছিল ? লক্ষ্মী তাকে ডাকল না। আর খানিকটা ঘুমোক। নইলে সন্ধ্যা লাগতেই ঢুলে পড়বে। বেশীর ভাগ রাতে খাওয়াই হয় না বউয়ের। হরেকেষ্ট একবাটী চিড়ে ভিজিয়ে রেখে দেয় ঘরে। রাতে ঘুম ভাঙলে সেটুকু খাইয়ে দেয় খুদিকে।

সূর্য গড়িয়ে গেল পশ্চিমে। লম্বা-ভাদুরে আমগাছটার সবটুকু ছায়া এখন তাদের বাড়ির উঠোনে। নারকেল গাছটার ওপর একটা চিল বসে রয়েছে। তার গায়ে সোনালী রোদ। বাড়ির পেছনের বন-জংগলে ঘেরা ছোট্ট পুকুরের মাছের দিকে লক্ষ্য চিলটার। ফেরার পথে শেষ শিকার যদি মিলে যায়।

উঠোনের দরজায় ঝপাং ক'রে একটা শব্দ হয়। এরই মধ্যে হরেকেষ্ট ফিরল নাকি ? লক্ষ্মী তাড়াতাড়ি উঠে গিয়ে রান্নাঘরের দাওয়ার ওপর দাঁড়ায়। সে থমকে যায়! নন্দ সাইকেলখানা বেড়ার গায়ে হেলান দিয়ে রেখে মুখ ফিরিয়ে লক্ষ্মীকে দেখতে পেল। প্রাণকেষ্ট উঠে বেরিয়ে ঘরের ভেতরে গিয়েছে। দাওয়ায় নেই সে।

লক্ষ্মী দেখে, নন্দ তারই দিকে এগিয়ে আসছে। ইচ্ছে হ'লো একবার বাবাকে ডাকে। কিন্তু সেটা বাড়াবাড়ি হবে।

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল সে।

নন্দ কাছে এসে হাসে। কি কুৎসিত হাসি, গা ঘিন ঘিন করে। এই নন্দকে লক্ষ্মী কবে থেকে চেনে। তার স্বভাব কোনকালেই ভালো লাগেনা তার। তাই চিরকাল এড়িয়ে গিয়েছে তাকে।

নন্দকে দাঁড়িয়ে থাকতে দেখে সে বলে—"বাবা ঘরে আছে।"

—"থাকুক। আমি তোমার কাছে এসেছি। আমি এলে তোমার খারাপ লাগে লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী ভাবে, কথা বলতে শিখেছে বটে। সহরে গিয়ে অমন হ'য়েছে বোধ হয়। সে নন্দর কথায় জবাব দেয় না।

—"তোমার বাবাকে সাড়ে চারশো টাকা দেবো। শুনেছো ?"

লক্ষ্মী তবু চুপ করে থাকে।

—"কথা বল। তোমার কথা শুনলে কান জুড়োয়।"

লক্ষ্মী মনে মনে ভাবে, ঝাঁটা মারো।

নন্দ হেসে বলে—"লজ্জা হ'য়েছে বুঝি ? বিয়ের কথা ভেবে ? অত লজ্জা কিসের ? অ্যাঁ—"

সে খপ ক'রে লক্ষ্মীর হাত চেপে ধরে।

লক্ষ্মীর মুখ দিয়ে আতংকের অস্ফুট শব্দ বার হয়। সে চেষ্টা করে হাত ছাড়িয়ে নিতে। পারে না।

নন্দ বলে—"অমন করছ কেন ? আমি কি তোমার পর ? দু'দিন পরেই তো আপন হবো।"

লক্ষ্মীর গা ঘেমে ওঠে। সে চিৎকার ক'রে বাবাকে ডাকে।

নন্দ তাড়াতাড়ি হাত ছেড়ে দেয়। গম্ভীর হ'য়ে বলে—"এটা কি ভাল হ'লো ? এই হাতেই তোমার সেবা করতে হবে। আজ

একটু হাত ধরে রাখলে সতীত্ব যেতো না।"

লক্ষ্মীর মনে হয় তার হাতের সংগে দুর্গন্ধযুক্ত পচা কাদা লেপটে রয়েছে। ইচ্ছে হ'লো ঘাটে গিয়ে ভালো ক'রে হাত ধুয়ে ফেলতে। শুধু হাত নয়, সমস্ত শরীরটাই। নন্দর স্পর্শ তাকে অপবিত্র করেছে।

কিন্তু বাবা গেল কোথায় ? বাইরে চলে গেল নাকি ? সে তো বেশ জোরেই চিৎকার ক'রে উঠেছিল ! তবু বাবার কানে গেল না। নন্দ তো বাবার ভয়েই হাত ছেড়ে দিয়েছে।

নন্দ বলে—"তোমার বাবা বাড়ি নেই লক্ষ্মী ?"

—"না, না আছে, এখুনি দেখে এলাম।" ভয়ে সে কেঁপে ওঠে। একবার যদি নন্দ জানতে পারে প্রাণকেষ্ট বাড়ি নেই তাহলে বহুদূর অগ্রসর হবে। তার স্বভাবই তাই। সে অমন অনেক ক'রেছে। কানে কত কথা ভেসে আসে। কিন্তু লক্ষ্মী তা হ'তে দেবে না। কোন মতেই নয়।

নন্দ বলে—"ঘরেই থাক। আমি তোমার কাছে এসেছি।"—সে পকেট থেকে একছড়া নকল সোনার ফ্যাশানী হার বার ক'রে বলে—"পছন্দ হয় লক্ষ্মী ?"

লক্ষ্মী হারের দিকে তাকায় না। সে ভাবছিল সময় বুঝে বাবা ভাই সবাই বাইরে গিয়েছে। এখন সে কি করবে ?

—"পরিয়ে দেবো লক্ষ্মী ? কেমন মানাবে, আহা"—সে চোখ বন্ধ করে।

—"না। ওসব ভাল লাগে না আমার।"

—"সে কি গো। আমার বউ হবে, আর হার ভাল লাগে না ? রাজরাণীর মতো সারা গা গয়নায় ঢেকে দেবো যে।"

ভয়ে লক্ষ্মীর চোখ বড় বড় হয়ে যায়। সে চেঁচিয়ে বলে—"দাদা আসবে এখুনি।"

তার কথায় কাজ হ'লো। নন্দ থমকে দাঁড়িয়ে গেল। হরেকেষ্টকে সে ভয় পায়। রাগে তার মুখ কালো হ'য়ে যায়।

প্রাণকেষ্ট ঘরের ভেতরেই ছিল, এতক্ষণ হয়তো ঢুলছিল। বাইরে এসে নন্দকে দেখতে পেয়ে সে বলে—"নন্দ নাকি গো?"

—"হ্যাঁ।" নন্দর স্বর গম্ভীর।

—"তা, উঠোনে ক্যান? ঘরে আয়—"

নন্দ লক্ষ্মীর দিকে একবার কটমট করে তাকিয়ে প্রাণকেষ্টর কাছে যায়। দাওয়ায় চাটাই বিছানো ছিল সেখানে গিয়ে বসে পড়ে।

—"তোর হাতে ওডা কি?"

—"হার। লক্ষ্মীর জন্যে এনেছিলাম।"

—"তাই নাকি? খুব ভাল। তৈরিডা কিসের? সোনার নাকাল ঠেকছে।"

—"না, নকল সোনা। অনেকদিন জ্বলজ্বল করে।"

—"লক্ষ্মীকে দে গা, যা—"

—"দিতে তো গিয়েছিলাম। ও নিল না।" কথার মধ্যে দুঃখ ঢেলে দেয় সে।

রাগে লক্ষ্মীর সর্বাংগ জ্বলে যায়।

—"নিবি না ক্যান? ওর বাপ নিবি। না নিলিই হলো।" প্রাণকেষ্ট উত্তেজিত হয়।

—"না কাকা, আমার মনে হয়, আমাকে ওর পছন্দ হয় না।"

এবারে প্রাণকেষ্ট হেসে ওঠে। বলে—"তোর কথার মাথামুণ্ডু

নাই। লক্ষ্মী তোকে পছন্দ না করলি, সকলকে ওকথা বলে বেড়াবি ক্যান ?"

—"কি কথা ?" নন্দের প্রশ্নে কৌতূহল।

—"তুই নাকি সাইকেল-অপিচার হবি। তোর নাকাল তো কেউ সাইকেল চড়তি পারে না।"

—"আমি সাইকেল-অপিচার হবো!" কথাটা তার কাছে অদ্ভুত লাগে।

—"হ্যাঁ রে। লক্ষ্মী কত গর্ব করে।"

নন্দ হো হো ক'রে হেসে ওঠে। সে এ কথার জবাব খুঁজে পায় না।

প্রাণকেষ্ট অবাক হয়ে বলে—"অমন হাসিস ক্যান ?"

—"না এমনি। লক্ষ্মী অনেক খবর রাখে।"

—"তো বলতিছি কি ? মিয়ের অনেক বুদ্ধি।" প্রাণকেষ্ট সোজা হ'য়ে বসে।

নন্দ হঠাৎ গম্ভীর হয়ে বলে—"কিন্তু কাকা, আমার মনে হয় লক্ষ্মী নীলুকে পছন্দ করে।"

—"নীলু ? হতি পারে না। হতিই পারে না।" প্রাণকেষ্ট রেগে ওঠে। রেগে ওঠে এই কারণে যে, কথাটার মধ্যে যথেষ্ট সত্যি রয়েছে। নীলু-লক্ষ্মীর সম্বন্ধ আজকের নয়। দুজনার মা সেই কবে থেকে ঠিক করে রেখেছে তাদের বিয়ে—লক্ষ্মী যেদিন জন্মাল সেদিন।

—"মানুষের মনের কথা কে বলতে পারে। সেদিন তোমাদের পুকুরঘাটে নীলুর সংগে কিরকম হেসে কথা বলছিল। আর আজ আমাকে দেখে কেমন ক'রে উঠল। তাই বলছিলাম।"

—"মিয়েদের মন নন্দ। বুঝবি না তুই। যারে পছন্দ করবি তারেই কাছে ভিড়তি দিবি না ওরা। ভাবিস না তুই।" প্রাণকেষ্টর সব সময় ভয়। সাড়ে চারশো টাকা বুঝি হাতছাড়া হয়ে যায়। তাই নন্দকে তুষ্ট করতে সে যা বলল, কিছুক্ষণ আগে হলে হয়ত কল্পনাও করতে পারত না সেকথা। নিজের মেয়ে সম্বন্ধে এ জাতীয় কথা বলা এই প্রথম। কিন্তু উপায় কি? টাকা তার চাই-ই। সহরে গিয়ে হাঁপানীর চিকিৎসা করতে হবে। সে মনে মনে ঠিক করে, নীলুকে শাসিয়ে দিতে হবে যাতে আর না আসে। সে এলে লক্ষ্মীটা বড্ড গলে যায়। ওসব ভাল না। নন্দ বেঁকে বসতে পারে।

নন্দ একসময় উঠে পড়ে। প্রাণকেষ্টকে হার-ছড়াটা দেখিয়ে বলে—"এটা নিয়ে চললাম কাকা। লক্ষ্মী তো নিল না।"

—"নিবি না ক্যান? দে দেখি ওকে?" প্রাণকেষ্ট চিৎকার ক'রে লক্ষ্মীকে ডাকে।

লক্ষ্মী এসে মাথা নীচু ক'রে দাঁড়ায়।

প্রাণকেষ্ট বলে—"এবারে দে নন্দ। আমার সামনে দে—"

লক্ষ্মী হাত পাতলে নন্দ আলগোছে সেটা হাতের ওপর ফেলে মুচকি হাসে। সে সাইকেল নিয়ে বার হ'য়ে যায়।

বর্ডারে গুলি চলে। ধানকাটা নিয়ে নাকি গোলমাল। খবরটা চারদিকে ছড়িয়ে পড়ল দেখতে দেখতে। সবারই এক চিন্তা, এমন দেশটা দিনে দিনে হলো কি! আজই না হয় বর্ডার হ'য়েছে, তাই বলে দেশটা তো আর বদলে যায় নি। মানুষগুলো তো

ঠিক আগের মতই আছে। মৈজুদ্দিনের রান্নাঘর আর শোবার ঘরে কতটুকু তফাৎ? রান্নাঘর থেকে শোবার ঘরে গুলি চলছে নাকি? অবনী মণ্ডলের ক্ষেতই না হয় দুভাগ হ'য়েছে। কিন্তু দুদিকের ক্ষেতের ফসলের তো জাত বদলায় নি। এদিকে আমন ধান হ'লে, ওদিকেও আমন ধান হবে। এদিকে আউষ হ'লে ওদিকে আউষই হবে। তবে কেন গুলি চলে কেউ বোঝে না, কেন। বর্ডার হয়েছে বলে তো মাঝখানে পাহাড় ওঠে নি। অতই যখন 'বর্ডার' 'বর্ডার' কর তখন কৈলাস পাহাড়টাকে এনে মাঝখানে বসিয়ে দিলেই তো হয়। ল্যাঠা চুকে যায়।

সীমান্তের জটিলতায় সরল গ্রামবাসীরা এখনো অভ্যস্ত হয়নি। এই তো সেদিন এমন হ'লো—এক বছর হ'য়েছে, কি হয় নি।

যেখানে ডাকাতিই হ'তো লাঠিসোটা নিয়ে, সেখানে ধান-কাটার মত সামান্য ব্যাপার নিয়ে গুলি চলে, এ আবার কি কথা! ধানকাটা নিয়ে আগেও খুন জখম হ'য়েছে। কিন্তু সে সমস্ত হ'য়েছে লাঠি নিয়ে। কেন, মিয়াজানের মাথা ফাটায় নি তফিলউদ্দিন? সদা বৈরাগী খুন হয় নি রাখালের সড়কি খেয়ে? তখন তো বর্ডার ছিল না।

গুলি চলার ব্যাপারটা নন্দই ছড়িয়ে দেয় চারদিকে। সাইকেলে সে যত বেশী চলাফেরা করতে পারে, তেমন আর কেউ পারে না।

একজন সিপাই নাকি ভালরকম জখম হয়েছে। তাকে সদর হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়েছে। নন্দ দেখেছে সেই সিপাইকে। সদরে নাকি পৌঁছতে হবে না তাকে। রাস্তাতেই হয়ে যাবে। যে রাস্তা—বাব্বাঃ।

দুদিন পরে দুপক্ষের ম্যাজিস্ট্রেট বর্ডারে এলেন। কি সব আলোচনা হ'লো তাঁদের মধ্যে। তারপরে আবার সব শান্ত।

বাইরে শান্ত হলেও মনে মনে সবাই কেমন যেন চঞ্চল হ'য়ে উঠল। বর্ডার পার হ'য়ে আগে যেমন নিশ্চিন্তে ওদিকে যেতো তারা এখন আর তেমন যায় না। ভয় ভয় করে। এমনকি ওদিকের আত্মীয়ের বাড়িতেও যেতে চায় না কেউ। কি জানি, কখন কি হয়। গুলি চলার তো আর মা-বাপ নেই। চললেই হ'লো। নন্দ আরও খবর এনেছে, ওদিকে অনেক সময় এদিকের লোককে নাকি আটকে রাখে —কোর্টেও চালান দেয়।

বর্ডারের ওপারের অতি পরিচিত গ্রামগুলোকে আজকাল রহস্যময় বলে মনে হয়। মনের মধ্যে একটা ছাপ ধীরে ধীরে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে—ওটা সত্যিই অন্য রাজ্য। ও রাজ্য আমাদের নয়। কেদারপুর, মাকালডিঙি, হাসানগঞ্জ, বারদোগরা সবই ও-রাজ্যে, হাসানগঞ্জের মেলায় কেউ যেতে পারে না। গেলেও সংকোচে চলাফেরা করতে হবে। মাকালডিঙির হাটে আর আগের মত নিশ্চিন্তে যাওয়া চলবে না। তাদের অবাধ গতিবিধির একটা দিক চিরকালের জন্য বন্ধ হ'তে চলেছে।

অঘোর পাড়ার হাটে শ্বশুরের গ্রামের একজন লোকের সংগে দেখা হয়ে গেল হরেকেষ্টর। শ্বশুরের গ্রাম ছাড়িয়ে পোয়াটেক রাস্তা হাঁটলেই মৈজুদ্দিনের বাড়ির বর্ডার। হরেকেষ্ট জানে সেখানে গুলি চলেনি, কিংবা অন্য কোনরকম গোলমাল হয়নি। তবুও বর্ডারের কথা নিয়ে লোকটার সংগে কথোপকথন সুরু করল। তার আসল উদ্দেশ্য উমার কথা জেনে নেবার।

অনেকদিন তার কোন খবর রাখে না। কিন্তু কেষ্টুকাকীর ভয়ে সোজাসুজি তো জিজ্ঞাসা করা যায় না।

একথা সেকথার পরে এক সময় উমার কথা আপনা থেকেই উঠল। লোকটাই বলল—"তোমার বড় শালীর ছাওয়াল হইয়েছিল, বাঁচল না।"

—"সে কি? মরল কি করে?" হরেকেষ্ট দুঃখিত হয়।

—"জম্মানোর সাথে সাথে ভর করল যে—" লোকটা ফিস্‌ফিস্ ক'রে বলে, যেন কোন অশরীরী কেউ শুনে ফেলেছে।

—"তাই নাকি?"

—"হ্যাঁ গো। আরে, আমিই তো পেরথম টের পালাম। তবে না ওরা ওঝা ডাকল।" লোকটা গর্বের সংগে বলে।

—"কি ক'রে টের পেলে?" হরেকেষ্টর স্বরে কৌতূহল।

—"ক্যান কত দেখনু। জম্মানোর সাথে সাথে রঙ-বদল হৃতি লাগল।

—"রঙ-বদল?"

—"হ্যাঁ হ্যাঁ। একবার লাল হৃতি লাগল। আবার তখুনি সাদা। একটু পরে আবার কালো। চোখ দুটো ড্যাবডেবে—গিলে খাতি চায় যেন। দেখেই বুঝনু।"

—"ওঝা কি বলল?"

—"বলবি আর কি। আমি যা বলিছিলাম তাই বলল। পেঁচোয় পেইয়েছিল ছাওয়ালডাকে।"

—"ওঝা কি করল তখন?"

—"কত করল। কিন্তুক করলি হবি কি? জব্বর জিনিস ভর করিছিল। এক কড়াই ত্যাল জ্বাল দেওয়া হল। ছাওয়ালডার

নাক টিপে সরষে পড়ে কিছু না হলি ত্যালের মধ্যি ফেলা হতো। সরষেতেই গেলো। কিন্তুক ছাওয়াল বাঁচল না।

হরেকেষ্ট অবাক হ'য়ে শোনে। বলে—"ছেলের মায়ের ক্ষতি হয় নি তো?"

—"না তা হয় নি। উমার শরীর তো ভালই দেখনু।"

উমার কথা ভেবে হরেকেষ্টর মন একটু খারাপ হ'লো। হাজার হোক প্রথম ছেলে। উমা মনে মনে কত কিছু কল্পনা করেছিল নিশ্চয়। বুড়ো স্বামী দিয়ে সুখ না হলেও, ছেলেটা বাঁচলে তাকে নিয়ে ভুলে থাকতে পারত। কিন্তু কপালে নেই। বুড়ো যেরকম শয্যাগত হয়ে পড়েছে, আর কোনদিন ছেলেপেলে হবে কিনা তাই বা কে জানে।

সব কিছু নষ্টের মূলে শ্বশুর। যেমন বিয়ে দিয়েছে, তেমনি ফল পাচ্ছে। টাকা, টাকা—টাকা। টাকায় সব হয় না। যদি হ'তো, তাহ'লে প্রিয়নাথ বিশ্বাস সব চাইতে সুখী হ'তো। টাকার লোভে পয়সাওলা চরিত্রহীন ছেলের সংগে বিয়ে দিয়েছিল মেয়ের। দুদিনেই মেয়েকে তাড়িয়ে দিল জামাই। এখন বাপের বাড়ি পড়ে আছে। প্রথম প্রথম মেয়েটা নাকি বসে কাঁদত সব সময়। এখন নাকি আড়ালে আবডালে এর ওর সংগে ফষ্টিনষ্টি করে বেড়ায়। প্রথমে যত কাঁদত, এখন তার দ্বিগুণ হাসে। কিন্তু তাতে কি প্রিয়নাথের সুখ বেড়েছে?

উমার কথা ভাবতে গিয়ে হরেকেষ্টর খুদির কথা মনে হয়। খুদির ওপর তার খুব টান। কিন্তু সে টান স্নেহের টান। কষ্ট করে ভাবতে হয় যে খুদি তার বউ। তবু খুদিকে কি সে ভালবাসে না? খুব বাসে। সে এক এক সময় ভাবে, পৃথিবীতে

কে কে মরলে সে কাঁদবে। প্রথমে বাবার কথা ভাবে। হ্যাঁ, কাঁদবে একটু। লক্ষ্মী মরলে? সবচেয়ে বেশী কাঁদবে। নীলু মরলেও কাঁদতে পারে, অন্ততঃ খুব দুঃখ হবে। উমা মরলে? দুঃখ হবে, কিন্তু কাঁদবে না। নন্দ মরলে দুঃখও হবে না, আনন্দও হবে না। তবে লক্ষ্মীর সংগে বিয়ের আগে যদি মরে তাহ'লে নিশ্চিন্ত হবে। খুদি মরলে? হরেকেষ্ট ভেবে অবাক হয় যে সে সত্যিই কাঁদবে খানিকটা। তবে কার্যক্ষেত্রে কার বেলায় কি হবে কে জানে?

উমা মরলে হরেকেষ্ট কাঁদবে না জানে, তবু উমার কথা ভাবতে তার ভাল লাগে। তার সেই কথা, সেই চাহনি, সেই ভংগী—ওখান থেকে চলে আসার পরে প্রতিদিনই বোধহয় মনে হয়েছে। প্রথম প্রথম তো প্রায় সব সময়ই ভাবত। এখন একবার গেলে হয় ওখানে। কিন্তু গেলে খুদিকে নিয়ে যেতে হয় বলেই তো মুশকিল। সারাটা পথ কোলে করা কি মুখের কথা? ভাবতেও গা ঘেমে ওঠে। কিন্তু না নিয়ে গেলেও তারা মন খারাপ করবে। খুদিরও কষ্ট হবে—অতটুকু মেয়ে।

হরেকেষ্ট মনে মনে ঠিক করে, যদি যায় তাহ'লে খুদিকে নিয়েই যাবে।

সেদিন নন্দ বিজয়ীর মত হার-ছড়াকে লক্ষ্মীর হাতে ফেলে দিয়ে চলে গিয়েছিল বটে, কিন্তু লক্ষ্মী সে হারের দিকে আর তাকিয়েও দেখেনি। প্রাণকেষ্ট দু' চারবার জিজ্ঞাসা করেছিল; কিন্তু সে উনোনের আঁচে নষ্ট হ'য়ে যাবার অজুহাত দেখিয়েছিল।

প্রাণকেষ্ট পুরুষ বলেই সে নিস্তার পেয়েছিল। মেয়ে হ'লে হার-ছড়া না পরা অবধি খুঁচিয়ে খুঁচিয়ে অতিষ্ট ক'রে তুলত।

লক্ষ্মী বুঝতে পারছিল না হার নিয়ে সে কি করবে। নীলুকে একবার জিজ্ঞাসা করলে হয়। কিন্তু কয়দিন হ'লো সে আর আসছে না। লক্ষ্মী প্রথমে ভেবেছিল তার হয়তো কাজ বেড়েছে। গরু কিংবা জমি কেনার তো সামর্থ্য নেই, তাই এ-বাড়ি ও-বাড়ি খেটে মায়ে-পোয়ের সংসার চলে। পরের বাড়িতে খাটতে হ'লে খুসীমত অবসর মেলে না।

কিন্তু পরে হরেকেষ্টর কাছে আসল কারণ জানতে পারল। প্রাণকেষ্ট নাকি শাসিয়ে দিয়েছে নীলুকে, যাতে সে আর এ বাড়িতে না আসে। শুনে লক্ষ্মী স্তব্ধ হয়ে যায়। ছেলেবেলা থেকে যে এ বাড়িতে না এসে থাকে নি তার সংগে প্রাণকেষ্ট শেষে টাকার লোভে এই ব্যবহার করল? অপমানের খোঁচা যেন লক্ষ্মীর নিজের বুকে গিয়ে লাগে। তার মনে হয় এখুনি ছুটে চলে যায় নীলুর বাড়ি। থাক পড়ে সংসার। তার কি?

হরেকেষ্ট বোনের মুখের দিকে চেয়ে সব কিছুই অনুমান করে। সে হেসে বলে—"তোর ভয় নেই রে। আমি নীলুকে চুপ করে থাকতে বলেছি। সে আসবে ঠিক দেখিস। সকলের সামনেই আসতে বলতাম। তাতে বাবা মারা যাবে। রাগেই মরবে।"

হরেকেষ্টর কথায় অভূতপূর্ব আবেগে লক্ষ্মীর ঠোঁটদুটো কাঁপতে থাকে। সেই আবেগ সংযত করতে গিয়েও চোখ ঝাপসা হ'য়ে যায় তার। ধীরে ধীরে এগিয়ে এসে হরেকেষ্টর পায়ের ওপর মাথা রাখে।

—"এ কি করছিস ?" হরেকেষ্ট অবাক হয়।

—"তুমি মানুষ নও দাদা।"

—"আমি মানুষই। দেবতারা কি মানুষের মনের কথা বোঝেন ? তাঁরা অনেক উঁচুতে যে—"

দাদাকে লক্ষ্মী সব সময়েই দেখছে। অথচ মনে হয় ক-ত উঁচুতে সে। ঠিক সাধারণ মানুষ নয়। সে মাঝে মাঝে কেমন কেমন কথা বলে বটে, কিন্তু কেমন কেমন হ'লেও একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না।

হরেকেষ্টর কথায় আশ্বস্ত হবার পরও আরও দুদিন কেটে গেল—নীলু এলো না। অধীর আগ্রহে সমস্ত দিন অপেক্ষা ক'রে রাত হ'লে অবসাদে ভেঙে পড়ে লক্ষ্মী। আগে হলে সে নীলুদার বাড়িতে চলে যেত। কিন্তু এ-বয়সে সেটা সম্ভব নয়। নীলু এখন অনেক দূরের মানুষ। তাকে শুধু স্বপ্নে দেখতে পাওয়া যায়! রক্তমাংসের শরীরে শক্ত মাটির ওপর তার দেখা পাওয়া অত সহজ নয়!

স্বপ্নে দেখেছিল লক্ষ্মী—পুকুরের ঐ-পারে গালে হাত দিয়ে চুপটি ক'রে বসে রয়েছে নীলু। এপার থেকে লক্ষ্মী তাকে কত ডাকল, কত হাতছানি দিল, তবু এদিকে এলো না সে। শুধু মুখ তুলে তার দিকে একটু চেয়ে নির্মম হাসি হেসে আবার গালে হাত রাখল। তাই দেখে মরিয়া হ'য়ে লক্ষ্মী জলে ঝাঁপ দিল। কিন্তু কিছুতেই সাঁতরে পার হ'তে পারল না। কে যেন তার পা দুটোকে টেনে ধরে জলের নীচে নিয়ে যেতে লাগল। তার দম আটকে যায়।—ঠিক সেই সময় ঘুম ভেঙে গেল তার।

স্বপ্নের কথা ভেবে লক্ষ্মী কেঁদে ফেলে। সত্যিই কি এমন

হবে? সত্যিই কি সে দূরে থেকে যাবে এ-জন্মে? বিষণ্ণ মুখে একটু হাসি ফুটিয়ে নীলু কি শুধু জানিয়ে দেবে যে, সে কখনো ভুলবে না তাকে?

সন্ধ্যা হ'লো। এঁটো থালা-বাসন কখানা আর কলসী নিয়ে লক্ষ্মী পুকুরঘাটে গেল সেগুলো মেজে আনতে। পুকুরের কালো জল আরও কালো হ'য়ে উঠেছে। চারদিকের গাছপালায় পাখীদের কলরব। তারা সব বাসায় ফিরে এসেছে। বাচ্চাদের খাওয়ানো প্রায় শেষ হ'লো তাদের। শুধু দু'একটা বাসা থেকে বাচ্চাদের চিঁ চিঁ ডাক তখনো শোনা যাচ্ছে।

লক্ষ্মী ভাবে গলায় দড়ি দেবার চেয়ে গলায় কলসী বাঁধা অনেক সহজ। কেমন নিশ্চিন্তে ধীরে ধীরে তলিয়ে যাবে পুকুরের সেই নীচে যেখান থেকে ডুব দিয়ে হাতের মুঠোয় কাদা তুলে এককালে নীলু বাহাদুরী নিত। সাঁতার লক্ষ্মীও ভাল জানে, কিন্তু মাঝ-পুকুরে ডুব দিয়ে কাদা তুলতে পারে নি সে কখনো। অত দম কোথায় তার? নীলু এক একবার ডুব দিয়ে উঠতেই চাইত না। লক্ষ্মীর কত ভয় হ'তো। কেঁদেও ফেলেছে কতদিন।

কাদা তুলতে কোনদিন না পারলেও জল-ভরা কলসী আজ তার দেহখানাকে সেই কাদায় নিয়ে ফেলতে পারবে। শেষে নীলুই হয়তো ডুব দিয়ে তাকে টেনে তুলবে। তখন কি নীলু কাঁদবে? সকলের সামনেই কাঁদবে কি?

হঠাৎ নন্দর দেওয়া হার-ছড়ার কথা তার মনে পড়ে যায়। সেটাকে আগে ফেলতে হবে। বাড়ির ভেতরে গিয়ে নিয়ে আসে লক্ষ্মী। বাড়িতে এখন কেউ নেই। শুধু খুদি একমনে বসে পুতুল খেলছে।

পুকুর-ঘাটের প্রায় জল ছুঁয়ে বসে লক্ষ্মী। জলের গভীরতা তার মনেও। সে চমকে ওঠে মানুষের স্পর্শে। ভীত হয় নন্দ ভেবে।

নীলু। আবছা অন্ধকারের মধ্যে নীলুর মুখের হাসি সে দেখতে পেলো—সেই স্বপ্নে দেখা হাসির মত। কোন কথা বলতে পারে না সে।

—"কি ভাবছো লক্ষ্মী, একা একা বসে।"

—"কিছু না—" থর থর করে কেঁপে ওঠে তার ঠোঁট। এতদিন পরে দেখা দিয়েও নীলু জানতে চায় যে সে কি ভাবছে। এটুকু কি সে বুঝতে পারে না? কিংবা জেনেশুনেও ইচ্ছে ক'রে সে প্রশ্নটা করল, কিছু বলে কথা সুরু করার জন্যে। বোধহয় তাই। নীলুর মানসিক অবস্থাও তো তারই মত।

—"এই অসময়ে এখানে বসে কেন?"

—"তুমি?"

নীলু চুপ হয়ে যায়।

লক্ষ্মী বলে—"ভাবছিলাম, এককালে তুমি এই পুকুরের মাঝখান থেকে কাদা তুলতে। দরকার হলে অন্য কিছু তুলতে পারবে তো?"

—"কি?"

—"মরাদেহ।"

—"ছিঃ লক্ষ্মী। এত ছেলেমানুষ তুমি?"

লক্ষ্মী সেকথার জবাব দেয় না। সে তার হাতের মুঠো খুলে ধরে নীলুর সামনে। অন্ধকার আরও গাঢ় হয়েছে বলে সে ঠিক বুঝতে পারল না, কি দেখাতে চায় লক্ষ্মী।

—"এটা কি ?" সে প্রশ্ন করে।

—"দেখতে পাচ্ছো না ?"

নীলু লক্ষ্মীর হাত থেকে জিনিসটা তুলে নিয়ে বলে—"বাঃ! সুন্দর হার। সোনা ?"

—"না, নকল। খাঁটি নয়।"

—"তবু চমৎকার হ'য়েছে।"

—"কে দিয়েছে বল তো ?"

—"জানি না।"

—"তুমি তো আমাকে কিছু দাও না নীলুদা।"

—"কি দেবো ভেবে পাইনে। তাছাড়া দামী জিনিস কেনার মত পয়সাই বা কোথায় ?"

নীলু দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—"এটা নন্দ দিয়েছে।" লক্ষ্মীর স্বর গম্ভীর।

তার কথায় নীলুর বুকের ভেতরটা কেমন ক'রে ওঠে। সামলে নিয়ে বলে—"নন্দদার পছন্দ আছে। তাছাড়া কোন জিনিস মেয়েদের দিতে হয় সে জানে। তুমি সুখী হবে লক্ষ্মী।"

লক্ষ্মীর মনে হ'লো কলসীটা গলায় ঝুলিয়ে তখনই নেমে যায় পুকুরে। সে নীলুর হাত থেকে হার-ছড়া নিয়ে সজোরে পুকুরের জলে ছুঁড়ে দেয়। অন্ধকারের মধ্যে কোথায় যে পড়ল সেটা বোঝা গেল না! তবে জলের মধ্যেই পড়েছে, কারণ 'গুপ্' ক'রে একটা শব্দ দুজনাই শুনলে।

—"একি করলে লক্ষ্মী ?"

—"ঠিকই করেছি।"

ভেতর থেকে প্রাণকেষ্টর গলা পাওয়া যায়। চেঁচিয়ে সে

ডাকছে লক্ষ্মীকে। লক্ষ্মী জানে তার দেখা না পাওয়া পর্যন্ত প্রাণকেষ্ট থামবে না। তার স্বভাবই তাই।

—"তুমি চলে যাও নীলুদা।"

—"পালাতে বলছ?"

—"হ্যাঁ, তাই।"

—"পালাতে জানি না। আসুক তোমার বাবা।"

—"আমার জন্যেই না হয় পালাও। অত্যাচার যে আমাকেই সইতে হবে।"

নীলু ধীরে ধীরে পুকুরের পাড় ধরে চলে যায়। লক্ষ্মী এঁটো বাসনগুলো কোনরকমে জল দিয়ে ধুয়ে গা ডুবিয়ে বাড়ির ভেতরে আসে।

তাকে দেখে প্রাণকেষ্ট চেঁচিয়ে ওঠে—"অন্ধকারে পুকুরঘাটে যাস্ ক্যান্?"

—"বাসন ধুতে।" সে ছোট্ট জবাব দেয়। বড় জবাব দিলে প্রাণকেষ্ট শান্ত হবে না সে জানে।

—"বাসন ধুতি। আমি য্যান কিছু বুঝি না, ঘাস খাই, তাই না? দুবেলা ঘাস রেঁধে দিস আমাকে? কে আইছিল বল্।"

—"কেউ আসে নি। তুমি যেরকম আরম্ভ করেছো যম আসবে শিগগিরই।"

—"চুপ কর্ হারামজাদী।"

প্রাণকেষ্ট এর আগে এমনভাবে মেয়েকে কোনদিন বলে নি। লক্ষ্মী তাই সহ্য করতে পারে না। কেঁদে ফেলে সে। খুদি দাওয়ায় বসে এতক্ষণ মশা তাড়াচ্ছিল। পুতুলগুলো সামনে ছিটিয়ে রয়েছে। লক্ষ্মীকে কাঁদতে দেখে সে এসে তার গা ঘেঁষে দাঁড়ায়।

লক্ষ্মী খুদিকে বলে—"তুই তোর সংসার বুঝে নে বউ। আমাকে ছেড়ে দে। আমি আর পারি নে।"

তার কথাগুলো খুদি ঠিক বুঝতে পারে না। তবে তাকে যে একটা কাজের ভার দেওয়া হচ্ছে সেটা সে বুঝল। তাড়াতাড়ি গিয়ে ঘরের কুলুংগী থেকে প্রদীপ আর দেশলাই বার ক'রে এনে লক্ষ্মীর হাতে দেয়। সন্ধ্যায় তুলসী তলায় আলো দেওয়া যে অবশ্য কর্তব্য এটা সে জানে। সেটা আজ বাদ পড়েছে বলেই প্রাণকেষ্ট লক্ষ্মীকে বকছে বলে তার ধারণা হ'লো।

খুদির কচি হাতের এই কাজটুকু লক্ষ্মীর বড় ভাল লাগল। মনের অস্থিরতার মধ্যেও যেন প্রবোধ পেল সে। প্রদীপটা জ্বেলে খুদির হাতে দিয়ে সে বলে—"যা তো বউ, তুলসী তলায় দিয়ে পেন্নাম ক'রে আয়। শিখে নে সব। হাতের আড়াল দিয়ে আস্তে আস্তে যা, বাতাস আছে।"

কাজটুকু পেয়ে গর্বে খুদির বুক ভরে উঠল। বয়সের অনুপাতে নিপুণভাবেই সে তুলসী তলায় প্রদীপ রাখল। লক্ষ্মীর মত গলায় আঁচল দিয়ে সে অত্যন্ত শান্ত আর নমনীয়ভাবে মাথা ঠেকালো প্রদীপের নীচে। যেন কাজটা সে বরাবরই করে। প্রাণকেষ্ট অবধি গালাগালি বন্ধ ক'রে বিস্মিত দৃষ্টিতে চেয়ে থাকল। লক্ষ্মী এগিয়ে গিয়ে তাকে কাছে টেনে এনে ভিজে কাপড়ে জড়িয়ে ধরে বলে—"তুই বউ ঘরের লক্ষ্মী। আর জন্মের অভ্যেস এখনো ভুলিস নি।"

প্রাণকেষ্ট দাওয়ায় বসে বিবেকের দংশনে জ্বলছিল। মেয়েকে এভাবে আগে কোনদিন বলেনি সে। এখন যেন তার নিজেরই অবাক লাগে কি করে সে বলল। সংসারের সব কাজ লক্ষ্মী

একাই করে ; সাহায্য করার দ্বিতীয় লোক নেই। সময় অভাবে কতদিন রাতেও পুকুরঘাটে গিয়েছে সে। কোনদিন তো কিছু বলার প্রয়োজন হয় নি। আজ হঠাৎ কেন এমন উদ্ভট সন্দেহের পোকা তার মাথায় ঢুকল ? মেয়ের দিকে তাকাতে তার সংকোচ হ'লো। তাকে ওভাবে বলে নিজেই যেন ছোট হ'য়ে গিয়েছে। নিজেকে সহজ করে নেবার জন্যে লক্ষ্মীকে ভালমুখে দু'চারটে কথা বলার সুযোগ খুঁজছিল সে। কিন্তু লক্ষ্মী তার কাজের মধ্যেও যেভাবে নিঃশব্দে চোখের জল ফেলে চলেছিল, তাতে কিছু বলতে সাহস পেলো না প্রাণকেষ্ট।

হরেকেষ্ট বাড়িতে এলো। প্রাণকেষ্ট একটু কেশে গলাটাকে পরিষ্কার ক'রে নিল। খুব সাধারণভাবে কোন কথা বলতে হবে ভেবে সে আরও আড়ষ্ট হ'য়ে গেল। নিজের ছেলে আর মেয়ের কাছে এই আড়ষ্টতা সে প্রথম অনুভব করল আজ। এতদিনে বুঝল এরা সত্যিই বড় হয়েছে।

হরেকেষ্টকে দেখে খুদি একহাত লম্বা ঘোমটা টেনে দেয়। শ্বশুরের সামনে স্বামীকে দেখলে যে বড় রকম ঘোমটা দিতে হয়, এটা সে দুদিন হ'লো শিখেছে লক্ষ্মীর কাছে। অভ্যাসটাকে ভালভাবে রপ্ত করার জন্যে যখনই সে হরেকেষ্ট আর প্রাণকেষ্টকে একসংগে দেখে তখনই তাদের সামনে খালি মাথায় গিয়ে ঘোমটা টেনে দিয়ে চলে আসে। লক্ষ্মী আড়াল থেকে কাণ্ড দেখে হেসে গড়াগড়ি যায়। কিন্তু মুখে কিছু বলে না। খেলার ছলেই অভ্যাস হয়—একথা সে মায়ের মুখে শুনেছে। বড় হ'লে ছেলে মানুষ আর সংসার করবে বলেই তো মেয়েরা ছোটবেলায় পুতুল খেলা আর রান্নাবান্না খেলা করে।

হরেকেষ্ট এলে খুদি ঘোমটা দিলেও ধীরে ধীরে তার পাশে গিয়ে দাঁড়ায়। বাবার চোখের সামনে তাকে এভাবে দাঁড়াতে দেখে হরেকেষ্টর লজ্জা হ'লো। লক্ষ্মীও জায়গা বুঝে ল্যাম্ফোটা রেখেছে। সব আলো এসে পড়ছে তাদের দুজনের ওপর। সে তাড়াতাড়ি বলে—

—"লক্ষ্মীর কাছে যা।"

খুদি অস্ফুট স্বরে বলে—"দিদি কাঁদছে।"

—"কি বললি? কাঁদছে? কেনরে?

—"বাবা বকেছে!"

খুদি হরেকেষ্টকে কি বলল, প্রাণকেষ্ট তা শুনতে পায়নি। কিন্তু তাকে যখন সে ব্যস্তভাবে রান্নাঘরের দিকে এগিয়ে যেতে দেখল তখন অস্বস্তিতে সে চঞ্চল হ'য়ে উঠল। সে বুঝল, হরেকেষ্ট লক্ষ্মীর চোখের জল নিশ্চয় দেখে ফেলবে। আর দেখলে তাকে দু'চার কথা না শুনিয়ে ছাড়বে না। হরেকেষ্ট আজকাল বড় বেশী তর্ক করে। প্রাণকেষ্ট রেগে উঠতে যদিও সে থেমে যায়, কিন্তু রেশটা যেন তার মধ্যে অনেক্ষণ ধরে তোলপাড় করে। প্রাণকেষ্টও আগের মত আর জোর পায় না। সব কিছুতেই এখন ছেলেমেয়ের ওপর নির্ভর। হাঁপানীটা তার শত্রু হ'য়েছে। তিন বছরে তার বয়স পনেরো বছর বেড়ে গিয়েছে। এক একদিন রাত্রে কাসতে কাসতে প্রাণ যেন বার হ'য়ে যায়। তখন লক্ষ্মীই উঠে এসে তেল মালিশ ক'রে দেয় সারা বুকে আর গলায়। তাতে একটু আরাম বোধ হয়। হাঁপানী যদি না হ'তো তাহ'লে কি হরেকেষ্ট সামনে দাঁড়িয়ে কথা বলতে সাহস পেতো? লক্ষ্মীর বিয়ের জন্যেও এমন এখন-তখন করতে হতোনা।

হরেকেষ্ট লক্ষ্মীর চোখের জল দেখল। বলল—"বাবা কি বলেছেরে—"

—"তোমাকে আবার কে বলল।"

—"খুদি।"

—"বউকে সামলাও দাদা, এই বয়সেই লাগাতে শিখল।"

—"কি হয়েছে বল্ না।"

—"কিছু হয়নি তো"—লক্ষ্মী হাসার চেষ্টা করে।

—"বলবি না?"

—"বাবা বকেছে।"

—"সে তো শুনলাম। কেন বকল?"

—"অন্ধকারে পুকুর ঘাটে গিয়েছিলাম।"

—"সেতো নতুন যাচ্ছিস নে।"

লক্ষ্মী আর থাকতে পারে না। ফুঁপিয়ে কেঁদে ওঠে। সে সমস্ত ঘটনা বলে যায়। নীলুর কথাও বাদ দেয় না। প্রাণকেষ্টর সন্দেহ অমূলক নয়। কিন্তু নিজের মেয়েকে ওভাবে বলাতেই লক্ষ্মীর লেগেছে। আজ যদি নন্দ এসে পুকুর ঘাটে অশোভন কিছু করে যেত, তাহ'লে প্রাণকেষ্ট দেখেও চুপ ক'রে থাকত হয়তো। হয়তো কেন, নিশ্চয়ই। লক্ষ্মীর সে ধারণা হয়েছে আজকাল বাবার সম্বন্ধে। অথচ কিরকম খাঁটি ছিল তার বাবা। জেদী আর রাগী বলে তাকে সকলে জানলেও, একথাও জানত যে খাঁটি লোক যদি থাকে কেউ এ দিগরে তো প্রাণকেষ্ট। তার গরুর দুধের মতই প্রাণকেষ্ট খাঁটি ছিল। সে গর্ব ভেঙে চুরমার হয়েছে—শোচনীয়ভাবে ভেঙেছে।

লক্ষ্মীর মুখে সব শুনে হরেকেষ্ট গম্ভীর হয়। কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে

থেকে বলে—"কাঁদিস না লক্ষ্মী। এমন হবে সে তো জানা কথা। যেরকম দেখছি, মারধোর খাবার জন্যেও তৈরী থাক। মনকে শক্ত কর। নন্দর হাত থেকে বাঁচতে হ'লে এটুকুতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?"

হরেকেষ্টর কথায় লক্ষ্মী সান্ত্বনা পায়। চোখের জল মুছে ফেলে বলে—"বাবাকে কিছু বলো না দাদা। হাঁপানী বেড়েছে। কিরকম সাঁই সাঁই আওয়াজ আসছে শুনতে পাচ্ছো না?"

হরেকেষ্ট রান্নাঘর থেকে বার হ'য়ে আসে। প্রাণকেষ্ট তাকে দেখে আবার একটু কাসে। বলে—"বডারের নতুন খবর আছে নাকিরে—"

—"জানিনে—"

—"নন্দ বলছিল—"

—"নন্দ তো সবই জানে। ওর কথা বাদ দেও।" বাপকে জোর ক'রে থামিয়ে দেয় সে। প্রাণকেষ্ট আবার ঝিম্ ধ'রে যায়। ছেলেকে ঘাঁটাতে সাহস পায় না।

হংসপুরের ধারে কাছে কোন বড় নদী নেই। ছোট্ট নদী সাগরখালি গ্রামখানাকে তিনদিকে বেষ্টন ক'রে চলে গিয়ে প:চ ক্রোশ দূরের বড় নদীতে মিশেছে। বর্ষাকালে সাগরখালির রূপ খোলে। টলটলে জলের সংগে মেশে বড় নদীর ঘোলাজল। কচুরীপানার স্তূপ ছুটে চলে। টইটম্বুর হ'য়ে ওঠে সাগরখালি। বাঁশের সাঁকো ধুয়ে মুছে কোথায় চলে যায়। আশে পাশের তরমুজের ক্ষেতগুলোর অস্তিত্ব থাকে না। সাগরখালির পরিধি

আর গভীরতা বিশগুণ বৃদ্ধি পায়। খেয়া চলাচল করে দুই পারের সংযোগ রক্ষা করতে। তবু দরিদ্র-ঘরের যুবতী কন্যার যৌবনের মত সাগরখালির যৌবন আর রূপেরও সীমা আছে। তার উদ্দামতাও সমীম। সকলেই জানে জল খুব বেশী বাড়লেও জেলেপাড়ার তেঁতুল গাছের ওপর কখনই উঠবে না।

বর্ষা চলে গেলে সাগরখালি একেবারে সরু হ'য়ে যায়—সরু ফিতের মত। তার জলের নীচের মাটিতে শ্যাওলা ধরে। ঝির ঝির ক'রে যে জল বয়ে চলে তাতে শীতলতা আছে কিন্তু আকর্ষণ নেই। তবে সে জলে মাছ আছে। দরিদ্র ঘরের কন্যার মত, বিগত যৌবনা হ'য়েও সে বহু-পুত্র-প্রসবক্ষমা। তাই এই সামান্য নদীর ধারেও আছে জেলেদের বসতি।

ভোরবেলা উঠে নীলু গেল বলাই হালদারের খড়ার কাছে। বহুদিন ভাল মাছ খেতে পায় নি সে। হবিবপুরের মিঞাদের বাড়ি পাঁচদিন খেটে কিছু পয়সা এসেছে হাতে। পয়সার ব্যাপারে মিঞাভাইরা খুব ভাল। একটুও ঘুরতে হয় না। কাজ শেষ হ'লে নিজেরাই ডেকে পয়সা মিটিয়ে দেয়। তারাও ছোট থেকে বড় হয়েছে। দিনমজুরের পয়সা আটকে রাখলে কতখানি অসুবিধা হয় তারা জানে। ঘোষেদের ছেলে হলেও নীলুকে তারা কাজ দিয়ে বলেছিল—"শুধু একরকম কাম করবা ক্যান্ ভাই। হাজার রকম শিখে নাও, দেখবা পয়সার কষ্ট হবি না। আসছে বছর পাকা ঘর তুলব একখান্। তুমি এসো। রাজ মিস্ত্রীর কাজ শিখে নিও, সেই বেলা।"

মিঞাভাইদের কথার দাম দেয় নীলু। এককালে তারা নিজেরাই মুনিষ খাটতো, এখন বড় লোক। গরীবের ব্যথা যেমন

তারা বোঝে, তেমনি টাকা উপায়ের পথ তারাই বলে দিতে পারে সবচাইতে ভাল। তবে নন্দ যে পথ নিয়েছে সে পথ নয়। মিঞা ভাইরা সৎ। নন্দ কি করে ঠিকমত না জানলেও, এটুকু নীলু জানে যে, সে সৎ-পথে টাকা আনে না।

সাগরখালির নদীর ধারে খড়ার পাশে এসে থামে নীলু। বলাই উঁচুতে খড়ার তিনকোণা বাঁশের ওপর চুপ ক'রে বসে রয়েছে। একটুও নড়ছে না সে। ঘুমিয়ে পড়ল নাকি! আশ্চর্যের নয়। সারা রাত তো জেগেই থাকে, ভোরের ঠাণ্ডা হাওয়ায় হয়তো চোখ বুজে এসেছে। নীলুর ভয় হয় ঘুমের ঘোরে বলাই বুঝি ওপর থেকে জলের মধ্যে পড়ে যাবে।

—"এই বলাই, ঘুমোলি নাকি—"

—"না।" বলাই নীচু গলায় বলে।

—"মাছ টাছ উঠলো?"—নীলু একটু চেঁচিয়ে ওঠে।

বলাই ইসারায় নীলুকে চুপ করতে বলে। খড়া থেকে পঞ্চাশ হাত সামনের দিকে একটা বড় মাছ সদ্য লাফ দিয়েছে সে সেই দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। একশো হাত দূরে যখন লাফ দিয়েছিল তখন থেকেই বলাই হয়তো ঘাপ্‌টি মেরে বসে আছে। এবারে সে শিরদাঁড়াকে সোজা ক'রে বসল। তৈরি হচ্ছে।

বলাই আস্তে বলে—"মাছটা পেলে তোকে দেবো, বুঝবো তুই পয়া আছিস্।"

মাছটা সত্যিই উঠল। আড়াই সের কাল-বাউস।

—"নিয়ে যা নীলু, এটা তোর জন্যেই উঠেছে। সারা রাতে এত বড় মাছ পাইনি।"

কাল-বাউস মাছ নীলু খুব ভালবাসে। শুধু সে নয়, আর

একজনের কথাও তার মনে পড়ল। লক্ষ্মী ছেলেবেলায় কাল-বাউস দেখলে নাচতে স্থরু করত। এখন আর লক্ষ্মী লাফাবেনা নিশ্চয়ই, কিন্তু জিভের স্বাদ তো একই রয়েছে।

নীলু ভাবে, এতবড় মাছ নেওয়া কি ঠিক হবে?

—"কিরে, চুপ ক'রে আছিস কেন, নিয়ে যা—" বলাই ইতিমধ্যে ডিঙিটাকে ডাঙায় ভিড়িয়েছে।

—"অত বড় মাছ নিয়ে কি করব রে।"

—"নিয়ে যা, ভেজে রথিস্। তিনদিন চলবে। কাল-বাউস আর কয়টা পাওয়া যায়।"

নীলুর সাহস হয় না। বলে—"অন্য মাছ নেইরে বলাই? ওইতো ছোট মাছ দেখছি।"

—"থাকবে না কেন? বাটা আছে, খয়রা আছে, বাঁশপাতা আছে, পুঁটি আছে। কিন্তু কাল-বাউস তোকে নিতেই হবে।"

—"কেন, খয়রা নিলেও তো হয়।"

নীলু কেন ইতস্তত করছে বলাই অনুমান করল। তার কষ্ট হ'লো। পয়সার কথা ভেবে ইচ্ছে থাকলেও নীলু হয়তো মাছটা নিতে পারছে না।

সে বলে—"তোকে নিতেই হবে এটা। তোর বরাতে উঠেছে আমি কেন রাখবো? হ্যাঁ, আমি রাখতে পারি, যদি তুই আমার কাছে বিক্রি করিস। দেখ নীলু, তোর কাছে কি আমি কম কৃতজ্ঞ? তুই না থাকলে জগবন্ধু পণ্ডিতের বেতের ঠেলায় মরে যেতাম। মাছ ধরে খেতে হতো না।"

নীলু হাসে। সে অনেকটা সহজ হয়। বলে—"পণ্ডিতের সেই ছড়ার কথা মনে আছে বলাই? তোর কান ধরে ওঠাতেন

আর বসাতেন আর সেই সংগে বলতেন—"

"লিখিব পড়িব মরিব দুঃখে,
মৎস্য ধরিব খাইব সুখে।"

বলাই হাসে। বলে—"খুব মনে আছে। আমি আবার দুঃখের সংগে মিল রেখে বলতাম 'সুঃখে'।"

—"তোর কান ছিঁড়ে গিয়ছিল, সে দাগটা আছে?"

—"নেই আবার। ভাল ক'রে জোড়াই লাগলো না।"—বলাই জোরে হেসে ওঠে।

—"পণ্ডিতের এখন বড় খারাপ অবস্থা রে।"

—"হ্যাঁ, আমি তো গিয়েছিলাম সেদিন। এক কুড়ি মাগুর মাছ দিয়ে এলাম। অতদিন ভুগে উঠল, তাই নিজে থেকেই নিয়ে গেলাম। কিনে তো আর খেতে পারবে না। সেদিন ছড়াটার কথা বলেছিলাম। পণ্ডিত আমাকে জড়িয়ে ধরে কেঁদে ফেলল রে। অবস্থা বড্ড খারাপ। বিধবা মেয়েটাকে নিয়ে আরও মুসকিলে পড়েছে—বয়স কম তো। পণ্ডিত আর কয়দিন।"

—"পণ্ডিত কাঁদলে তুই কি করলি রে বলাই"—নীলুর আগ্রহ হয় শোনার। পাঠশালায় বলাই দু'বেলা পণ্ডিতের মৃত্যু কামনা করত।

—"আমিও কেঁদে ফেললাম। মাইরি বলছি—" বলাই বোকার মত হাসে।

—"কান্না তো পায়ই—" নীলু ছলছল চোখে বলে।

—"ছোটবেলায় কত লোককে শত্তুর বলে মনে হতো, এখন তাদের দেখলে কষ্ট হয়, তাই নারে নীলু?"

—"হ্যাঁরে—"

—"পণ্ডিত কিন্তু তোকে বড্ড ভালবাসতো। বাসবে না কেন, তোর মত মাথা কয়জনের হয়।"

নীলু হাসে, বলে—"তিনি সকলকেই ভালবাসতেন। তুই পড়তিস না, তাই মার খেতিস্।"

—"আমার ওসব মাথায় ঢোকে না। তবু যেটুকু শিখেছি, আশে পাশের গাঁয়ের আর কয়জন জানে তা ?"

বলাই আর নীলু দুজনাই কিছুক্ষণের জন্যে আনমনা হ'য়ে যায়। বলাই নৌকোয়, নীলু ডাঙার। রাত্রি জাগরণের ক্লান্তি বলাইএর চোখে মুখে, সুনিদ্রার সজীবতা নীলুর সর্বশরীরে। দুইটি খেটে-খাওয়া সবল-সুঠাম যুবকের চোখে মুখে যেন এক [illegible]ালু ভাবাবেশ। দুজনাই ছেড়ে আসা অতীতের মধ্যে ডুবে যায়। তাদের চোখের সামনে ভেসে ওঠে জগবন্ধু পণ্ডিতের পাঠশালা, ভেসে ওঠে হরিধন মল্লিকের নারকেল গাছ, যে গাছের ফল শত চেষ্টা সত্ত্বেও বহুদিন ভোগে লাগেনি মালিকের। খাকোহরির সজীব বাগানের কথাও মনে পড়ে—নষ্টচন্দ্রের রাতে সে বাগানে দক্ষযজ্ঞের কাণ্ড ঘটে যেত। সুরেশ কর্মকারের গাঁদা ফুলের বাগান প্রতিবছর সরস্বতী পুজোর দিনে লুঠ হতো। নিতাই মালাকরের তৈরি সরস্বতী প্রতিমার পটল-চেরা চোখে কত মধুই ছিল—চোখ অত সুন্দরও হয়। প্রতিমার হাতের বীণা যেন সাত্যি বীণা। যত খুঁটিয়ে দেখত তারা তত যেন প্রাণবন্ত হ'য়ে উঠত প্রতিমা। শেষে মনে হতো প্রতিমা যেন তাদেরই একজন, তাদেরই মত জীবিত। পাঠশালায় প্রতিমাকে সবাই স্পর্শ করতে পারত। তবু যেন সংকোচ হ'তো স্পর্শ করতে। আবার হাত দিলেই মনে হতো, এ-টুকুতে কি হয় ? পায়ের ওপর

উপুড় হয়ে পড়লে তবে তো শাস্তি। কিন্তু তাতে প্রতিমা যে ভেঙে যাবে। একদিকে প্রতিমার ভংগুরতা সম্বন্ধে সচেতনতা, অপর দিকে প্রতিমার প্রাণ সম্বন্ধে তন্ময়তা—এই দু'এর চাপে এদের মন অস্বস্তিতে ভরে উঠত। কি ক'রে দুইকে এক করা যায়—কি করে দু'য়ের সীমা মুছে ফেলা যায় এ কথাটা ওরা স্পষ্ট ক'রে ভাবতে না পারলেও, ওদের কচি মন যেন তারই সংঘাতে ক্ষতবিক্ষত হ'তো।

বলাইএর খড়ার বাঁশের মাথায় একটা মাছরাঙা পাখী বসেছিল। নৌকোয় মাছের দিকে একদৃষ্টে চেয়ে ছিল সে, কিন্তু ছোঁ মারতে ভয় পেল। চিলের মত সাহসী আর শক্তিশালী করে ভগবান তাকে গড়েনি। হতাশায় ডেকে উঠল সে।

মাছরাঙার ডাকে দুজনার চমক ভাঙল।

—"তাজা থাকতে মাছটা নিয়ে যা নীলু।"—বলাই বলে।

—"দে, কত দাম হবে রে?"

—"দাম আবার কি—

—"আজ তোকে দাম দেবো। তুই 'না' বলিসনে। এখন পয়সা আছে কিনা? যখন পয়সা থাকবে না, অথচ খুব মাছ খেতে ইচ্ছে হবে, তখন এমনি নিয়ে খাবো।"

বলাই হেসে ফেলে। বলে—"বেশ তাই হবে। দামটা তোকে পরে বলব। তোর কাছ থেকে বাজার দরই নেবো।"

নীলুর মা ফেলী অবাক হ'য়ে যায়, এতবড় মাছ তাদের বাড়িতে কবে এসেছিল সেকথা তার মনে নেই। হয়তো বিয়ে হবার একবছরের মধ্যেই। তাই নীলুর হাতে মাছ দেখে সে

বিশ্বাস করতে পারল না যে সেটা এ বাড়ির জন্যেই। কারণ খাওয়ার লোক যখন নীলু একা। তাই বলে—

—"কাল-বাউসটা কার জন্যি আনলি?"

—"আমারই।"

—"সত্যি—" নীলুর মা ছুটে গিয়ে বঁটি নিয়ে আসে। একপাশে মরচে ধ'রে পড়েছিল সেটা। কতদিন ব্যবহার হয়নি। মেজেঘষে পরিষ্কার ক'রে নিতে হবে। বঁটি দিয়ে মাছের মাথা কাটা মেয়েদের সৌভাগ্য—অর্থ আর স্বামী এই উভয় সৌভাগ্যেরই ইংগিত করে। সধবাদের একচেটিয়া হ'লেও ছেলের জন্যে বিধবারাই বা কেন অংশ গ্রহণ করবে না তাতে। ছেলে থাকা কি কম সৌভাগ্যের?

—"মাছটা একটু বড় হ'য়ে গেল মা, নষ্ট হবে না তো?"—লক্ষ্মীর মুখ ওর চোখের সামনে ভাসে। বড় মাছ কবেই বা খায় নীলু। তাই ভাল জিনিষ পেলেই প্রিয়জনদের কথা আগে মনে হয়। বিশেষ ক'রে মাছটা যখন কাল-বাউস। লক্ষ্মীকে না দিয়ে খেতে কি ভাল লাগবে?

নীলুর মা বলে—"নষ্ট হবি ক্যান্। তোর বাপ একবার একটা গোটা ইলিশ মাছ ভাজা খেইয়েছিল। তুই তো তার ছাওয়াল। এডা দুদিনে খেতি পারবি না?"

—"চেষ্টা করলে পারব। ভাত না খেয়ে শুধু মাছই খাবো। কিন্তু সেরকম খেয়ে লাভ কি?"

—"গায়ে জোর হবি।"

নীলু হেসে বলে—"একদিন বেশী ক'রে খেলে গায়ে জোর হয় না মা।"

—"কি জানি বাবা। এতদিন বাদে বড় মাছ পালি, সামনে বসে খাওয়াতি কি সাধ যায় না আমার?"

—"সামনে বসেই খাবো। তবু সবটা শেষ করতে পারব না। হরেকেষ্টদাকে কিছু দিলে হয়।"

—"ওমা, তাদের তো ষাটের অনেক কড়া নোক"—নীলুর মায়ের চোখে আতংক। এ আতংক কিছুদিন আগে হ'লে হতো না। কিন্তু সে শুনেছে লক্ষ্মী তাদের ঘরে আসবে না। গরীব বলে তাদের তুচ্ছ ক'রেছে প্রাণকেষ্ট। তার এমন পরিবর্তন নীলুর মা কল্পনা করতে পারে নি কোনদিন। সে কি আজকে থেকে প্রাণকেষ্টকে চেনে? নদীর ধারের সেই যুবকটির কিছুই অবশিষ্ট নেই আজকের হাঁপানী রুগীটার ভেতরে। এ শুধু পয়সা চেনে। নন্দ টাকা দেবে তাই তার সংগে লক্ষ্মীর বিয়ে দেবে।

—"মাছটা আড়াই সের হবে! আধসের দিলে ওদের চলে যাবে মা।"

—"যা ভাল বুঝিস কর।"

—"লক্ষ্মী এ মাছ বড় ভালবাসে।"

—"আমি কি তা জানিনে? কিন্তুক গিলিয়ে হবি কি? এ হা-ঘরে তো আসবি না সে। তার বাপ তারে [illegible]রাণী করে ছাড়বি।"

—"ছিঃ মা, হলোই বা অন্য জায়গায় বিয়ে। লক্ষ্মী তো তোমাকে ভালবাসে।"

—"তা জানি রে। মিয়েডা সত্যিই লক্ষ্মী। ওর মা যে দুগ্‌গো পিরতিমে ছিল। বাবাডাই হইয়েছে এক উড়নচণ্ডী।"

নীলু বাগান থেকে একটা কলা-পাতা কেটে নিয়ে আসে।

তারপর মা যখন বঁটি ধুতে আড়ালে যায়, সে কাটা মাছ থেকে বড় এক ভাগ কলার পাতায় জড়িয়ে ফেলে। লক্ষ্মীকে তার মা যতই স্নেহ করুক, নিজের ছেলের চাইতে নয়।

মাছ নিয়ে রাস্তায় এসে নীলুর প্রথম খেয়াল হ'লো, লক্ষ্মীদের বাড়িতে যেতে চাইলেই এখন আর আগের মত যাওয়া যায় না। সে দমে গেল। বাড়ি থেকে ছুটতে ছুটতে সে রাস্তায় এসেছিল, এখন গতিটা ঢিলে হ'লো। শেষে ভাবতে সুরু করল আদৌ যাবে কিনা। হাতের মাছের দিকে একবার তাকালো, লক্ষ্মীর মুখ মনে পড়ল একবার—যে মুখ থেকে আগেকার হাসি মুছে গিয়েছে। এখন সে গলায় কলসী বেঁধে ডুবে মরতে চায়। খাওয়া দাওয়া ছেড়ে দিয়েছে কিনা কে জানে। শরীর যেরকম শুকিয়েছে তাতে কিছুই বিচিত্র নয়। এখন যদি সে নিজে হাতে মাছটুকু দিয়ে আসতে পারত, কত আনন্দ হতো তার। কিন্তু সংগে সংগে প্রাণকেষ্টর কথাও মনে হয়। সে এখন বাড়িতে আছে নিশ্চয়। তার কাছে অনর্থক অপমানিত হ'তে চায় না নীলু।

চোখে জল আসে তার। ভাবে, হাতের মাছ ফেলে দিয়ে ছুটে চলে যায় যেদিকে দু'চোখ যায়। চার পাঁচ দিন গা-ঢাকা দিয়ে থেকে ফিরে আসবে। ততদিনে তাদের বাড়ির মাছও নষ্ট হবে। ভালই হবে। লক্ষ্মীরও খাওয়া হবে না, তারও হবে না, কিন্তু মায়ের মুখ মনে পড়ায় কষ্ট হয়। অধীর আগ্রহে ছেলের জন্যে মাছ আগলে বসে থাকবে।

নীলুর শেষে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়। সে যাবেই লক্ষ্মীদের বাড়িতে। ঠিক আগে যেমন যেতো। অপমানের ভয় কিসে? লক্ষ্মীর

জন্যে এটুকু সহ্য করতে পারবে না? লোকে আরও কত সহ্য করে। প্রাণকেষ্ট মারবে? মারুক। পিঠে কালশিরা পড়বে? পড়ুক। মাথা ফাটবে? ফাটুক। চোরের মত এই সংকোচ, আর ভয় তার মনে আসে কেন? সেদিন তো লক্ষ্মীকে বড়াই ক'রে বলে ছিল যে সে পালাতে জানে না। আজ তবে এ মনোভাব কেন? সে চুরি করেনি, ডাকাতিও করেনি। কোন অপরাধই করেনি সে। সে ভালবেসেছে। ভালবাসা অপরাধ নয়। তাহ'লে হরগৌরীও অপরাধী। হাসানগঞ্জের মেলা থেকে কিনে-আনা হরগৌরী মূর্তি তার আর লক্ষ্মীর কাছে দুটো রয়েছে। সে ছেলেবেলায় কিনেছিল লক্ষ্মীকে সংগে নিয়ে গিয়ে।

লক্ষ্মীদের বাড়ির দরজায় এসে সে চিৎকার ক'রে হরেকেষ্টর নাম ধরে ডাকে। কিন্তু লক্ষ্মীকে ছুটে আসতে দেখে সে বিস্মিত হয়।

দিনেরবেলায় সদর রাস্তা দিয়ে হরেকেষ্টকে ডাকতে ডাকতে নীলুকে ঢুকতে দেখে লক্ষ্মীরও যেন বিশ্বাস হয় না।

—"ওকি লক্ষ্মী, বাবার ভয় নেই?"

সে হাত উল্টে বলে—"কেউ নেই আমি একা।"

—"বাঁচলাম"—নীলু স্বস্তি পায়।

—"তোমার হাতে কি নীলুদা—"

—"বল তো কি—" নীলু হাসে।

—"বুঝতে পারছি না তো।"

—"শুঁকে দেখো না।"

সে শুঁকে বলে—"মাছ? কোথায় পেলে?"

—"বলাইএর খড়ায় গিয়েছিলাম।"

—"তুমি খাবে না ?"

—"আমার জন্যে এতো আছে।" নীলু দু'হাত প্রসারিত ক'রে দেখায়।

—"মাছ দেবার জন্যে সদর দিয়ে এলে। বাবা থাকলে কি হতো ?"

—"থাকলেও ভয় পেতাম না। মাছটা যে কাল-বাউস। তোমাকে না দিলে মাছের স্বাদ পেতাম না। তুমি যে ভালবাস এ মাছ।" শুনে লক্ষ্মীর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে।

—"কাঁদছ কেন লক্ষ্মী ?" নীলু তার মাথায় হাত রাখে। তার স্পর্শে সে আরও ফুপিয়ে কেঁদে ওঠে। ছেলেবেলায় নীলুর কোলে মুখ গুঁজে অনেক কেঁদেছে সে। তারপরে এই কয়বছরে কতদূর যেন সরে গিয়েছিল। আজ মনে হলো, তারা আগের মতই আছে।

—"তুমি আমাকে মরতেও দেবে না নীলুদা—"

লক্ষ্মীর কথা শেষ হবার আগেই বেড়ার ফাঁকে একজোড়া তীক্ষ্ণ দৃষ্টির দিকে নীলুর নজর পড়ে। সে চমকে উঠে দু'পা পেছনে সরে যায়।

—"কি !" লক্ষ্মী বিস্মিত হয়। নীলুর দৃষ্টি অনুসরণে তারও চোখ গিয়ে পড়ল বেড়ার ফাঁকে। তার হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে যায়। সে নড়তে পারে না।

প্রাণকেষ্ট নয়, নন্দ এগিয়ে আসে। মুখ দেখলে মনে হয় না যে সে রেগেছে। তবে একটা তীব্র বিদ্রূপ মেশানো রয়েছে তার মুখভংগীতে। নীলুকে সে দেখতেও পায় না যেন। দেখতে

চায় না সে তাকে। সোজা লক্ষ্মীর দিকে এগিয়ে এসে তার সামনে দাঁড়ায়। তার দৃষ্টিতে সব কিছু ছিল, ছিল না শুধু আনন্দ আর পবিত্রতা।

—"আমার হার-ছড়া এইজন্যেই তোমার ভাললাগেনি।"

লক্ষ্মী মুখ নীচু ক'রে থাকে।

—"লজ্জা কি? যার সংগে যার মজে মন—" নন্দ হাসে, ভাঙা ভাঙা হাসি।

তার কথার মধ্যে কোন অশোভনতা খুঁজে পেল না বলে লক্ষ্মীর আরও আতংক হ'লো। সে মুখ তোলে না।

—"কথা বলছ না কেন? ঘেন্না হচ্ছে? নীলুর সংগে কথা বলতে খুব মিষ্টি লাগে, তাই না?"

নীলু প্রথম মুখ খোলে—"ওর দোষটা কি নন্দদা? আমাকে বল।"

—"তোকে তো বলবই। কিন্তু আমার সম্বন্ধটা যে ওর সংগে। একটু আধটু ফষ্টিনষ্টি করলে তো সম্বন্ধ ভেঙে দিতে পারিনে। তোর সংগে পরে বোঝাপড়া হবে। আর বোঝা-পড়াই বা কি হবে, তুই তো হাতের ময়লা।"—নন্দ কুৎসিত হাসি হাসে।

খুদি এতক্ষণ ঘরের মধ্যে ছিল। নীলু আর লক্ষ্মীর নীচু গলার কথাবার্তা সে শুনতে পায়নি। নন্দর চড়া গলা শুনে বাইরে আসে।

তাকে দেখে নন্দ বলে ওঠে—"এই যে বৌঠান। পাহারা দিতে পারো না? ননদের চরিত্তির যে যেতে বসেছে।"

লক্ষ্মীর চোখ জ্বলে ওঠে। নীলুর হাত নিশপিস করে।

নন্দর কথার ধরণে খুদি ভয় পেয়ে আবার ঘরের মধ্যে পালিয়ে যায়। সেবার বাপের বাড়ি থেকে ফেরার সময় নন্দর হাসি শুনে সে ভয় পেয়েছিল তারপর থেকে তাকে দেখলেই খুদির গা ছম্ ছম্ করে।

—"তোমার গায়ে হাত দেবো লক্ষ্মী? ঠিক নীলু যেমন দিয়েছিল একটু আগে—" নন্দর স্বর অদ্ভুত শান্ত।

লক্ষ্মী সভয়ে সরে দাঁড়ায়।

নন্দ হো হো ক'রে হেসে ওঠে। বলে—"ভয় পেলে? জান, এ-হাতে যা রোজগার করি, তাতে দশটা নীলুকে চাকর রাখতে পারি?"

নন্দ সহজে ছাড়বে না। সে সুযোগ পেয়েছে। আজ লক্ষ্মী দুর্বল। নন্দর সংগে বিয়ের কথা হ'য়েছে বলে সে দুর্বল নয়। তাকে সে গ্রাহ্য করে না। কিন্তু গ্রামে এ জাতীয় ঘটনা ঘটা ঘোর কলংকের। অপরাধ ক'রেছে বলে সে মনে করে না। নীলুকে স্পর্শ করা অপরাধ নয়। তার অনুশোচনা, গ্রামের একজন হিসাবে নন্দ তাদের দেখে ফেলেছে বলে।

নন্দ বলে—"কি গো, চুপ কেন? একটু হাত দেবো?"

লক্ষ্মী আরও পেছনে সরে যায়। নীলু এগিয়ে আসে।

নন্দ নীলুর দিকে চেয়ে হেসে বলে—"কিরে তুই এগিয়ে আসছিস কেন? মারবি নাকি?"

—"আমি মারব কেন? যার বোন সেই মারবে। আর একদিন লক্ষ্মীর গায়ে হাত দিয়েছিলে, সেকথা লক্ষ্মী দয়া ক'রে হরেকেষ্টদাকে বলেনি।"

—"কি বললি?" নন্দ ফোঁস ক'রে ওঠে।

—"ঠিকই বলেছি। মেয়েদের গায়ে তুমি জিজ্ঞাসাবাদ করে হাত দেও না, সেকথা কি কারও জানতে বাকী আছে? লক্ষ্মী নেহাৎ হরেকেষ্টদার বোন তাই—"

—"নীলু।"

—"আমি রাগের কথা বলছি না নন্দদা। কিন্তু তুমি কি মনে কর যে লক্ষ্মী তোমার অনুরোধে তার গায়ে হাত দিতে দেবে?"

—"আলবৎ দেবে"—নন্দ লক্ষ্মীর হাত চেপে ধরে।

—"বাবাকে সাড়ে চারশো টাকা দেওয়া হয়েছে?" লক্ষ্মী এতটুকু বিচলিত না হয়ে বলে। নন্দ তার হাত ধরেছে বলে ঘৃণা হলেও ভয় পায় না সে। নীলুই তো সামনে রয়েছে, ভয় কি? নন্দ যেমন দশটা নীলুকে চাকর রাখতে পারে, নীলুও তেমনি পনেরোটা নন্দকে একহাতে মাটিতে ফেলে দিতে পারে।

নীলুর উপস্থিতির চেয়েও বেশী কাজ হ'লো লক্ষ্মীর কথায়। নন্দ তাকে ছেড়ে দিল। রাগে তার সর্বশরীর কাঁপতে থাকে। সে বলে—"ও, তাই নাকি? টাকা দিতে হবে? বেশ, টাকাই দেবো আগে, তারপরে দেখব।"

সে দ্রুতগতিতে বার হ'য়ে যায়। সাইকেলের ঘণ্টা বেজে ওঠে রাস্তার ওপর। লক্ষ্মী আর নীলু বুঝল ঘটনাটা এইখানেই শেষ হবে না—অনেকদূর গড়াবে।

কিন্তু এর পরে তিনদিন কেটে যাবার পরও যখন এ নিয়ে কেউ উচ্চবাচ্য করল না তখন ওরা বিস্মিত হ'লো। প্রাণকেষ্ট লক্ষ্মীকে কিছু বলল না। গ্রামের কেউ তাদের ঠাট্টা করল না। নীলুর মাথা ভাঙল না কেউ। ওরা বুঝল, যে-কোন কারণেই

হোক, নন্দ কথাটা কারও কাছে প্রকাশ করেনি। কিন্তু এত বড় একটা সুযোগ কেন ছাড়ল সে, সেকথা তাদের মাথায় ঢুকল না। শেষে অনেক ভেবে নীলু কিছুটা অনুমান করল। নন্দ হয়তো চায় না যে লক্ষ্মীর কোন বদনাম রটুক। দুদিন পরে তার স্ত্রী হবে সে, তখন তাকেই সব সামলাতে হবে। নীলুর নামে দোষ দিতে পারত নন্দ, কিন্তু লক্ষ্মীও হয়তো নিজের দোষ স্বীকার করে নেবে সমাজের সভায়—যার ফলে সে অতি সহজেই নীলুর ঘরে আসবে। নন্দ তা চায় না, তাই চুপ করে আছে।

হরেকেষ্টকে হঠাৎ আবার শ্বশুরবাড়ি যেতে হ'লো। সেখান থেকে লোক এসে বলল যে খুদির মা হরেকেষ্ট সম্বন্ধে কি এক দুঃস্বপ্ন দেখেছে বলে গ্রামের কালীবাড়িতে পূজো দেবে। জামাই মেয়েকে সে তাই বারবার ক'রে যেতে বলে দিয়েছে। শাশুড়ীকে হরেকেষ্টর মোটামুটি মন্দ লাগে না—সরল গ্রাম্য স্ত্রীলোক, ভালমানুষ গোছের। বিয়ের ব্যাপারে যে প্রতারণা হয়েছিল তাতে তার কোন হাত ছিল না। আর সেটা যে প্রতারণা সেটুকু বুঝবার মত বুদ্ধিও তার নেই। তার ধারণা ছেলে-মেয়ের মধ্যে বিয়ে হলেই হ'লো—বয়সের যত পার্থক্যই থাকুক না কেন। একবার বিয়ে হলেই বুঝতে হবে যে সম্বন্ধটা জন্মজন্মান্তরের।

হরেকেষ্ট এ সম্বন্ধে আগেরবার শাশুড়ীকে প্রশ্ন করেছিল—"যে মেয়ের দুবার বিয়ে হয় তাদের দুটো স্বামীই কি জন্মজন্মান্তরের মা?"

শুনে শাশুড়ী গালে হাত দিয়ে বলেছিল—"ওমা, তা হবি

ক্যান বাবা। আর জম্মে অন্য ব্যাটাছেলে দেখে লোভ হলি পরের জম্মে তার ঘরে একবার যাতি হয়। তারপর সে মরলি পরে, আসল স্বামীর ঘরে যায়।"

হরেকেষ্টর চোখমুখ লাল হ'য়ে উঠেছিল। কথাটা বলার সময় শাশুড়ীর খেয়াল ছিল না যে তার মায়ের দুই বিয়ে। তবু শাশুড়ী ভালই, হরেকেষ্টকে যত্ন ক'রে। শ্বশুরের মত তাকে দেখে পালিয়ে বেড়ায় না।

প্রাণকেষ্টর হাঁপানীর টান চলছেই। যাবার আগে হরেকেষ্ট বাবাকে বলল—"আমি নীলুকে বলে গেলাম, সব কাজ ক'রে দেবে, ওকে কিছু ব'লো না। একটা দিন মুখ বুজে থেকো।"

—"আমি তো মুখ বুজিই থাকি। মুখ খুললি ওকে খাড়ায় থাকতি দিতাম?"

হরেকেষ্ট জবাব দেয় না এ কথার। জানে, তার বাবা অক্ষম বলে মনে মনে নীলুর ওপর যতই রাগ করুক না কেন, মুখে কিছু বলতে সাহস পাবে না।

নিশিথগঞ্জের টিউব-ওয়েলে খুদি জল খেলো। দূর থেকে বটগাছ দেখেই সে চিনতে পেরেছিল। বলেছিল—"জল খাবো।"

—"জল পাবি কোথায়?"

—"ওই বটগাছের নীচে যে টিউ-কল আছে।"

খুদির স্মরণশক্তিতে হরেকেষ্ট অবাক হয়। ছোটখাটো এরকম অনেক ব্যাপারেই সে মাঝে মাঝে তীক্ষ্ণবুদ্ধি আর স্মরণশক্তির পরিচয় দেয়। হরেকেষ্ট মনে মনে ঠিক করে, ফিরে গিয়ে এবার খুদিকে একটা 'বর্ণবোধ' কিনে দিতে হবে। আগে এক

পয়সা দাম ছিল, এখন হয়তো বেড়েছে। খুদির যেরকম যত্ন 'বর্ণপরিচয়' কিনে দিলেও হয়। লক্ষ্মীর মত সপ্তাহে একটা ক'রে ছিঁড়ে ফেলার ভয় নেই।

জগবন্ধু পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া ক'রে হরেকেষ্টর যেটুকু বিদ্যে হয়েছিল, তাতে সে লক্ষ্মীকে 'কথামালা' অবধি শিখিয়েছে। খুদিকেও তাই শেখাবে। লক্ষ্মী কথামালার পর আরও কিছু শিখেছে বলে মনে হয়। সংসারের চাপ ঘাড়ে থাকা সত্ত্বেও তাকে নীলুর পুরোনো ফার্ষ্ট বুকটা নিয়ে ব্যাঙের ছবির পৃষ্ঠা খুলে বসে থাকতে দেখেছে। নীলু তো ফার্ষ্ট বুক শেষ করেও নিজে নিজে অনেক বেশী পড়াশোনা করেছে। সহরে গেলে সে ভাল চাকরী পায়। হরেকেষ্ট তাকে কত বলেছে সেকথা। কিন্তু নীলু বলে যে, সহরে গেলে সে ভদ্রলোক হয়ে যাবে। ভদ্রলোক হতে তার বড় ভয়, তাদের নাকি দয়ামায়া নেই। কি ক'রে এ ধারণা হ'লো কে জানে?

লক্ষ্মী বোকা ছিল না। কিন্তু খুদিকে দেখে মনে হয় সে লক্ষ্মীর চেয়ে অনেক বুদ্ধিমতী।

নিশিথগঞ্জের বটতলায় জল খেয়ে নেয় খুদি। হরেকেষ্ট তাকে বলে—"কিরে, বাঁশের মাচায় একটু বসবি?"

—"হ্যাঁ।"

হরেকেষ্ট তাকে নিয়ে গিয়ে বসে। গণেশ চৌকিদার একটা তেলেভাজার দোকান খুলেছিল বটগাছের নীচে। ইউনিয়ন বোর্ডের পাঁচ টাকা মাইনেতে কি সংসার চলে? সে তার দোকানের সামনে বাঁশের মাচা তৈরি করেছিল লোকজনদের বসার জন্যে। পথ চলতে পরিশ্রান্ত হয়ে অনেকে এই বটগাছের

ছায়াশীতল মাচার ওপর বসত দুদণ্ড। সেই সময় তেলেভাজার গন্ধ তাদের নাকে গিয়ে রসনাকে প্রলুব্ধ করত। ফলে ভালই বিক্রি হ'তো গণেশের। কিন্তু ভাগ্য বিরূপ। কিছুদিন আগে কলেরায় মারা গেল সে। দোকান বন্ধ হয়ে গিয়েছে। তার ছেলেরা সব ছোট। গণেশ তো ভালই গেল, আজকাল মরা মানেই বাঁচা। কিন্তু তার ছেলে-বৌয়ের যে কি দশা হবে কে জানে!

—"ওঠ খুদি, আর বসতে হবে না।" হরেকেষ্ট জোর ক'রে বলে। ঝিরঝিরে বটের হাওয়া ছেড়ে তারও উঠতে ইচ্ছে হচ্ছিল না।

—"এবারে তোকে কোলে নেবো না কিন্তু।"

খুদি জিভ কেটে বলে—"না, না, ছিঃ।"

তার মুখভংগী দেখে হরেকেষ্ট হেসে ফেলে। সে অবাকও কম হয় না। হঠাৎ এমন কি ঘটল, যার জন্যে খুদির এতো লজ্জা?

—"ছিঃ ছিঃ বললি কেন রে?"

—"উঠতে নেই, লোকে কি বলবে?"

—"উঠলে কি হয়?"—হরেকেষ্টর শুনতে বড় ভাল লাগে খুদির কথা, তাই জের টানে।

—"লজ্জার কথা, তুমি যে বর।"

ঠিক লক্ষ্মীর কাজ। বাচ্চা মেয়েটাকে পাকা ক'রে তুলছে। কথাগুলো শুনতে মিষ্টি লাগলেও একটা অজানা ব্যথায় তার ভেতরটা টনটন করে। এই বয়স থেকেই অভিনয় শিখল খুদি—নিজেকে বঞ্চিত করার অভিনয়, যেটা যৌবন না এলে সাধারণতঃ শেখে না তারা।

—"তোকে আমি এখন কোলে নেবো রে।" হরেকেষ্ট বলে।

খুদির চোখ মুহূর্তের জন্যে উজ্জ্বল হ'য়ে উঠেই কিসের সন্দেহে আবার যেন নিষ্প্রভ হয়ে পড়ে। সে বলে—"ছিঃ, নিতে নেই।"

—"লক্ষ্মীটার বিয়ে হয়নি তো, তাই ও কিছু জানে না; ও তোর মত সিঁদুরও পরে না। বর তো কোলেই করে রে। বর এলে লক্ষ্মীও কোলে উঠবে।"

খুদি হরেকেষ্টর মুখের দিকে চেয়ে থাকে। স্বামীর কথা শুনে তার আনন্দ হয়। কিন্তু লক্ষ্মীর কথাকেও অত সহজে উড়িয়ে দেওয়া যেতে পারে না, তাই তার শিশু-মনে দ্বন্দ্ব সুরু হয়।

—"আয়, কোলে আয়।" হরেকেষ্ট বলে।

খুদি ঝাঁপিয়ে হরেকেষ্টর কোলে উঠেই তার কাঁধে মুখ গুঁজে দেয়।

—"কিরে, অমন ক'রে থাকলি কেন?"

সে জবাব দেয় না। হরেকেষ্ট চেয়ে দেখে তার কাঁধ দিয়ে জলের ধারা নেমেছে। খুদি কাঁদছে।

—"তুই কাঁদছিস? কেন?"

খুদি বল্‌তে পারে না, কেন সে কাঁদছে। কিন্তু তার কান্না পাচ্ছে।

—"তুই আমার কোলে উঠেছিস একথা কাউকে বলব না। লক্ষ্মীকেও না।"

—"মাকে?" চোখ মুছে সে বলে।

—"মাকেও না।"

খুদির মুখ যেন প্রফুল্ল হয়। তার টলটলে চোখে কৃতজ্ঞতা।

—"তুই লেখাপড়া শিখবি?"

—"হ্যাঁ, অ-আ-ই-ঈ"—সে হেসে ওঠে।

—"কোথায় শিখলি এসব?"—আনন্দে চিৎকার করে ওঠে হরেকেষ্ট।

—"দিদি বলেছিল যে।"—হরেকেষ্ট বুঝল উমার কাছে কোনদিন হয়তো শুনেছে। শুনেই যার এতটা মনে থাকে তাকে ভাল ভাবে পড়ালে, খুব তাড়াতাড়ি শিখবে নিশ্চয়।

সে হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে যায়। একবার উমার কথা মনে হতে তার কথাই মাথার মধ্যে বারবার ঘুরে বেড়ায়। উমা এখন কোথায় আছে কে জানে! কারও কাছে জিজ্ঞাসাও করা যায় না। সে হয়তো এখন বুড়ো ট্যানাঘোষের ঘর আলো করছে। আলো করাই বটে, সে রূপ তার আছে। তার চোখের চাহনি হরেকেষ্টর যেমন ভাল লাগে, তেমনি সে ভয়ও পায় সে চাহনিকে। উঃ, কি সাংঘাতিক ভাল। সাপের চাহনি, কি হরিণের চাহনি বুঝবার উপায় নেই। মনে হয় দুটোরই। শরীর ঝিম্ ঝিম্ করে, অথচ না তাকিয়েও থাকা যায় না। সে আগে এমন কখনো অনুভব করেনি।

—"দেখি খুদি, তাকাতো আমার দিকে—"

খুদি তাকায়। দুটো সরল টানাটানা চোখ। নাঃ খুদির চোখে সে চাহনি নেই। মানে, পরেও হবে না। এ দৃষ্টিতে শুধু আত্মসমর্পণ। এ চোখ বিলিয়ে দেবার, খেলা করার নয়। উমার চোখ মোহ বিস্তার করে, দূর থেকে ধরে রেখে জ্বালিয়ে দেয়। ভাবতে ভাবতে হরেকেষ্টর মাথা গরম হয়ে ওঠে। ট্যানাঘোষের ওপর আক্রোশে তার কপালের শিরা ফুলে ওঠে। শ্বশুরের ওপর রাগে সে দাঁতে দাঁত চেপে ধরে। তাকে নিয়ে খেলা করেছে

সবাই, তার যৌবনকে বিদ্রূপ করেছে।

উমা যদি এখন তার বাপের বাড়িতে থাকে বেশ হয়। অন্ততঃ তার দিকে তাকিয়ে থেকেও আনন্দ। হরেকেষ্ট এতক্ষণে বেশ বুঝতে পারে শাশুড়ীর কথা রাখতে সে মোটেই যাচ্ছে না। তার মনের কোণে প্রথম থেকেই আর একটা দুরাশা উঁকি দিচ্ছে। শাশুড়ী আগেও কতবার লোক পাঠিয়েছে, সে তো কখনো যায় নি। অথচ গেলবার উমাকে দেখে, আসবার পর থেকে নানা কাজের মধ্যেও শ্বশুরবাড়ি যাবার ইচ্ছে প্রবল হয়ে উঠেছে তার মনে। এই দুর্বলতার কথা টের পাওয়ার সংগে সংগে নিজের ওপর রাগ হয় তার, ঘৃণা হয়। যেন সে কত নীচে নেমে গিয়েছে —ঠিক নন্দর পাশাপাশি।

খুদিকে আঁকড়ে ধরে হরেকেষ্ট। এবার আর সে ঘুমোয় নি। তার কাঁধের ওপর মাথা রেখে সে বড় বড় চোখ ক'রে রাস্তার দুপাশের দৃশ্য উপভোগ করতে করতে চলেছে। কোথাও একটা কাঠবেড়ালী খাদ্যের সন্ধানে গাছের ওপর থেকে নীচে নেমে এসেছে। কিন্তু একটা কাক উড়ে এসে তার পাশে বসায়, সে ছুটে আবার গাছের ওপর পালিয়ে যায়। কোথাও একটা গরু মরে পড়ে রয়েছে—শকুন বসেছে তাকে ঘিরে। দু একটা কুকুর উদাস দৃষ্টিতে একটু দূরে বসে তাই দেখছে—শকুনের ভয়ে কাছে যাবার সাহস নেই। ডোবার পচা জলের মধ্যে নেমে একটা ছেলে দুহাত দিয়ে কাদা তুলে ডাঙায় ফেলছে। ডাঙ্গায় তোলা কাদার মধ্যে কুচো মাছ খুঁজছে সে।

হরেকেষ্ট আঁকড়ে ধরতে খুদি চমকে ওঠে।

—"চল্ খুদি বাড়ি ফিরে যাই—"

—"না, মার কাছে যাবো।"

—"পরে যাস।"

—"না।" তার চোখের পাতা ভারী হয়ে আসে।

—"চল্ তবে। আমাকে কিন্তু আর দোষ দিস্ না, বুঝলি? আর দোষ নেই আমার—"

হরেকেষ্ট চেঁচিয়ে ওঠে। যেন খুদি তার কথার সারমর্ম সব বুঝে ফেলেছে।

সে হরেকেষ্টর দিকে চেয়ে থাকে।

উমাকেই সব চেয়ে প্রথম দেখা গেল; শ্বশুরবাড়ির সামনে রাস্তার ওপর একটা মোটা আমগাছ রয়েছে। তার গুঁড়িতে ঘুঁটে দিচ্ছিল সে।

—"জামাই যে—" হাসির সংগে উমার চোখে বিদ্যুত খেলে যায়।

—"হ্যাঁ, এলাম।"

—"তা তো দেখতেই পাচ্ছি। জামাই যে বড় শিগগির এলে এবার। এক কথায় তো অমন আসো না।"—সে হাসে।

—"জান নাকি সে কথা।"—হরেকেষ্ট সপ্রতিভ হবার চেষ্টা করে। যদিও উমার কথায় তার লজ্জা হয়।

—"জানতাম না, মা বলল।"

—"কিন্তু, এবার যে অন্য কারণ।"

—"কি কারণ?"

—"কেন, জান না?"

—"তোমার মুখেই শুনি।"

—"মা নাকি স্বপ্ন দেখেছে, তার মেয়ে বিধবা হবে—"

—"ছিঃ জামাই, তুমি কি ? অমন কথা মুখে আনে ?"

—"আনবো না কেন ? বিধবা হলে যে মায়ের মেয়ের বরাত খুলে যাবে। বড় ঘর আর ছোট বড় পাবে। আমি তা হতে দেবো কেন ? একশো বছর বেঁচে, তার পরে মরব। তাই এলাম, পূজো করলে যদি ফাঁড়া কেটে যায়।"

—"তোমার মুখে আগল নেই জামাই।"

—"আগল ছিল, ভেঙে যাচ্ছে।"

উমা দীর্ঘশ্বাস ফেলে কি যেন ভাবে, তারপর বলে, "জামাই, তোমার খুব কষ্ট তাই না ?"

হরেকেষ্ট চমকে উঠে। উমার দীর্ঘশ্বাস যেন স্বতঃস্ফূর্ত। তার দৃষ্টিও যেন নিষ্প্রভ। গলার স্বর সমবেদনায় ভারী। কি জবাব দেবে খুঁজে পায় না হরেকেষ্ট।

উমাই আবার বলে—"ভেতরে চল। হাতমুখ ধোও। পরে কথা হবে। দুদিন আছো তো ?"

—"না, কাল যাবো।"

—"এত তাড়া কিসের।"

—"তাড়া সব সময়ই।"

—"শ্বশুরবাড়ি ভাল লাগে না ? ঠিক কথা বল তো জামাই।"

ঠিক কথা কি করে বলবে হরেকেষ্ট। এই দুবার তো ভালই লাগছে। আগে খারাপ লাগতো। কিন্তু সেকথা তো উমাকে বলা যায় না। তাই বলে—"ভাল লাগলেই কি থাকা যায় ?"

—"যায়।" উমা মিষ্টি হাসে।

—"তোমার ট্যানাঘোষের কাছে থাকতে ভাল লাগে।

এখানে পড়ে আছো কেন?"

—"জামাই যেন কি—। তোমার কানে কানে বলেছি নাকি সে কথা?"

—"সব কথাই কি শুনে বুঝতে হয়?"

—"হ্যাঁ।"

—"না-শুনেও বোঝা যায়।"

—"না"—উমার স্বর রীতিমত গম্ভীর। হরেকেষ্ট অপ্রস্তুত হয়।

খুদি এতক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে কথাবার্তা শুনছিল। দিদির গোবর-মাখা হাত দেখে তাকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে হয়নি। সে আর ধৈর্য ধরে দাঁড়িয়ে থাকতে পারল না। ছুটে বাড়ির ভেতরে পালিয়ে যায়।

—"চল জামাই, আর দাঁড়ানো যাবে না। খুদি খবর দিয়েছে।"

হরেকেষ্ট উমার পেছনে পেছনে বাড়ির দিকে যায়। তাকে পেছনে রেখে উমা তার চলার গতিকে একটু ছন্দায়িত ক'রে নিতে চেষ্টা করে—ট্যানাঘোষের বউ উমা।

—"শ্বশুরবাড়ি যাও না কেন?"—হরেকেষ্ট আচমকা প্রশ্ন করে।

—"তুমি এলে তোমাকে দেখাশোনা করবে কে তাহলে।"—উমা ফিক করে হেসে ফেলে।

তার কথায় হরেকেষ্ট চমকে যায়। আগেরবার সে বেশী কথা বলেনি। বোধহয় সামনে এসে দাঁড়াবার মত শরীরের ছন্দ ছিল না বলে। ট্যানা ঘোষের শেষ পক্ষের প্রথম সন্তান তখন

ভূমিষ্ঠ হবার মুখে। হরেকেষ্ট তখন ভেবেছিল যে উমা অহংকারী, তাকে দেখতে হলে চুরি করেই দেখতে হবে। কথা বলতে হলে সংযতভাবেই বলতে হবে। কিন্তু এবারে তার ধারণা সম্পূর্ণ পালটে গেল। এই সামান্য সময়ের মধ্যে অল্প কয়টা কথা বলে উমা যেন তার খুবই কাছে চলে এসেছে। হরেকেষ্টর সংকোচ থাকলেও আড়ষ্টতা আর নেই। উমা শুধু কথাই বলেনি, কথার মধ্যে বড় বেশী অর্থ ঢুকিয়ে দিয়েছে। অমন কথা সে শিখল কোথায়? সে তো পণ্ডিতের পাঠশালায় লেখাপড়া শেখেনি। নাকি, সব মেয়েরাই অমন বলতে পারে।

দুই মেয়ে আর জামাইকে সংগে নিয়ে পরদিন শাশুড়ী কালীবাড়ি গেল। সেখানে পূজো দিলে খুদির সিঁথির সিঁদুর অক্ষয় হবে।

এ গ্রামের কালী রক্ত চান না। তিরিশ বছর আগে থেকে ছাগ-বলি বন্ধ হ'য়ে গিয়েছে। তারপর থেকে পূজো দিতে হ'লে ছাগলের বদলে কুমড়ো বলি হয়। যূপকাষ্ঠ তেমনি অটুট। শুধু সেখানে ছাগলের বিচ্ছিন্ন ধড়ের পরিবর্তে দু-ভাগ কুমড়ো গড়াগড়ি যায়। মা যে রক্ত চান না, এটা কথার কথা নয়। দশ বছর আগে একজন এখানকার বিশ্বাস বাজে কথা বলে উড়িয়ে দিয়ে মাকে রক্ত দিয়ে সংগে সংগে তার প্রতিফল পেয়েছিল। সে সময়ের মন্দিরের পূজারীও নিস্তার পেলো না। কালী-সাধক পূজারীর মাংস খাবার লোভ হয়েছিল।

পূজো দিতে এসেছিল তালবেড়ের জানকী মণ্ডল। পূজারী তাকে বুঝিয়েছিল যে কুমড়ো বলি দিয়ে কিচ্ছু হবে না।

নিরামিষে মায়ের অরুচি হ'য়েছে, স্বপ্নে সেকথা তিনি পূজারীকে জানিয়েছেন। বিশ বছর রক্ত না পেয়ে তিনি নাকি তৃষ্ণার্ত। যে প্রথম রক্ত দেবে, তাকে তিনি প্রাণ ভরে আশীর্বাদ করবেন। হাইকোর্টে এক মামলা চলছিল জানকী মণ্ডলের। জিততে পারলে অগাধ সম্পত্তির মালিক। জানকী পূজারীর কথায় বিশ্বাস করল। সে আরও বিশ্বাস করল এই কারণে যে, সে নিজে মাংসাশী, তার ওপর টাকার গরম।

পাঁঠা বলি দেওয়া হ'লো। অনেক বাদ্যি বাজল। পূজোর শেষে ভীড় বিহ্বল গ্রামের লোকেদের সামনে পূজারী উচ্চৈস্বরে ঘোষণা করল যে মা পরম পরিতৃপ্তি লাভ করেছেন। হাইকোর্টে জানকী মণ্ডলের জয় অবধারিত। পূজারী আরও বলল যে গ্রামবাসীরা নিজেদের সুবিধের জন্যে কুমড়ো বলি দেয়—তাতে খরচ কম বলে। মা যা চান, জানকী তাই দিল। সবাই ভাবল সত্যিই বোধহয় তাই।

কিন্তু প্রমাণ পাওয়া গেল পরদিন। পূজো দিতে গিয়ে পূজারীকে কেউ খুঁজে পেল না। কি করে পূজো হবে? খোঁজ, খোঁজ। শেষে দেখা গেল কালীমন্দিরের পেছনে জংগলের মধ্যে মুখে হাত দিয়ে চুপ ক'রে বসে রয়েছে পূজারী।

—"ওখানে বসে ক্যান ঠাকুর। আসেন। লোকে :য খাড়ায় আছে।"—একজন বলে।

ঠাকুর কথা বলল না। সকলের ডাকে শুধু চোখ দিয়ে তার অবিরল ধারে জল গড়িয়ে পড়ল। শত সাধ্যসাধনাতেও পূজারী জায়গা ছেড়ে উঠল না। শেষে মরিয়া হ'য়ে একজন এগিয়ে গেল, ভাবল ঠাকুরের উপর মায়ের ভর হ'য়েছে বুঝি।

—"কি হ'ল ঠাকুর। অমন মুখ ঢেইকে আছেন ক্যান?"

লোকটির কথায় পূজারী সশব্দে কেঁদে ওঠে, তবু মুখ থেকে হাত নামিয়ে নেয় না।

লোকটা সমস্ত সংকোচ কাটিয়ে পূজারীর হাত ধরে টানে। মুখ থেকে হাত সরে যায়। সংগে সংগে সে ভয়ে আর্তনাদ ক'রে দু'পা পেছিয়ে যায়। দূর থেকে যারা দেখছিল, তারাও আঁৎকে ওঠে। পূজারীর জিভ আধ হাত বাইরে বার হয়ে আছে। লোভের ফল।

কালীবাড়ি যেতে যেতে উমাই গল্পটা বলল। তালবেড়ের জানকী মণ্ডল পাগল হ'য়ে গিয়েছে। হাইকোর্টে তার হার হ'লো! মামলা লড়তে লড়তে নিজের সম্পত্তি সব নষ্ট হ'য়েছে।

কালীবাড়ি এসে শাশুড়ী আর খুদি মন্দিরের ভেতরে পূজারীর কাছে যায়। উমা আর হরেকেষ্ট বাইরে দাঁড়িয়ে থাকে।

এক সময় উমা বলে—"জ্যান্ত কালী। যে যা বলে তাই শোনেন।"

—"তুমি কিছু বলনি কোনদিন?" হরেকেষ্ট প্রশ্ন করে।

হরেকেষ্টর কথায় উমা কালীমূর্তির দিকে চেয়ে প্রণাম করে, তারপর গদগদ স্বরে বলে, "না বলে কি উপায় আছে! উনিই তো সব।"

—"ঠাকুর তোমাদের সব কথা রাখেন?"

—"সেরকম ভাবে বলতে পারলেই রাখেন।"

—"ট্যানা ঘোষের মত বুড়ো বর চেয়েছিলে কেন ঠাকুরের কাছে? জোয়ান মরদ চেয়ে নিতে পারো নি?"—হরেকেষ্টর কথা জ্বালা ধরা।

উমা শিউরে ওঠে। সে হরেকেষ্টর চোখের দিকে একবার চেয়ে চোখ নামিয়ে নেয়। শেষে হেসে ফেলে। প্রথমে নিঃশব্দে হাসে, তারপর একটু একটু শব্দ হয়—শেষে জোরে টেনে টেনে হাসে। তার হাসি হরেকেষ্টর কাছে অদ্ভুত শোনায়।

সে বলে—"হাসছো কেন অমন ক'রে। উত্তর দিলে না আমার কথার ?"

—"তুই জামাই পাগল।"

—"পাগল তুমি, তোমার মা আর বাবা। আমি ঠিকই আছি।" হরেকেষ্ট একটু জোর গলায় বলে।

—"আস্তে, ওরা শুনতে পাবে। পাগল আমাদের জামাই গো।" উমা আবার হাসে। সেইরকম হাসি। হরেকেষ্ট কিছু বলতে পারে না। হাসিটা যেন উমার নয়। মনে হয় দূর থেকে ভেসে আসছে—ঠিক কালীমূর্তির পেছন থেকে যেন। উমা ভাবতে ভাবতে হাসছে। সে হয়তো ভুলেই গিয়েছে যে সে হাসছে।

হঠাৎ এক সময় খেয়াল হ'লে তাড়াতাড়ি সে হাসি থামিয়ে বলে—"জামাই, হিন্দু ধম্মো মানো ?"

—"মানবো না কেন ? না মেনে কি উপায় আছে ?"

—"বিশ্বাস করো ?"

—"সব করিনে।"

—"কোন্ কথা বিশ্বাস করো না ?"

—"তা কি বুঝিয়ে বলতে পারি ? তাহ'লে তো ভদ্দরলোক হয়ে যেতাম। গরু চড়িয়ে আর দুধের যোগান দিয়ে খেতে হ'তো না।

—"তবু একটু বলো না শুনি। পাঠশালায় তো পড়েছিলে।"

—"কার কাছে শুনলে ?" হরেকেষ্ট অবাক হয়।

—"তোমাদের পণ্ডিতের কাছেই শুনেছি। জগবন্ধু পণ্ডিত আমাদের বাড়ি আসতো যে মাঝে মাঝে।"

—"ঠিকই শুনেছো। কিন্তু পাঠশালায় পড়া আর শাস্তর পড়া কি এক হ'লো ?"

—"তা হ'লো না। জগবন্ধু পণ্ডিত বলে ভদ্দরলোকেরাও নাকি শাস্তর পড়ে না।"

—"তারা অন্য কত জিনিস পড়ে।"

—"অত কথা শুনতে চাই না। বল, কেন বিশ্বাস করো না।"

—"সত্যি বলছি, আমিও তা জানিনে।"

—"আচ্ছা, আগের জন্মের স্বামী, এজন্মেও স্বামী হয়—একথা বিশ্বাস করো ?"

—"না"—হরেকেষ্টর স্বর দৃঢ়।

—"তাহ'লে তোমাকে আর কি বলব, তুমি ধম্মো মানো না।"

—"ও, ট্যানা ঘোষ আগের জন্মেও তোমার স্বামী ছিল বুঝি ?"

—"হ্যাঁ, তাই। সবাইকে জিজ্ঞাসা করে দেখো। সবাই ঐ কথাই বলবে।"

—"তাই বুঝি ঠাকুরকে কিছু বলো নি ?"

—"ওসব বলার কথা মনে হয় নি কখনো।"

—"ট্যানা ঘোষ এখনো বিছানায় পড়ে থাকে নাকি ?"

—"হ্যাঁ, আরও অনেকদিন পড়ে থাকবে।"

—"তুমি যাবে না ?"

—"গেলে তোমার আনন্দ হবে তো ?" উমার কথায় রহস্য। এ রহস্য হরেকেষ্টর মনকে নাড়া দেয়। সে কথা বলতে পারে না, মুখ নীচু করে থাকে।

—"কি জামাই, চুপ হ'য়ে গেলে কেন ?"

—"কি বলব ?"

—"কথা।" উমা হাসে আবার।

—"যা বলব, শুনতে ভাল লাগবে ?"

—"খুব।—"

—"চৌহুয়ারে থাকতে তোমার ভাল লাগে না, তাই এখানে থাকো। ট্যানা ঘোষকে তুমি ভালবাসো না।"

উমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়।

—"কি, তুমি চুপ করলে কেন এবার ?"—হরেকেষ্ট কিছুক্ষণ পরে প্রশ্ন করে।

—"ভাবছি, তোমাকে দেখতে বোকা। আসলে তুমি খুব চালাক।"—উমা বলে।

—"আর তুমি দেখতে চালাক, আসলে বোকা।"—হরেকেষ্ট হাসে।

—"কেন ?" উমার চোখে প্রশ্ন।

—"চালাক হ'লে এখানে থাকতে না। চৌহুয়ারে চলে যে-- ট্যানা ঘোষের কাছে।"

—"কেন ?"

—"সেবা যত্ন ক'রে সারিয়ে তুলতে তাকে। এত আগে যদি মারা যায়, তাহলে আসছে জন্মেও যে তোমার চেয়ে অনেক আগে জন্মাবে। আবার বুড়ো বর পাবে তুমি। ট্যানা ঘোষ

যে সব জন্মেই তোমার আঁচলে বাঁধা।"

—"আমি যদি গলায় দড়ি দিয়ে মরি ?"

—"ভূত হবে। উদ্ধার পেতে পেতে ট্যানা ঘোষ পরের জন্মেও মরে যাবে। সে তো আর বিয়ে না করে থাকবে না? তোমার জায়গা অন্যে নেবে।"

—"তাহলে তো বাঁচি।"—উমা কিছুক্ষণ আনমনা থেকে হঠাৎ উত্তেজিত হ'য়ে ওঠে। সে চিৎকার করে—"আমি বিশ্বাস করি না।"

—"কি বিশ্বাস করো না ?"

—"সব জন্মে একজন লোকই স্বামী হয় না কিছুতেই।"

—"তুমি আমার দলে।"

—"না, আমি ধম্মো মানি।"

—"আমি তো বলিনি যে, আমি ধম্মো মানি না।"

—"তুমি না বললেও বোঝা যায়।"

—"সে কি গো! অমন কথা মুখে এনো না। গাঁয়ে সকলে একঘরে করবে আমাকে।"

—"আর কেউ তো শুনছে না।"

—"তুমি বুঝলে কি ক'রে আমি ধম্মো মানি না? আমি নিজেই তো জানিনে।"—হরেকেষ্টর প্রশ্নে কৌতূহল।

—"তোমরা যে নিজেদের চিনতে পারো না জামাই। ব্যাটাছেলেরা অন্ধ, মেয়েরাই তাদের চিনিয়ে দেয়।"

—"কই, খুদি তো এখনো চেনাতে পারল না।"

—"ওকে পায়ে ঠেলো না, ও তোমাকে ঠিক চেনাবে।"

—"আমি বুড়ো হলে? তুমি যেমন ট্যানা ঘোষকে চেনাও।"

হরেকেষ্ট জোরে হেসে ওঠে।

—"জামাই"—উমা আর কিছু বলতে পারে না। তার বলার কিছুই নেই।

মায়ের হাত ধরে এগিয়ে আসে খুদি। তার পরনের লাল রঙের চেলিটা চক্‌চক্ করছে। কপালে তার ঠাকুরের সিঁদুর। খুদির মায়ের হাতে একটা কাঁঠালের পাতায় খানিকটা সিঁদুর মাখানো। সেটা হরেকেষ্টর সামনে ধরে খুদির মা বলে—"এর থেকেন একটু সিঁদুর নিয়ে খুদির কপালে লাগায় দাও বাবা।"

সিঁদুর দিতেই খুদি ঢিপ ক'রে প্রণাম করে হরেকেষ্টকে। উমা তার গাল টিপে দিয়ে বলে—"কে বলল রে পেন্নাম করতে?"

—"বলেনি তো।"

—"কোথায় শিখলি?"

খুদি জবাব দিতে পারে না। সে নিজেই জানে না কেন সে প্রণাম করল।

তার মা কপালে হাত ঠেকিয়ে বলে—"মায়ের দয়া। মা বলেছেন ওকে। ওর সিঁদুর অক্ষয় হবি—ঠিক হবি। আমার মন ডেইকে বলছে।"

সেদিনই হরেকেষ্ট বিদায় নেয়। খুদিকে রেখে আসতে হয়। মায়ের কাছে একদিন থেকে সে তৃপ্ত নয়—আরও থাকতে চায়। হরেকেষ্ট তার লেখাপড়ার দোহাই দিয়েছিল। উমা সে ভারও নিল। সে নিজে পড়াবে খুদিকে। সে লেখাপড়া জানে একথা প্রথম শুনল হরেকেষ্ট। বুঝল, পেটে বিদ্যে না থাকলে

অত সুন্দর কথা এমনিতে বার হয় না মুখ থেকে। উমার ওপর শ্রদ্ধা আর আকর্ষণ দুই-ই বৃদ্ধি পেল তার।

হরেকেষ্ট শ্বশুরবাড়ি গেলে, নীলু সব কাজই করল, কিন্তু প্রাণকেষ্টর সংগে তার বিশেষ কথা হলো না। যতক্ষণ নীলু বাড়িতে থাকল ততক্ষণ সে শূন্য দৃষ্টিতে দাওয়ায় বসে থেকে তামাক টেনে গেল। কিন্তু নির্বিকার থেকেও সে এটুকু লক্ষ্য করল যে, নীলু লক্ষ্মীর সংগে কোন কথাই বলল না। এমন কি তার ধারে কাছেও গেল না—যেন তারা কেউ কাউকে চেনে না। দুধের কলসীগুলো আগে থেকেই দাওয়ার ওপর রেখে দিল লক্ষ্মী। আর নীলুও গরু চরিয়ে এসে কলসীগুলো বাঁকের দুধারে বসিয়ে ছুটল দুধ দিতে।

প্রাণকেষ্ট ভাবে, জামাই করার মত চেহারা বটে নীলুর—যেমন রঙ তেমনি শরীরখানা। কিন্তু এক দোষে সব নষ্ট হ'য়েছে। সে গরীব। ঘর-দোর তো ভেঙে পড়ার মত হয়েছে। হরেকেষ্ট বলছিল,যে এ বর্ষাতে টিকবে না। বর্ষা আসতে আর কতই বা দেরি। বাঁশের খুঁটিগুলোতে নাকি ঘুণ ধরেছে। চালের খড় প'চে গ'লে নষ্ট হ'য়েছে। ওর ভেতরে যে কি করে থাকে মায়ে-পোয়ে তারাই জানে। লক্ষ্মী গিয়ে থাকবে কোথায়? খাবেই বা কি? নইলে নীলুর সংগে ওর বিয়ে দিতে তারই কি কম সাধ ছিল? ওরা দুজন যখন এক সংগে ঘুরে বেড়াত তখন চিরকালের জন্যে মিলিয়ে দেবার ইচ্ছে তারও কি হয়নি? তবে লক্ষ্মীর মায়ের মত সে কোনদিন ক্ষেপে ওঠেনি। মেয়েদের সবতাতেই

অমন বাড়াবাড়ি। তিলকে তাল করতে তাদের জুড়ি নেই। পুরুষরাই তো চেপে-চুপে রাখে তাদের, নইলে সংসার ভেসে যেতো। লক্ষ্মীর মা নীলুর মাকে বড্ড বেশি আস্কারা দিয়েছিল। বাক্যালাপ ছিল না বলে প্রাণকেষ্ট নিষেধ করতে পারে নি। দুই মায়ের কথোপকথন ওদের কানে গিয়ে কচি মনে দাগ পড়েছে। সে দাগ কি সহজে ওঠে? হয়তো ওঠেই না। তাই বলে তাতে সায় দেওয়াও কাজের কথা নয়। সংসার বড় কঠিন ঠাঁই। আঘাত এখানে পেতেই হবে। হাজার বাঁচিয়ে চলতে চেষ্টা করেও কোন লাভ নেই। লক্ষ্মীও আঘাত পাবে, উপায় কি? অমন আঘাত প্রাণকেষ্টও পেয়েছে। টুকটুকে চেহারা নিয়ে নীলুর মা ফেলী যখন খ্যাপা ঘোষের ঘরে গেল তখন তার বুকের হাড় কখানা যেন ভেঙে গুঁড়ো হ'য়ে গিয়েছিল। তারপর হরেকেষ্টর মা ঘরে এলে আস্তে আস্তে সব সয়ে গেল। তবু পথে ঘাটে ফেলীর সংগে দেখা হ'য়ে গেলে ভেতরটা যেন টনটনিয়ে উঠত। ফেলীর কি অমন হতো না? হতো। প্রমাণ পেয়েছে সে। প্রাণকেষ্টকে তো প্রথম সে-ই সচেতন ক'রে তোলে। বাঁশী কতজনাই বাজায়, কিন্তু বাঁশীর সুর যে মেয়েমানুষের মন ভোলায় এ-খবর ফেলী না থাকলে কি কোনদিন সে জানতে পারতো? বাঁশীর সুরে সে কেমন যেন তন্ময় হয়ে যেতো। দেখতে প্রাণকেষ্টর বড় ভাল লাগত।

—"আমি কেষ্টো, তুই আমার রাধা হবি ফেলী?" একদিন চরম উত্তেজনার মধ্যে সে বলে ফেলেছিল।

—"হুঁ।" স্পষ্ট জবাব দিয়েছিল আজকের নীলুর মা। অত স্পষ্ট

জবাব সে আশা করেনি। বিহ্বল হ'য়ে পড়েছিল।

কিন্তু সেই শেষ। ফেলী তার রাধা হয় নি, হঠাৎ তার বিয়ে হ'য়ে গেল খ্যাপা ঘোষের সংগে। খ্যাপা বিশ্বাসঘাতক। সে প্রাণকেষ্টর সংগে ফেলীর সম্পর্কের কথা জানত। কত সময় ঠাট্টাও ক'রেছে এ নিয়ে। তবু ফেলীর টুকটুকে রঙের লোভ সামলাতে পারে নি। কোথা থেকে টাকার যোগাড় ক'রে কাউকে না জানিয়ে হঠাৎ একদিন বিয়ে করে ফেলল তাকে। প্রাণকেষ্ট স্তম্ভিত হয়ে গিয়েছিল। প্রথম দিনে খুবই কেঁদেছিল। তারপর আর কাঁদেনি। সাগরখালির বটগাছের গোড়ায় বসে শুধু দিনের পর দিন বাঁশী বাজাতো। মানুষের প্রাণ একটু একটু ক'রে বুক থেকে বার হ'য়ে বাঁশের বাঁশীর এক মুখ দিয়ে ঢুকে আর এক মুখ দিয়ে সুর হ'য়ে বার হয়। তাই না বাঁশের বাঁশী অত মধুর, অত বিষণ্ণ, অমন মন-মাতানো, অমন প্রাণ-কাঁদানো। সিঁদুর-পরা ফেলীকে সে কতদিন দেখেছে বটগাছের অদূরে করমচা গাছের আড়ালে লুকিয়ে লুকিয়ে বাঁশী শুনতে। তার চোখে জলও দেখেছে সে।

তারই ছেলে নীলু। মায়ের রঙ পেয়েছে, স্বভাবও তারই মত সুন্দর। কিন্তু সে তো শুধু ফেলীর ছেলে নয়, খ্যাপা ঘোষেরও ছেলে সে। খ্যাপা ঘোষের ছেলে বলে ভাবতে প্রাণকেষ্টর মাথায় আগুন জ্বলে ওঠে। নীলু যদি তার ছেলে না হ'তো তাহ'লে গরীব হ'লেও আজ সে লক্ষ্মীর সাথে বিয়ে দিতে আপত্তি করতে পারত না।

ফেলীকে রাস্তাঘাটে কত দেখে সে। শরীর শুকিয়ে গিয়েছে, দাঁতগুলো বড় বড় হ'য়ে বাইরে বার হ'য়ে এসেছে। কিন্তু রঙ

দেখলে এখনো বোঝা যায় যৌবনে কি ছিল সে! তার সংগে দেখা হলে কথা বলে না প্রাণকেষ্ট। বলে লাভ কি?

প্রাণকেষ্টর মন এখন পাথরের মত শক্ত। সে বুঝতে শিখেছে সংসারে হৃদয়ের স্থান নেই। হৃদয় এখানে পদে পদে পরাজিত। আর সে পরাজয় মংগলের জন্যেই। তাই লক্ষ্মীর চোখের জলে তার মন গলে না। আজ যার জন্যে চোখের জল ফেলছে, কাল তারই কাছে গিয়ে দারিদ্র্যের জন্যে অনুশোচনায় আবার কাঁদতে বসবে। টাকাই সব চাইতে বড় জিনিষ। নন্দ নীলুর তুলনায় অপদার্থ হলেও তার টাকা আছে। প্রাণকেষ্ট ভালরকম জানে, নন্দর ঘরে গেলে প্রথম প্রথম লক্ষ্মীর নীলুর জন্যে প্রাণ কাঁদবে, কিন্তু আস্তে আস্তে সব সয়ে যাবে। নন্দর ছেলে যদি লক্ষ্মীর কোলে আসে, আর ভগবান না করুন, সেই ছেলে যদি না বাঁচে তা হ'লে নীলুকে হারানোর চেয়ে সে আঘাত হাজারগুণ বেশী লাগবে তার বুকে। নীলুর কথা ধীরে ধীরে ফিকে হ'য়ে আসবে, যেমন তার কথা ফিকে হ'তে হ'তে একেবারে মিলিয়ে গিয়েছে ফেলীর মন থেকে। তার মন তন্ন তন্ন ক'রে খুঁজলেও আজ আর প্রাণকেষ্টর অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যাবে না। কিন্তু নীলুর ছেলেবেলার আধো আধো কথা, তার কচি কচি হাত পা ছুঁড়ে খেলা করার স্মৃতি এখনো নিশ্চয়ই স্পষ্ট মনে আছে ফেলীর—থাকতে বাধ্য। সংসারের নিয়মই তাই, লক্ষ্মী জানে না যে, সে যদি আজ নীলুর ঘরে যায়, তাহ'লে যে মন নিয়ে সে আজ যাবে সে মন চুরমার হ'য়ে যাবে একদিন। গর্ভের সন্তানের অনাহার-ক্লিষ্ট মুখের দিকে চেয়ে নন্দর স্বচ্ছল সংসারের কথা ভেবে দীর্ঘশ্বাস ফেলতে হবে সেদিন। অথচ তাকে একথা

এখন বুঝোতে গেলে সে বুঝতে চাইবে না। এই ভাবপ্রবণতা প্রাণকেষ্টর জীবনেও এসেছিল একদিন। আজ ভাবলে হাসি পায়—সত্যিই হাসি পায়।

দাওয়ায় বসে প্রাণকেষ্ট ভাবতে ভাবতে আপন মনে হেসে ওঠে। নীলু তখন বাড়ি বাড়ি দুধ দিয়ে সবে ফিরেছে। দুধের কলসীগুলো দাওয়ার ওপর সাজিয়ে রাখতে রাখতে সে প্রাণকেষ্টর হাসি শুনল। হাঁপাতে হাঁপাতে হাসছে বুড়ো। নীলু একটু অবাক হয়। তার বাবা খ্যাপা ঘোষকে সে হাসতে হাসতে মরে যেতে দেখেছে। বুড়োরও অমন হবে নাকি?

বাবার মৃত্যুর দিনের কথা নীলুর মনের মধ্যে জ্বল্‌জ্বল্‌ করছে এখনো। অঘোর পাড়ার হাট থেকে একটা ধুতি কিনে এনে দিয়েছিল সে বাবাকে। বহুদিন পরে নতুন ধুতি পেয়ে খ্যাপার আনন্দ হয়েছিল খুব। নীলু যে তাদের অবস্থা ফিরিয়ে আনবে, সে হলফ ক'রে সেইকথা বলছিল বারবার আর একটুতেই হাসছিল। কি একটা সামান্য কথা বলেছিল তার মা—অন্যদিন হলে হাসত না খ্যাপা। কিন্তু পরনে নতুন ধুতি, নাকে তার গন্ধ এসে লাগছে, না হেসে কি পারা যায়? সে হেসে উঠেছিল। সেই হাসিই আস্তে আস্তে জোরে হলো—কিছুতেই থামল না। শেষে দম আটকে গেল।

না খেয়ে জরাজীর্ণ শরীরে হাসিও সহ্য হয় না। হাসির জন্যেও ভাল স্বাস্থ্য চাই। দুর্বল মানুষের হাসিকে কান্না বলে মনে হয়—হাসতে গেলে তাদের চোখের জলও পড়ে। অন্ততঃ খ্যাপা ঘোষের পড়তে দেখছে নীলু।

বাবা মরে গেলে বুঝতে দেরি হ'য়েছিল নীলুদের। বরং

হাসি যখন থেমে গেল তখন তার মা বলে উঠেছিল—"বাঁচন্ত, তোমার হাসি শুনলি তো ভয় হয় ।"

খ্যাপা ঘোষের চোখ তখন বন্ধ হয়ে গিয়েছিল। একপাশে ঢলে পড়েছিল সে। নীলুর মা তাড়াতাড়ি বসিয়ে দিয়েছিল তাকে। কিন্তু ঘাড় একধারে কাত হ'য়ে পড়ল। অজ্ঞান হ'য়েছে ভেবে মাথায় জল বাতাস দিয়েছিল তারা অনেক্ষণ ধরে।

শেষে শরীর যখন শক্ত হয়ে উঠলো, তারা বুঝল সব শেষ হ'য়ে গিয়েছে—তারা শুধু মড়া নিয়েই ব্যস্ত ছিল এতক্ষণ। নীলু কাঁদেনি। নীলুর মাও কাঁদেনি। বলেছিল—"নতুন কাপড়খান্ খুলে অন্য কাপড় পরায় দে নীলু।"

—"কেন, ওটা আবার কি হবে ? ওটা পেয়ে বাবার আনন্দ হ'য়েছিল, সংগে করেই নিয়ে যাক।"

—"না কাজে লাগবি ওটা। পাড় ছিঁড়ে ফেলে তোকে ছাদ্দের আগে পরতি হবি।"

প্রাণকেষ্টর হাসি দেখে বাবার কথা মনে পড়ল নীলুর। বুড়ো যেন এবার জোরেই হাসছে। এরপর আরও জোরে, তারপর আরও জোরে—ব্যস্। সব শেষ হ'য়ে যাবে।

নীলু অপেক্ষা করে।

কিন্তু না। প্রাণকেষ্টর হাসি থেমে গেল। প্রথম কথা বলল তার সংগে।

—"হরে তোকে কি বলিছে। কাল সকালে আসবি ও ?"

—"কিছু বলেনি তো ?"

—"কাল একবার খোঁজ নিস তাহলি। না এলি তোরেই করতি হবি সব।"

নীলু ঘাড় নেড়ে সম্মতি জানায়।

লক্ষ্মী রান্নাঘরের ভেতর থেকে ইসারায় জানায়, পরদিনও আসতে। সে হাত নেড়ে বলে যে, হরেকেষ্ট আসবে না কালকে। ইসারায় লক্ষ্মীকে জবাব দিয়ে নীলু বাড়ি ফেরে। অবসন্ন বোধ করে সে। সারাদিন পেটে কিছু পড়েনি। পরের বাড়িতে মুনিষ খাটলে সে বাড়িতে খেতেও পাওয়া যায়—নিয়মই তাই। তাইতেই তার শরীরখানা টিকে আছে। কিন্তু এ বাড়িতে কাজ করলে, সে কথা বলতে পারে না। লক্ষ্মী হয়তো অনুমান করেছে যে সে না খেয়ে রয়েছে, কিন্তু বাবার ভয়ে কিছু বলতে পারেনি।

পরদিন সকালে এসে গরুগুলোকে আবার মাঠে নিয়ে যায় নীলু। ইচ্ছেমত তাদের চরতে দিয়ে সে একটা গাছতলায় বসে পড়ে। বড় ক্লান্ত লাগে নিজেকে। বাড়ি থেকে আজও সে খেয়ে আসেনি।

তার মা জানে না যে সে হরেকেষ্টর বাড়িতে কাজ করছে। জানলে কখনই করতে দিত না। প্রাণকেষ্টর ওপর সে হাড়ে হাড়ে চটা। নীলুও সেকথা মাকে বলতে পারে না, তাই খালি-পেটে চলে এসেছে। আজ লক্ষ্মী ঠিক বুঝতে পেরেছে যে সে না খেয়ে রয়েছে—তার ব্যাকুল দৃষ্টি দেখে নীলু তা অনুমান করেছে। কিন্তু তবু লক্ষ্মী তাকে ডেকে বসিয়ে কিছু দিতে পারেনি। অথচ আগের দিন হলে কত আদর করে খাওয়াতো। লক্ষ্মী নিশ্চয় তার মত সারাদিন না খেয়ে থাকবে।

না খেয়ে গরুর পেছনে ছোটা চলে না, আবার না ছুটলেও হয় না। কখন কোন ক্ষেতের মধ্যে ঢুকে পড়বে ঠিক কি।

একবার কারও ক্ষে'

কত সাধনার ফস

এই নিয়ে কি বছ

ক্ষেতের দিকে -

যার আশেপা

গাছতলা

হঠাৎ নন্দকে

আসছে নন্দ

চাকায় মাঠে

সারা মাঠের

কালে। সে

মাটি তুলে ঢিা

নন্দ সতি

অনুভব করে।

নয়! তবে এ

সে কি ক'রে জান:

আসে না। এটা

দূর থেকে সে চিনে

গায়ের রঙই মাটি করে৷

লাল সাদা আর কালোর অ

নন্দ হাসতে হাসতে এগি

আরও অবাক হয় নীলু। ভেবো

যাবে তাকে।

—"তোর কাছেই আসছি নীলু। অব.

ছিলাম। সত্যিই
'কে বিয়ে করব,
রাগ না হয়।"

তাদের কত-
।।"
। নন্দ বলে
ারে না।
উচিত।"

হবে কেন?"
র।"—নন্দ হাসে।
কোথা থেকে কি
নন্দ যেন ভগবানের
। তাকে খারাপ বলে
গুণও আছে? নীলুর চোখে

দছিস? ব্যাটাছেলে আবার কাঁদে
পাশ টাকা। লক্ষ্মীর বাবাকে দিস্।"
ত অস্বীকার ক'রে বলে—"টাকার যোগাড়

আমিই করব। তুমি বিয়ে না করলে কেউ অত টাকা দিতে পারবে না। আমি অল্প দিলেও হরেকেষ্টদার বাবা হয়তো রাজী হবে।"

—"আরে, ধরই না, অত লজ্জা কিসের?"

—"সে হয় না।"

—"তুই তো ভিক্ষে নিচ্ছিস না, শোধ ক'রে দিস পরে। টাকা তোকে ধার করতে হবেই। আমার কাছ থেকেই না হয় নে।" নীলু নন্দর কথার যৌক্তিকতা অস্বীকার করতে পারে না। সে টাকা কয়টা হাতে নেয়।

—"আজই বুড়োকে দিস। মেয়েটাকে বায়না ক'রে রাখিস।" নন্দ হাসে।

—"আজ কি ক'রে দিই! তুমি যে বিয়ে করবে না, সেকথা হরেকেষ্টদার বাবা না জানলে তো রাজী হবে না।"

—"তা বটে, ঠিক আছে। আমি গিয়ে বলে দেব সেকথা।"

নীলু নন্দর হাত চেপে ধরে বলে—"এতো তাড়াতাড়ি ব'লো না নন্দদা, তাহলে অন্য জায়গায় বিয়ে ঠিক হয়ে যাবে। আমার চেয়ে সকলের অবস্থাই ভাল। আগে সব টাকার যোগাড় করে নিই, তারপরে তুমি ব'লো।"

—"আমার কাছ থেকেই নিস সব টাকা, অত ভাবনা কিসের? তারপরই না হয় আমি বলব। তবে সব টাকা এখন দিতে পারবো না। সহরে গিয়ে নিয়ে আসতে হবে।"

নীলুর মন আনন্দে ভরে ওঠে। লক্ষ্মী যে তার, একথা ভাবাই যায় না। নন্দ সাইকেল নিয়ে কিছুদূরে চলে গিয়ে আবার ফিরে এসে বলে—"পনেরো দিন বাদে হাসানগঞ্জের মেলা, জানিস নীলু?"

—"হ্যাঁ, সে তো বর্ডারের ওপারে।"

—"তাতে কি হলো ?"

—"এবার মেলা ভাল বসবে না শুনছি, এপারের লোকে কি আগের মত যাবে ?"

—"কেন যাবে না ? সবাই যাবে।"

—"গুলি চলে যদি ?"

—"তোর মাথা খারাপ। যখন তখন গুলি চললেই হলো ? আর চললেও রাতে চলে।"

— "ফিরতে তো কত লোকের রাত হবে।"

—"তাতে কি হ'লো। হাসানগঞ্জের মেলার খবর সবাই জানে। আমিই তো যাবো।"

—"তুমি যাবে ?"

—"যাবো না ? অতবড় মেলা, দেখার কত জিনিষ আছে। তোর যেতে ইচ্ছে করে না ?"

—"খুব করে, কিন্তু কি ক'রে যাই। যেতেই তো দুঘণ্টা লাগে।"

—"আরে আমার তো সাইকেল আছে। পেছনে বসবি, আধ ঘণ্টায় যাবি, আর আধ ঘণ্টায় আসবি।"

—"আমাকে নিয়ে যাবে তুমি ?"

"কেন নেবো না।"

—"আমি যাবো।"

—"ঠিক আছে, তৈরি থাকিস।"

নন্দ চলে যায়। নীলু আবার নিশ্চিন্ত হ'য়ে বসে। আজকের দিনটা তার জীবনের এক স্মরণীয় দিন হয়ে থাকবে। দুপুরের

নির্জনতায় বসে থাকতে থাকতে সে কল্পনার ডানা মেলে দেয়। সে আর তার লক্ষ্মী—ভবিষ্যতের এক অখণ্ড চিত্র তার চোখের সামনে স্পষ্ট হ'য়ে ওঠে। এক সময় একটা কচি মুখও যেন উঁকি দেয় কোথা থেকে। কী সুন্দর মুখ—ঠিক লক্ষ্মীর মত। লক্ষ্মীর কোলের ওপর আর একটা ছোট লক্ষ্মী। না, দুর্গার কোলে লক্ষ্মী। দুর্গার কোলে কার্তিকও তো হ'তে পারে। সে যা হয় পরে হবে। এখন শুধু আসল লক্ষ্মীই থাক—হরেকেষ্টদার বোন লক্ষ্মী—যার মাথার চুল পেছন দিকে প্রায় মাটিতে গিয়ে পড়ে। যার চুলের প্রতিটা ঢেউএ চিরুনী আটকে যায়। যে লক্ষ্মীর চোখের পাতায় স্বপ্ন মাখানো। যার সুন্দর কপালের নীচে একজোড়া সুন্দর ভ্রূ। যে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেও মুখ অসুন্দর দেখায় না—তাতে আর এক সৌন্দর্য ফুটে ওঠে।

ভাবতে ভাবতে নীলু তন্ময় হ'য়ে যায়। হঠাৎ এক সময় খেয়াল হয়, বেলা বড্ড বেশী গড়িয়ে গিয়েছে। তাড়াতাড়ি উঠে পড়ে সে। গরুগুলোকে একত্রিত ক'রে ঘরমুখো রওনা হয়। মনে মনে সে লজ্জিত হয়। হরেকেষ্টদা তার ওপর ভার দিয়ে গিয়েছে অথচ সে নিজের সুখের কথা ভেবে সব ভুলে বসেছিল। এত বেলায় সকালের দুইয়ে রাখা দুধ ঠিক আছে কিনা কে জানে। হয়তো ছানা কেটে গিয়েছে। তাহলে লজ্জার সীমা থাকবে না।

সংকুচিত ভাবে সে লক্ষ্মীদের বাড়ী ঢোকে। দাওয়ার ওপর নির্দিষ্ট স্থানে প্রাণকেষ্টকে দেখতে না পেয়ে অবাক হয়। এমন সজাগ প্রহরী হঠাৎ উদার হ'লো কিসের জন্যে? নীলু আপন মনে গরুগুলোকে খোঁটার সংগে বাঁধতে থাকে।

লক্ষ্মী মুখ ভার ক'রে তার কাছে এসে বলে—"তোমার খুব

কষ্ট হ'য়েছে নীলুদা। সারাদিন কিছু খাওয়া হয়নি।"

—"না না, সে কিছু না। তোমার বাবা কোথায় লক্ষ্মী ?

—"বাইরে গেল।"

—"দুধের কলসীগুলো কই ?"

—"সেগুলো থাকলেও তোমাকে দিতাম না। সারাদিন খাওনি, আমি বুঝি জানি নে।"

—"জানবে না কেন ? আর আমিও জানি তুমি খাওনি।"

—"কি করে জানলে ?"—লক্ষ্মী রীতিমত বিস্মিত হয়।

—"এ জানতে আবার হাত গুনতে হয় নাকি ? কিন্তু বুড়ো মানুষকে কেন দুধ নিয়ে যেতে দিলে ? হরেকেষ্টদা কি ভাববে ? ছি ছি, আমারই অন্যায় হয়েছে।"

—"বাবা যায় নি দাদাই গেলো।"

—"হরেকেষ্টদা এসেছে ?"

—"হ্যাঁ দাদাকে আমি সব বুঝিয়ে বলেছি। দাদাই লজ্জা পেলো যখন শুনলো তুমি না খেয়ে কাজ করছ।"

নীলু স্বস্তি পেলো। এতক্ষণ নন্দর কথা বলার অবসর পায়নি। এবারে বলল—"একটা মজার খবর আছে।"

—"কি ?"

—"কাউকে বলো না, হরেকেষ্টদাকেও না। বলবে না তো ?"

—"তুমি মানা করলে বলি নাকি ?"

নীলু একটু একটু ক'রে নন্দর সব কথা তাকে ব'লে পঞ্চাশ টাকার নোট বার করে দেখায়। কিন্তু লক্ষ্মী নন্দর এই পরিবর্তনের কথা বিশ্বাস করতে পারল না। নীলুর আনন্দোজ্জল মুখের দিকে চেয়ে কিছু না বললেও তার নারীমনে

কিসের যেন শংকা থেকে গেল। বার বার কে যেন তাকে বলতে লাগল,—এ হ'তে পারে না—কিছুতেই হ'তে পারে না—নিশ্চয় কোথাও বড় রকমের ভুল হয়েছে। মনের এই আশংকার কথা নীলুকে বলতে তার কষ্ট হয়। তার অমন সুন্দর মুখখানাকে সে কালো ক'রে দিতে চায় না। হ'তেও পারে যে নন্দর সত্যিই পরিবর্তন হ'য়েছে। মেয়েদের ক্ষুদ্র মনে কত সন্দেহ, কত আশংকারই উদয় হয়—সব তো আর সত্যি হয় না।

লক্ষ্মী ভাবে, আশংকার কথা ছেড়ে দিলেও, নীলুকে পাওয়া কি অত সহজ। সে নন্দ নয়। তাকে পেতে হ'লে তপস্যার প্রয়োজন—পার্বতীর তপস্যা। হর-পার্বতীর মূর্তি তাদের দু'জনার বাড়িতেই রয়েছে। সেই যুগল মূর্তির পশ্চাতে রয়েছে দীর্ঘদিনের কঠোর তপস্যা। লক্ষ্মী কি সে তপস্যা ক'রেছে? না। কিন্তু তপস্যা সে করবে। নীলুদা তো শিবই। মূর্তির শিবের মুখের সংগে নীলুদার মুখের অদ্ভুত মিল—বিশেষ ক'রে তার হাসিটা। কী শান্ত আর সুন্দর। নীলুদার পাশে দাঁড়াতেও কত শান্তি—যেন পৃথিবীর সব কষ্ট, সব দুঃখ মিথ্যে। জগবন্ধু পণ্ডিত বলে-ছিলেন, দুধ থেকে যেমন মাখন তোলে, তেমনিভাবে দেবতারা সমুদ্র থেকে অমৃত তুলতে গিয়েছিলেন। বাসুকি সাপ হ'য়েছিল দড়ি। মাখন তুলতে লক্ষ্মীর সেকথা রোজই একবার ক'রে মনে হয়। সে দড়ির দুই প্রান্ত দুই হাতে ধরে ভাবে, তার ডান হাত হ'লো দেবতা, আর বাঁ হাত অসুর। মাঝে মাঝে সে বাঁ হাতের দড়ির মুখ দেখে নেয়, বিষ বার হচ্ছে কিনা। বাসুকির মুখ দিয়ে বিষ বার হ'য়েছিল। দেবতা আর অসুরের টানাটানি সে সহ্য করতে পারেনি। সেই বিষ বিশ্বকে ধ্বংস করত, যদি শিব এসে

তা পান না করতেন। বিষের জ্বালায় তাঁর গলা নীল হ'য়ে গেল—তাই তাঁর আর এক নাম নীলকণ্ঠ। হংসপুরের শিবের নাম নীলকণ্ঠ নয়—শুধু নীলু। হংসপুরের শিব লক্ষ্মীর আশে-পাশের সব বিষই পান করে নেয়। তাই তার কাছে গেলে অত তৃপ্তি। সারাজীবনের জন্যে সে তৃপ্তি কি তপস্যা ছাড়া মেলে? মেলে না।

লক্ষ্মীকে আনমনা দেখে নীলু বলে—"কি ভাবছো লক্ষ্মী।"

—"না, কিছু না। আমার খুব আনন্দ হচ্ছে নীলুদা। কিন্তু এখন কাউকে না বলাই ভাল।"

—"আমিও সেকথা বলি। নন্দদা যদি বিয়ে না করে, তোমার বাবা অন্য ছেলে ঠিক করতে পারে। আমার যেন কিছুতে বিশ্বাস হচ্ছে না অত সহজে তোমাকে পাবো।"

লক্ষ্মী অবাক হয়। ঠিক তার মনের কথাই নীলু বলল।

নীলুর এক সময় খেয়াল হয় যে, হরেকেষ্ট এলেও খুদিকে দেখা যাচ্ছে না।

সে বলে—"হরেকেষ্টদার বউ কই? দেখছি না তো।"

—"আসেনি।"

—"কেন?"

—"ওর মা ছাড়ল না। দাদা বলে বউ নাকি খুব বুদ্ধিমতী। দাদার সখ হয়েছে বউকে লেখাপড়া শেখাবে।"

—"ভালই তো। তোমার ইংরিজী কতদূর হ'লো।"

—"আধ্যেক। দাদা জানে না, আমি ইংরিজী পড়ি। দাদার সামনে পড়তে লজ্জা হয়। কিন্তু শেষ হবে কবে?"

—"আমার বাড়িতে গেলে।"

—"সেই ভাল, এখন মাথায় ঢোকে না।"—লক্ষ্মী হাসে।

—"জানো লক্ষ্মী, ফার্স্ট বুকটা পণ্ডিত মশায়ের কাছে পড়লেও, তার পরে নিজে নিজে অনেক বই প'ড়ে ফেলেছি। নিশিথগঞ্জের বাবুদের কাছ থেকে অনেক বই চেয়ে এনেছি। কিন্তু কিছুই হ'লো না। লোকে বলে ইচ্ছে থাকলে উপায় হয়। কিন্তু সেটা ঠিক কথা নয়। ঠিক কথা হ'লো, টাকা থাকলে উপায় হয়। আর টাকার সংগে ইচ্ছে থাকলে সবই হয়।"

লক্ষ্মী দীর্ঘশ্বাস ফেলে। সে জানে নীলুর কতখানি উচ্চাশা ছিল। অবস্থা ভাল হ'লে সে সবই হ'তে পারত। কিন্তু কিছুই হ'লো না। তাই তাকে গরু নিয়ে যেতে দেখলে লক্ষ্মীর কষ্ট হয়, ধান কাটতে যেতে দেখলে চোখে জল আসে। তার মনে হয়, নীলুকে যেন জোর ক'রে দাবিয়ে রাখা হ'য়েছে। সে এ-সবের জন্যে নয়। তার স্থান আরও অনেক ওপরে—অনেক—।

গ্রামে একদল লোক এলো। সরকারী লোক। সংখ্যায় ছয়জন। তাদের মধ্যে একজন মাতব্বর। মাতব্বর হ'লো অল্প-বয়সী শিক্ষিত ছেলে। নন্দদের বাড়ির বাইরের ঘরটায় তাদের আস্তানা হ'লো। সরকারের খাদ্যবিভাগের লোক এরা। গ্রামের সবাই জানলো, নন্দর যে ঘরটায় তারা থাকে সেটা ঘর নয়, ক্যাম্প। আর মাতব্বরের নাম পেট্রল-লীডার। নন্দ ইংরিজী কথাগুলো ভালভাবে শিখে নিয়ে খুব বলে বেড়াতে লাগল যার ফলে অল্প সময়ের মধ্যে সকলেই সেগুলোকে রপ্ত ক'রে নিল।

এরকম ক্যাম্প বর্ডারের চারদিকেই হ'লো। বর্ডারের একে-

বারে পাশে, হরেকেষ্টর শ্বশুরের গ্রামে মৈজুদ্দিনের বাড়ির কাছা-কাছিও একটা ক্যাম্প বসে। নদী নেই, নালা নেই, পাহাড় নেই, পর্বত নেই, এমনকি বেড়াও নেই—অথচ বর্ডারের ওপারে ধানের মণ বাইশ টাকা আর এপারে চোদ্দ টাকা। আশ্চর্যের কথা হ'লেও লোকে আর অত অবাক হয় না আজকাল। জানে, ওটা অন্য রাজ্য—ওদিককার ধরণই আলাদা।

এপার থেকে ওপারে নাকি রাতের অন্ধকারে ধান চালান যায়। একমণ ধান কোন রকমে মৈজুদ্দিনের শোবার ঘর থেকে রান্না ঘরে নিয়ে গিয়ে ফেলতে পারলেই আট টাকা লাভ। তার শোবার ঘর থেকে চাল নিয়ে গিয়ে রান্নাঘরে ভাত রাঁধলে ভাতের দর বেড়ে যায়। সবাই ভাবে মৈজুদ্দিন এবার বড়লোক হবে।

মৈজুদ্দিনের বড়লোক হবার সুযোগ সত্যিই এলো—নিত্য নতুন সুযোগ। কত লোকের খোসামোদ, কত লোকের টাকার প্রলোভন—কিন্তু সে বড়লোক হ'তে পারল না। বড়লোক হবার ধাত্‌ তার নেই। বরং দু'দিকের পুলিশ আর পেট্রলম্যানদের তীক্ষ্ণ নজরে তার অবস্থা আরও সংগীন হ'য়ে ওঠে। এপারের সিপাইরা দেখছে সে ধান সরাচ্ছে কিনা ওপারে, আর ওপারের সিপাইরা দেখছে সুপারীর চালান দিচ্ছে কিনা সে এপারে

মৈজুদ্দিন সবাইকে ডেকে তার দুঃখের কথা বলে আর কাঁদে। বলে—"আমি কি বড়নোক হ'তি চাই? আমারে একটু'খন শান্তিতে থাকতি দিলিই তো হয়। ক্যান্‌ যে শালার বাড়িখান্‌ ওখানে করতি গিছিলাম।"

প্রিয়নাথ বিশ্বাসেরও একই অবস্থা। পঞ্চাশ বছর আগে তার বাড়িখানা ওখানে তৈরী হ'য়েছিল, সেটা যেন মস্ত অপরাধ।

কম্ভ সরকারী লোকদের দোষ দিলেও তো চলবে না। জায়গাটা বর্ডার না হ'লে তারাই কি আসতো এখানে? পঁচিশ মাইল পায়ে হেঁটে কেউ সখ ক'রে এখানে আসে না। কই, আগে তো কেউ আসেনি কখনো। থানার পুলিশই আসতো না।

সরকারের লোকেরা জানে, সবাই মৈজুদ্দিনের মত ভাল লোক নয়। সে যা করছে না, আর একজন তার চতুর্গুণ করছে। মোটা টাকা পেলে সে-ই যে দলে ভিড়বে না, তার ঠিক কি?

গ্রামের পেট্রললীডার একদিন তাকে বলে "তুমি ভাল হ'লে কি হবে মৈজুদ্দিন, তুমি যে গরীব। তাই কেউ বিশ্বাস করতে চায় না। অভাবের নানান দোষ।"

কথাটা শুনে সে তেলেবেগুনে জ্ব'লে উঠেছিল। বলেছিল, "বুকে হাত দিয়ে কন দেখি কথাডা। গরীব হ'লো খারাপ? বাবুমশায় সেডা হক কথা না। হক্ কথাডা হ'লো, গরীবের দোষ চোখে পড়ে। পয়সা নাই যে। থানা কোর্ট করতি হ'লি পয়সা নাগে। বড়নোক ডাকাত হ'লিও চোখে পড়বি না। তাদের ট্যাকা আছে।"

—"তুমি রাগ করছ।"

"—রাগের কথা বললি কেডা না রাগে? বড়নোক ভাল—একথাডা কন্ ক্যামনে? তারা যা করে সব সয়। আমরা যা করি সয় না। একশো বস্তা ধান পার হ'লো চোখের সামনে, আপনার নোক খাড়ায়ে খাড়ায়ে দেখল। আর চিরণের পিসি আধ বস্তা ধান নিয়ে যাতিছিল চিড়ে কুটবি বলে, তারে ঠিক ধরল। চিরণের পিসি যে ঘুষ দিতি পারে না। তাই নিজের চিড়ে কুটলিও তার দোষ।"

পেট্রল লীডারের মুখ এতটুকু হ'য়ে যায়। মৈজুদ্দিন যেন তার

মুখে চুনকালি মাখিয়ে দিয়েছে। পেট্রললীডার ভাবতে পারে না যে তার অধীনের পেট্রলম্যানরা এই অল্প সময়েই এ সমস্ত সুরু করেছে। সে বলল—"তুমি দেখেছো ?"

—"না দেখলি অমনি বলতিছি।"

—"আমার কোন কোন লোক ছিল।"

—"সবাই ছিল বাবু। ট্যাকা নেওয়ার সময় যে,—সবাই থাকবি না ?"

পেট্রললীডার শুব্ধ হ'য়ে যায়। প্রতিদিন দু'বেলা অল্পবয়সী ছেলে ক'টাকে সে নীতিশিক্ষা দেয় ভেবে হাসি পেল। তারাও হয়তো নিজেদের মধ্যে কত হাসাহাসি করে তাকে নিয়ে। ছেলেগুলোর সরল চোখ-মুখ দেখে মনেও হয় না তাদের ভেতরে এমন দুর্নীতি লুকান রয়েছে। সে বুঝল বাইরের সরলতা কিছুই নয়, সেটা মুখোস। সে নিজেও ছেলেমানুষ। সবে কলেজ ছেড়ে চাকরিতে ঢুকেছে। এইতো তার অভিজ্ঞতার সুরু। আরও কত শুনবে, কত দেখবে। মৈজুদ্দিনের বয়স হ'য়েছে। সে অশিক্ষিত হ'লে কি হয় তার অভিজ্ঞতা অনেক বেশী।

—"একশো বস্তা ধান কার ছিল মৈজুদ্দিন ?"

—"সেডা ঠিক বলতি পারি না।"

—"জানলে বলো।"

—"বলব। আচ্ছা বাবুমশায়, আপনি গরীবকে অত খারাপ ভাবেন ক্যান।"

—"আমি কিছুই ভাবি না। লোকে যা ভাবে তাই তোমাকে বলেছিলাম। আমি নিজে বড়লোক নই। লেখাপড়া ছেড়ে আমাকে চাকরিতে ঢুকতে হ'য়েছে। তুমি কিছু মনে ক'রো না

মৈজুদ্দিন।”

তার কথায় এমন একটা অকৃত্রিম ভাব ছিল যা মৈজুদ্দিনের হৃদয় স্পর্শ করল। সে ভাবল, তার বড় ছেলে বেঁচে থাকলে আজ এত বড় হ'তো। এ একেবারে দুধের ছেলে। কেন যে এর বাপ মা একে এই গাঁয়ে পাঠিয়েছে কে জানে?

পেট্রল লীডার তার দলের লোকেদের একদিন হাঁতে হাতে ধরল। কর্তৃপক্ষকে জানানোর জন্যে সমস্ত ঘটনা একটা কাগজে লিখে নিজেই সাইকেলে ক'রে রওনা হ'লো পাঁচ মাইল দূরের পোষ্ট অফিসে পোষ্ট করতে। আর কাউকে সে বিশ্বাস ক'রে দিতে পারেনি চিঠিখানা, বিশ্বাস তার ভেঙে গিয়েছে।

কিন্তু পোষ্ট অফিস পর্যন্ত পৌছতে হলো না তাঁকে। ধান ক্ষেতের মধ্যে একদল অচেনা লোকের হাতে বেদম মার খেয়ে অজ্ঞান হ'য়ে লুটিয়ে পড়ল। অনেক পরে কয়েকজন চাষী তাকে সেই অবস্থায় দেখে উঠিয়ে নিয়ে আসে। পরে সদরের হাসপাতালে পাঠিয়ে দেওয়া হয়।

মৈজুদ্দিন শুনে কেঁদে ফেলল। তার মনে হ'লো, সেই যেন এর জন্যে দায়ী। সে যদি কিছু না বলত তাহলে এ ঘটনা কখনই ঘটতনা—ছেলেটা কখনই চোরাকারবারীদের বিরুদ্ধে যেত না। বাঁচবে তো সে? মৈজুদ্দিনের চিন্তা হয়। আহত হবার পরে তাকে দেখেনি সে। আগেই সদরের হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হ'য়েছে। খোদা যেন বাঁচিয়ে রাখেন তাকে,—যেন সুস্থ শরীর নিয়ে মা বাপের কোলে ফিরে যায়। এই কচি বয়সে ওরকম বিরাট মন ক'য়জনের হয়? কিন্তু সরষের মধ্যেই যদি ভূত থাকে

তাহ'লে ওরকম এক আধজন ছেলের চেষ্টায় কিছুই হবে না।

হংসপুরের পেট্রল লীডারের বদলির হুকুম হ'লো আহত পেট্রল লীডারের জায়গায়। তাই সেখানেও খবরটা ছড়ালো। নন্দ সেটাকে আরও ফলাও ক'রে বলে বেড়ায়। তবে নন্দর কথা মৈজুদ্দিনের কথা বা চিন্তার ঠিক বিপরীত।

নন্দ বলল—"অমন হবে আগেই জানা ছিল। ছেলেটা একেবারে ধম্মপুত্তুর যুধিষ্টির। আজকাল কি আর যুধিষ্টিরের দিন আছে?"

হরেকেষ্ট প্রতিবাদ ক'রে বলে—"যুধিষ্টিরের দিন চিরকালই থাকে নন্দ। তারা মরে না।"

নন্দ ঠোঁট উল্টে বলে—"মরবে কেন? অজ্ঞান হ'য়ে ধান ক্ষেতের মধ্যে পড়ে থাকে।"

হরেকেষ্ট একটু হেসে বলে—"সেরকম অজ্ঞান শক্তিশেল খেয়ে লক্ষণও হয়েছিল। আবার সেই লক্ষণই ইন্দ্রজিৎ বধ করল। শুনিসনি?"

—"কি করে শুনব, তোর মত তো জগবন্ধু পণ্ডিতের চেলাগিরি করিনি বেশীদিন।"

—"করলে বেঁচে যেতিস। টাকা না হ'লেও মানুষ হ'তিস।"

—"অমন চ্যাটাং চ্যাটাং কথা বলিস না হরে, ভাল হবে না।"

—"রাগিস কেন মিছিমিছি। তুই রাগলে কি ভয় পাবো? জগবন্ধু পণ্ডিতের চেলা ছিলাম, আবার হারাণ লেঠেলের সাকরেদও ছিলাম যে।"

নীলু দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে শুনছিল সব কথা। সে মুশকিলে পড়ল।

সে দেখল নন্দ ভীষণ চটে গেলেও হরেকেষ্টর স্বভাব জানে বলে সামলে রয়েছে। হরেকেষ্ট এমনিতে ভোলানাথ, কিন্তু রাগলে নটরাজ। গ্রামের কে না জানে সে কথা।

কিছু ঘটে গেলে নীলুরই অসুবিধে। বিয়ের ব্যাপারে গোলমাল হ'য়ে যেতে পারে। গায়ের জোর না থাকলেও দুষ্ট বুদ্ধিতে নন্দর কাছে সবাই ছেলেমানুষ। সে তাড়াতাড়ি হরেকেষ্টর হাত ধরে নন্দর কাছ থেকে সরিয়ে নিয়ে যায়।

হাসানগঞ্জের মেলার দিন এলো। নীলু মেলায় যাবে শুনে হবিবপুরের মিঞারা দুটো খাসী আনতে দিল তাকে। বাড়িতে তাদের উৎসব আছে। হাসানগঞ্জের মেলায় নাকি খুব সস্তায় খাসী মেলে। মিঞা-ভাইদের কাজে লাগতে পেরে নীলু খুসী হ'লো। সে তাদের কাছে কৃতজ্ঞ।

লক্ষ্মী যদিও জানতো যে নন্দর সাইকেলে নীলু হাসানগঞ্জে যাবে, তবু যাবার আগের দিন সে বলে—"তুমি যেও না নীলুদা—"

—"কেন ?"

—"তা জানিনে, আমার ভালো লাগছে না।"

—"নন্দদা তো আমাদের উপকারই ক'রেছে লক্ষ্মী। তাছাড়া যাবতো সাইকেলে।"

—"তা হোক্।"

—"একেবারে ছেলেমানুষ। বলো, তোমার জন্যে কি আনবো।" সে কথাটাকে উড়িয়ে দিতে চায়।

—"কিছু না। তুমি যেও না।"

—"এখন আর হয় না লক্ষ্মী। মিঞা-ভাইরা টাকা দিয়ে

দিয়েছে খাসী আনার জন্যে। তারা কি ভাববে বলো। শুধু শুধু মন খারাপ করছ।"

নীলু যখন চলে এলো, তখনও লক্ষ্মী মুখ ভার করেই ছিল। ভালভাবে কথা বলেনি তার সংগে। হঠাৎ তার অমত হবার কি কারণ ঘটল বুঝতে পারে না নীলু। হয়তো বর্ডারে গুলি চলার কথা শুনে ভয় পেয়েছে।

নন্দ সাইকেল চালাতে জানে বটে। নীলু বিস্মিত হয়। যেন ঘোড়া ছুটছে—তার চেয়েও জোরে। শ্রীমন্ত ডাক্তারের বুড়ো ঘোড়া তো খুঁড়িয়ে চলে। নন্দর নতুন সাইকেল যেন হাওয়ায় উড়ছে। তার ভাগ্যকে নীলু ঈর্ষা না করলেও ভাবতে অবাক লাগে, দু'দিন আগেও যে নন্দর অবস্থা তাদের মতই ছিল, হঠাৎ কি ক'রে তার অবস্থার এই পরিবর্তন হ'লো। একথা শুধু সে কেন, গ্রামের কেউ বুঝতে পারে না। তবে দেশভাগ হবার ঠিক পরেই গ্রামে যে তিনজন অপরিচিত লোক এসেছিল তারাই সমস্ত কিছুর মূলে—এবিষয়ে সন্দেহ নেই। তারা নন্দকে সহরে নিয়ে যাবার পর থেকেই তার অবস্থা ভাল হ'তে সুরু করল। সহর থেকে সে নতুন সাইকেল নিয়ে এলো। শুধু নিয়ে এলো নয়, শিখেও এলো কেমন ক'রে চড়তে হয়। যে নন্দ খালি গায়ে কোমরে গামছা জড়িয়ে ঘুরে বেড়াতো, তার গায়ে জামা উঠল। তাদের খড়ে-ছাওয়া ঘরের জায়গায় টিনের ঘর উঠল। এখন সে সিগারেট খায়, মুখে পাউডার মাখে। গ্রামের অন্য সকলের চেয়ে সে আজ স্বতন্ত্র। সে যেন নিশিথগঞ্জের বাবুদের মত ভদ্রলোক হ'য়ে গিয়েছে। নিশিথগঞ্জের আনন্দ রায়

আর নন্দর পোষাক একই রকমের। তফাৎ শুধু এই যে, আনন্দ রায় শিক্ষিত আর সে প্রায় অশিক্ষিত। অল্প কয়েকদিন মাত্র পাঠশালায় গিয়েছিল সে। তবে দেখে বুঝবার উপায় নেই। কথা বলতে শিখেছে বটে।

ছেলেবেলা থেকে নন্দ অনেক কীর্তিই করছে। তখন সবাই তাকে গালাগালি দিত, মারতো। কিন্তু এখন সে বড়লোক বলে, কিছু করলেও তার গায়ে হাত দেবার সাহস কারও নেই। তাছাড়া সে এমন কোন কাজ করে না, যা প্রকাশ হ'য়ে যেতে পারে—সেদিক দিয়ে সে ধূর্ত। সে জানে যত টাকাই তার হোক না কেন, গাঁয়ের লোকেরা অনাচার দেখলে একদিন ক্ষেপে উঠবেই।

তবু নন্দর স্পর্ধা দেখে নীলু সেদিন স্তম্ভিত হ'য়ে গিয়েছিল। জগবন্ধু পণ্ডিতের মত লোকও ঢোক গিলে সমস্ত ঘটনা চেপে গেল, বেত দিয়ে নন্দর সারা গায়ের চামড়া তুলে দিল না। পণ্ডিতের কাণ্ড দেখে সেও কিছু বলেনি। সন্ধ্যায় নির্জন পথে সে একা ছিল সাক্ষী সেই ঘটনার। নন্দ পণ্ডিতের বিধবা মেয়ের হাত চেপে ধরার সংগে সংগে মেয়েটি চিৎকার ক'রে উঠেছিল। ভয়ে নন্দ হাত ছেড়ে দিয়েছিল। অতটা আশা করেনি সে, কারণ অক্ষয় পণ্ডিতকে সময় অসময়ে টাকাটা সিকিটা দেয়।

লজ্জার খবরটা নীলু কাউকে জানায় নি, এমনকি লক্ষ্মীও জানেনা। সবাই জানলে নন্দর তো কিছুই হবে না, মেয়েটারই বদনাম। সেদিনের পর ছেলেবেলা থেকে তা'র মনের ভেতরে গড়ে ওঠা এক বিরাট শ্রদ্ধাসৌধ ভেঙে চুরমার হ'য়ে গিয়েছিল। পণ্ডিতকে সে মহান বলে চিন্তা করত, কিন্তু দেখল অর্থের অভাবে

পণ্ডিতও আর পাঁচজনের মতই অন্যায় সহ্য করে—অন্যায়ের বিরুদ্ধে রুখে দাঁড়ায় না। অথচ ছেলেবেলায় কত আদর্শের কথা শোনা যেতো পণ্ডিতের কাছে।

মেয়েটি কাঁদতে কাঁদতে এসে বাবাকে নালিশ করলেও নন্দ নিস্তার পেয়েছিল। নীলু ভাবে, সবাই পণ্ডিতের মেয়ের মত চিৎকার করে না,—যদি অবস্থাটা পণ্ডিতের মত হয়। আর অনেকের চিৎকার করার অভ্যাসও নেই। তাছাড়া সব পথ দিয়ে সব সময় নীলুও যায় না। তাই নন্দর কীর্তির শতাংশের একাংশও বোধহয় কানে আসে না কারও। তবু ক'দিনই বা নন্দ গ্রামে থাকে, সপ্তাহে বড়জোর তিনদিন। এই তিনদিনেও এত কাণ্ড—সব দিন থাকলে কি হ'তো কে জানে!

হাসানগঞ্জের মেলায় অনেক লোকই যাচ্ছে। তাদের পাশ কাটিয়ে ছুটে চলেছে সাইকেল। সাইকেল আরোহীদের দেখে রাস্তার লোকদের মনে মনে হয়তো হিংসাও হ'লো।

নন্দ এক সময়ে বলে—"কিরে নীলু, কষ্ট হ'চ্ছে না তো?"

—"না"—নীলু ঠিক সত্যি কথা বলল না। ক্যারিয়ারে বসলেও তার পেছনটা অসার হ'য়ে গিয়েছিল।

—"আর একটু বসে থাক, এইতো এসে গেলাম।"

—"নন্দদা, দুটো খাসী কিনতে হবে যে।"—নীলু এতক্ষণ খাসীর কথা বলেনি নন্দকে, পাছে সে তাকে সাইকেলে ক'রে না নিয়ে আসে।

তার কথা শুনে নন্দর বিরক্তি তো হয়ই না, বরং আনন্দে চোখ তার জ্বলজ্বল্ ক'রে ওঠে। বলে—"কার খাসীরে—"

—"মিঞা-ভাইদের।"

—"ঠিক আছে,—অনেক সস্তায় পাওয়া যায়।"

—"কি ক'রে নিয়ে যাবো।"

—"সে সব ঠিক ক'রে দেবো, ভাবিস না। কতলোক ফিরবে—"

নীলু নিশ্চিন্ত হয়।

মেলায় গিয়ে নন্দ এদিকে ওদিকে ঘুরে নানান জিনিষ দেখাতে থাকে নীলুকে। দেখে সত্যিই ভাল লাগে। সেই কবে এসেছিল ছোটবেলায়—তত মনে নেই। সেবার লক্ষ্মীও ছিল সংগে—হরগৌরী মূর্তি ছুটো সেবারই কিনেছিল তারা। মেলার সমস্ত কিছুই নতুন বলে মনে হয়। তবে সেদিনের সেই বিস্ময়-ভরা দৃষ্টি আর নেই—তাই ভাল লাগলেও চমক লাগে না আগেকার মত।

ঘুরতে ঘুরতে দেরী হ'য়ে যেতে লাগলো। নীলুর অস্বস্তি বাড়ে। খাসীটা কিনে কারও জিম্মায় দিলে স্বস্তি পেতো সে। নন্দকে সেকথা বলে।

নন্দ বলে—"আরে কিনলেই হবে। অনেক লোক পাওয়া যাবে নিয়ে যাবার।"

—"লোক না পেলে, আমাকেই তো নিতে হবে। এখন না কিনলে ফিরতে রাত হবে।"

"চল তবে কিনিগে।"—অনিচ্ছা সত্বেও সে চলল নীলুর সঙ্গে। তার মুখ বিরক্তিতে ভরা। সংকোচ হয় নীলুর, কিন্তু উপায় নেই।

খাসী কিনতে অনেক দরদস্তুর ক'রে অযথা সময় নষ্ট করল নন্দ। এমনিতে যে দরে পাওয়া যাচ্ছিল, তাই অভাবনীয়। এ রাজ্যে পয়সা দিয়ে নাকি খাসী কিনে খাবার লোক নেই,—জলের দামে তাই বিক্রি হয়। নন্দর দর কষাকষি দেখে নীলু

চঞ্চল হয়ে ওঠে, এর পরেও আবার লোক ঠিক করতে হবে।

শেষে খুবই কমে দুটো খাসী কেনা হ'লো। মিঞা-ভাইরা যে টাকা দিয়েছিলেন তার অর্ধেকও খরচ হ'লো না।

নন্দ বলল—"এত সস্তা জানলে, আমিও কিনতাম।"

—"এখন কেনো, টাকা তো রয়েছে।"

—"কি ক'রে নিয়ে যাবো।"

তার কথায় নীলু বিস্মিত হয়। নন্দ যা বলছে সে সমস্যা তো তারও। নন্দই লোক ঠিক ক'রে দেবে বলেছে।

সে বলে—"মিঞা-ভাইদের খাসী যার সংগে যাবে, তাকেই দিয়ে দিও।"

—"ও খাসী হয় তো তোকেই নিয়ে যেতে হবে রে।"

—"সে কি ?"

—"লোক পাওয়া যাবে এমন তো কোন কথা নেই। চেষ্টা করব বলেছি।"

—"আগে বলনি কেন নন্দদা।" নীলুর নিজের চুল ছিঁড়তে ইচ্ছে হয়। এতটা পথ হেঁটে যেতে হবে ভাবতেই তার গা শিউরে ওঠে। এমন জানলে সে আসত না—কখনই না। লক্ষ্মীর কথা শোনা উচিত ছিল—বোঝা উচিত ছিল নন্দর ভাল-মানুষীটাই তার স্বভাববিরুদ্ধ। যে নন্দকে সবাই জানে, সেইটাই তার আসল রূপ।

নীলুর মুখের দিকে চেয়ে বাঁকা হাসি হেসে সে বলে, "ঘাবড়াস কেন ? লোক পাবো না, তাতো বলিনি এখনো। তবে পাবো এমন কোন কথা নেই। তুই এখনো দুধের ছেলে। ধর যদি লোক না পাই, কি হ'লো তাতে ? চার ক্রোশ রাস্তা কি বেশী ?"

—"তুমি একটু তাড়াতাড়ি ছাখো নন্দদা, কেউ রাজী না হ'লে এখনি রওনা হ'তে হবে।"

—"তুই দাঁড়া এখেনে, আমি দেখছি।" নন্দ চলে যায়।

লক্ষ্মীর জন্যে একটা পুঁতির মালা কিনবে ইচ্ছে ছিল নীলুর। লক্ষ্মী মনে মনে নিশ্চয় আশা করে। যত সামান্য জিনিষই হোক না কেন, সে নিজে হাতে ক'রে দিলে লক্ষ্মীর কত আনন্দ হয় তা তো জানে। সব সময়ই নন্দ পাশে ছিল বলে কেনা হ'য়ে উঠলো না। ভেবেছিল তার অলক্ষ্যে এক ফাঁকে কিনে নেবে, তাও হ'লো না। তার চোখের পাতা ভিজে ওঠে। কত ভেবে-চিন্তে সে পুঁতির মালা দেবে ঠিক করেছিল। আর সব জিনিষই বাইরের লোকের চোখে পড়ে। এ মালা তো কারও চোখ পড়ত না, অথচ লক্ষ্মী সব সময় অনুভব করত। এক শিশি তরল আলতা কেনারও সখ ছিল তার, আলতা পরলে লক্ষ্মীকে বড় মিষ্টি দেখায়।

অনেকক্ষণ হ'য়ে গেল, নন্দ এলো না। নীলু বুঝতে পারে যে, সে আসবে বলে যায়নি। কিন্তু কেন তবে তাকে নিয়ে এলো মেলায়? সে তো নিজ থেকে যেচে আসতে চায়নি। কি উদ্দেশ্য থাকতে পারে এর পেছনে? উদ্দেশ্য যাই থাকুক, তাকে এখনই রওনা হ'তে হবে।

খাসী দুটোর দড়ি ধরে টানতে টানতে সে মেলা ছেড়ে রাস্তার ওপর আসে। আধ ঘণ্টার মধ্যেই সূর্য ডুববে। অন্ধকার হবার আগে বর্ডারের ওপারে যেতে পারলে নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

খাসী দুটোর একটাকে দেখে নীলুর মায়া হ'লো। তার সাদা গায়ে কাঠবেড়ালীর গায়ের মত তিনটে কালো টানা দাগ।

সাধারণতঃ এমন দেখা যায় না। যেন আদর ক'রে হাত বুলিয়ে দিয়েছেন ভগবান। কাঠবেড়ালীর গায়ে যেমন হাত বুলিয়ে দিয়েছেন শ্রীরামচন্দ্র। সমুদ্রের ওপর সেতু নির্মাণের সময় সবাই সামর্থ অনুযায়ী সাহায্য করেছিল তাঁকে। কাঠবেড়ালীও মুখে ক'রে নুড়ি কুড়িয়ে এনে ফেলেছিল। বানর সেনারা তার কাণ্ড দেখে হাসলেও, শ্রীরামচন্দ্র কৃতজ্ঞতায় গলে গিয়ে তার গায়ে হাত বুলিয়ে দিলেন। বিপদের সময়ের সাহায্য যত সামান্যই হোক না কেন, তার মূল্য কিন্তু সামান্য নয়। রামচন্দ্রের আঙুলের দাগ এখনো কাঠবেড়ালীর গায়ে। খাসীটার গায়েও তেমনি দাগ। কিন্তু এ দাগ যদি ভগবানের হাতেরই হবে, তবে মিঞা-ভাইদের বাড়ি যাচ্ছে কেন এটা? তাদের বাড়ির উৎসবে নিমন্ত্রিতদের খোরাক হবে বলে তো? নীলুর কষ্ট হয়। আহা বেচারা—যত জুলুম এদের ওপর। এদের ডাকটাই কেমন যেন অসহায়। অপঘাতে মরবার জন্যেই এরা জন্মায়। ছাগল জাতির সৃষ্টিই হয়তো সেজন্যে। হিন্দুদের বলিতে এরা অপরিহার্য, মুসলমান-দের কোরবাণীতেও এদের প্রয়োজন হয়, কোথাও নিস্তার নেই। হিন্দুরা এক কোপে এদের গলা নামিয়ে দেয়, আর মুসলমানেরা আড়াই পোঁচে এদের জবাই করে। দুটোই কষ্টকর। তার চেয়েও নাকি কষ্ট দিয়ে মারার ফন্দি রয়েছে। কোথায় যেন এদের গলায় ফাঁস দিয়ে পোঁচিয়ে পোঁচিয়ে মারা হয়—ভগবানের কাছে উৎসর্গ করার জন্যে। রক্তহীন মাংস খেতে কষ্ট হয় ভগবানের, ওরফে ভগবানের পূজারীদের। তাই এইভাবে মেরে যতটা সম্ভব রক্ত কম অপচয় করা হয়। নীলু ভাবে, ছাগল জন্মই বোধহয় শেষ জন্ম। তার পরে আত্মা চিরকালের জন্যে ভগবানের

সংগে গিয়ে মেশে।

চড়ক ডাঙার আম বাগানের কাছে এসে পড়ে নীলু—বিরাট বাগান। এই বাগান শেষ হলেই এ রাজ্যের শেষ। অন্ধকার না হলেও সন্ধ্যা হয়ে গিয়েছে। আরও পাঁচ মাইল হাঁটলে হংসপুর। চাঁদটা আকাশেই রয়েছে—তবে এখনো ফ্যাকাশে। নিজের আলো বিকিরণের সামর্থ তার এখনো হয়নি। সূর্যকে আর না দেখা গেলেও তার প্রভাব সম্পূর্ণ কেটে যায়নি। নীলু ভাবে, পথ চলতে খুব কষ্ট হবে না। বাগানের ওপারে গেলেই চাঁদের আলো পাওয়া যাবে। আম বাগানের ভেতরটা এখন বেশ অন্ধকার।

রাস্তা থেকে হাত তিরিশ দূরে একটা ছোট খড়ের ঘরের সামনে একজন সিপাই রাইফেল হাতে দাঁড়িয়ে রয়েছে। এ-রাজ্যের বি ও পি নিশ্চয়। ক্যাম্পের দেওয়ালে একটা সাইকেল হেলান দিয়ে রাখা আছে। সাইকেল খানা দেখে সে অবাক হয়—একেবারে নন্দর সাইকেলের মত। ঠিক সেই রকম নতুন—পেছনে ক্যারিয়ার আছে। রঙটাও সবুজ বলেই মনে হলো। এগিয়ে গিয়ে ভাল করে দেখে আসার ইচ্ছে হয় তার, কিন্তু ভয়ে পারে না। বর্ডারের কথা কিছু বলা যায় না। সে তাড়াতাড়ি আম বাগানের ভেতরে ঢুকে পড়ে।

আম বাগানে ঢোকার সংগে সংগেই পেছনে রাইফেল গর্জে ওঠে। ভয়ে সে তাড়াতাড়ি বসে পড়ে। তার পাশের একটা খাসী ধড়ফড় করতে করতে নিশ্চল হয়ে যায়—কাঠ বেড়ালীর মত যার গা। সে দিক্ বিদিক জ্ঞানশূন্য হ'য়ে ছুটে একটা আম গাছের গুঁড়ির আড়ালে গিয়ে লুকোয়—সংগে

সংগে আর একবার গর্জে ওঠে রাইফেল। এই চরম মুহূর্তে এটুকু অন্তত: নীলু বোঝে যে সিপাইটির লক্ষ্য বস্তু সে ছাড়া কেউ নয়। রাস্তায় অন্য লোক নেই। কিন্তু কেন যে তার ওপর এই আক্রমণ সেকথা বোঝার মত সময় বা মনের অবস্থা তার ছিল না। দ্বিতীয় গুলিটাও যখন ফস্কে গেল, তখন সে শুধু ভাবল কি করে বাঁচা যায়। তার দৃঢ় ধারণা হলো যে তৃতীয় গুলিও ছুটবে এখুনি। তার আগেই তাকে পালাতে হবে, লুকোতে হবে।

কিন্তু কোথায় লুকোবে সে? পর পর দুটো গুলি ফস্কালো দেখে এতক্ষণে হয়তো সিপাইটা ছুটে আসছে। নীলুর বুকের ভেতরটা ধড়াস ধড়াস করে। কি করবে এখন সে? একটা চূড়ান্ত অসহায় ভাব তাকে আচ্ছন্ন করে। সিপাইটা বোধ হয় এসে গেল। একেবারে সামনে দাঁড় করিয়ে মারবে তাকে। হতাশায় তার চোখে জল আসে! এমন অকস্মাৎ জীবনের ওপর ছেদ পড়বে কখনো ভাবেনি সে,—আর এমন ভয়ংকর ভাবে। লক্ষ্মীর কথা মনে হয়। সে কতবার তাকে মানা করেছিল আসতে। তখন শুনলেই হ'তো তার কথা। না এলেই হ'তো হাসানগঞ্জের মেলায়। মায়ের রোগাটে পাংশু বিষণ্ণ মুখখানাও চোখের সামনে ভেসে ওঠে।

আম গাছটার পাশেই একটা বড় ঝোপ রয়েছে। নীলু হামাগুড়ি দিয়ে সেই ঝোপের মধ্যে ঢুকে পড়ে। হয়তো সাপ আছে, আরও কত কি আছে—কিন্তু সে-সব কথা মনে পড়ে না তার। তাকে বাঁচতে হবে। এভাবে মরতে সে কিছুতেই পারবে না। না, না, এর চেয়ে জামগাছ থেকে পড়ে মরা ভাল জলে ডুবে মরা ভাল, কালাজ্বরে মরা ভাল। তার গায়ের নানা

জায়গায় কাঁটা ফোটে—নাটাই গাছের কাঁটা, ছোট ছোট খেজুর গাছের কাঁটা, বাবলার কাঁটা। বিছুটিতে সারা গা জ্বালা করে —সে বুকে হেঁটে অগ্রসর হয়।

ঝোপটা আমবাগানের ভেতরে অনেকদূর এগিয়ে গিয়েছে। আস্তে আস্তে এগোয় নীলু। তার লক্ষ্য, যাতে গাছপালা না নড়ে। নড়লে বুঝতে পারবে সিপাইটা। সেই জায়গা লক্ষ্য করে গুলি ছুঁড়বে—যেমন করে বুনোরা শূয়োর মারার সময় ফলা ছোঁড়ে, নড়ে ওঠা গাছের গোড়া লক্ষ্য করে।

নীলু বোঝে যদি সন্ধ্যা না হ'তো তাহলে সিপাইটা এতক্ষণে তাকে আবিষ্কার করে ফেলত। অন্ধকার হয়ে এসেছে বলে এখনো সে বেঁচে রয়েছে। কোনরকমে আর হাত তিরিশেক যেতে পারলে আমবাগানের গাঢ় অন্ধকারটা পাওয়া যাবে। কিন্তু ঝোপ যে শেষ হয়ে এলো। ঝোপের শেষে সিপাইটা দাঁড়িয়ে আছে কিনা কে জানে। বৃথা ছোটাছুটি না করে সেখানে দাঁড়িয়ে রাইফেল উঁচিয়ে মুচকি হেসে তার জন্যে অপেক্ষা করছে হয়তো। ভাবতেই সে শিউরে ওঠে। সে ঠিক করে ঝোপের শেষপ্রান্তে না গিয়ে পাশ দিয়ে বার হয়ে গা ঢাকা দেবে। কিন্তু গা ঢাকা দেবার জায়গা কই? একটা আমগাছ রয়েছে বটে। রাত্রি না হওয়া অবধি তার গোড়ায় অপেক্ষা করা যেতে পারে।

নীলু ছুটে গিয়ে আমগাছটার আড়ালে দাঁড়ায়। সে কান পেতে শোনে কোন মানুষের পায়ের শব্দ পাওয়া যায় কিনা। না, নিস্তব্ধ চারদিকে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে। হঠাৎ একসময় মনে হয়, তার ঠিক পেছনেই যেন সিপাইটা দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে গোঁফে তা' দিচ্ছে—ভাবতেই গা-হাত-পা ঠাণ্ডা হ'য়ে আসে

খুব ধীরে ধীরে সে ঘাড় ফেরায়—নাঃ কেউ নেই।

শুকনো পাতার ওপর পায়ের শব্দ শোনা যায়। দু-চারজন লোক কথা বলতে বলতে এগিয়ে আসছে। তাকে খুঁজতে আসছে নিশ্চয়। হতাশায় সে আমগাছের গুঁড়ির ওপর মাথা রাখে—আর রক্ষা নেই।

মানুষগুলো কাছে এলে নীলু আড়াল থেকে তাদের কথাবার্তা শুনতে পেলো।

—"কেউ সড়কি ছুঁড়েছে। রক্ত দেখলি না?"

—"কিন্তুক ওখানে ফেলে রাখবি ক্যান্?"

—"কথাডা ঠিকই।"

—"আর একটা খাসীও খাড়ায় আছে দেখনু।"

—"ওডারে কিছু করেনি।"

কথা শুনে নীলুর বুকে বল এলো। বুঝল হাসানগঞ্জের মেলা ফেরতা এরা। তারা কাছে এলে সে দৌড়ে গিয়ে তাদের সংগে মেশে। আমগাছের আড়াল থেকে তাকে ওভাবে ছুটে আসতে দেখে তারা অবাক হয়।

—"তুমি কেডা গো?"

—"এগিয়ে চল বলছি—"

—"ক্যান, এখন বলতি কি হয়? অমন দৌড়ায় আলে যে?" তাদের প্রশ্নে সন্দেহ।

—"এখন বলা যাবে না।"—সে একজনের হাত তুলে নিয়ে তার বুকের ওপর রাখে। বুকের ধড়ফড়ানি অনুভব করে লোকটা বিস্ময়ে হতবাক হয়।

নীলু বলে—"দেখলে তো? তাড়াতাড়ি এগিয়ে চল, বলছি।"

লোকগুলো তীব্র কৌতূহল নিয়ে জোরে পা চালায়। তাড়াতাড়ি এগিয়ে যেতে পারলে ঘটনাটা তাড়াতাড়ি শুনতে পাবে তারা।

বর্ডার পার হয়ে এসে নীলু আগাগোড়া সমস্ত ঘটনা তাদের শোনায়।

তারা এক সংগে চেঁচিয়ে ওঠে—"কও কি গো?"

একজন বলে—"ওরে ব্বাবারে, বন্দুকের শব্দ আমরাও শুনিছি। ভাবনু বুঝি বাবুরা হোড়েল মারতে আয়েছে। ওরে ব্বাবারে, আমরাও যে ওপথেই আলাম।"

নীলুও সেই কথাই ভাবছিল। ওরা তো একই পথে এলো, ওদের কিছু হ'লো না কেন? তবে কি তার জন্যেই বিশেষ করে মৃত্যুর ফাঁদ পাতা হয়েছিল?

চিথলের মোড়ে এসে লোকগুলো অন্য রাস্তায় যায়। নীলু হংসপুরের পথ ধরে। আপন মনে ভাবতে ভাবতে হঠাৎ প্রকৃত ব্যাপারটা তার কাছে দিনের আলোর মতই পরিষ্কার হয়ে যায়। নন্দ এত নৃশংস হবে সেকথা যে ভাবাও যায় না। অথচ না ভেবেও তো পারা যায় না। সাইকেলটা হুবহু তার। তাছাড়া তাকে সেধে ওভাবে হাসানগঞ্জের মেলায় নিয়ে যাবার অন্য কি কারণ থাকতে পারে? এই জন্যেই অত ভালমানুষী—অমন উদার হয়ে পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়ে দেওয়া। সেই টাকা তাকে দিয়ে লক্ষ্মীর সংগে বিয়ের প্রলোভন দেখিয়ে একেবারে পৃথিবী থেকে সরিয়ে দিতে চেয়েছিল নন্দ। মেলায় নিয়ে গিয়ে সেইজন্যেই ফেলে পালিয়েছিল। অপেক্ষা করছিল ক্যাম্পে—সে এলে তাকে চিনিয়ে দেবার জন্যে।

নীলু বুঝল, পরের দলটা ওপথ দিয়ে আসার জন্যেই সে বেঁচে গেল। সিপাইটা তৃতীয় গুলি ছাড়বার অবসর পায়নি। সেই দলের সংগে মিশে গিয়ে সে আরও নিরাপদ হয়েছিল। এতক্ষণে নিশ্চয় তাকে খোঁজা সুরু হ'য়ে গিয়েছে। নন্দও হয়তো রয়েছে তাদের সংগে।

এতবড় একটা বিপদ কাটার পরে নিজেকে বড্ড অবসন্ন বলে মনে হলো নীলুর। সে আপন মনে ধীরে ধীরে পথ চলে।

আরও এক মাইল পথ পার হলে হংসপুর। এমন সময় পেছনে সাইকেলের শব্দ পেয়ে সে চমকে ওঠে। নন্দ কি? হ্যাঁ সে-ই তো—সে একা। চাঁদের আলোয় স্পষ্ট দেখা যাচ্ছে তাকে। একা নন্দকে নীলু ভয় পায় না। তার দিকে তাকাতে ইচ্ছে হয় না। শয়তানকে দেখলেও ঘৃণা হয়।

নন্দ পাশে এসে সাইকেল থেকে নেমে বলে—"আরে, নীলু যে! তোকে খুঁজে খুঁজে হয়রাণ।"

—"ও।"

—"যাক, ফিরেছিস তাহ'লে।"

—"হ্যাঁ, ভাবতে পারছ না সেকথা? খুব আফশোষ হচ্ছে বুঝি।"

—"এঁ্যা, আফশোষ? সেকিরে?"—নন্দ আমতা আমতা করে।

—"খাসীর কথা জিজ্ঞাসা করলে না?"

—"ও হ্যাঁ, তাই তো! তোর খাসীগুলো কোথায়?"

—"আমিই তোমাকে জিজ্ঞাসা করব ভাবছিলাম। মড়া খাসীটাকেও কি সিপাইদের দিয়ে এলে?"

—"তার মানে ? কি বলতে চাস তুই, অত তেজ কিসের ?"

নীলু রুখে ওঠে—"তেজ হলেই বা তুমি কি করবে ? তোমাকে আমার জানা হয়ে গিয়েছে। যা করেছো তার চেয়ে তো বেশী কিছু করতে পারবে না ? যাও, ন্যাকামী করো না।"

নন্দ আবার কি যেন বলতে চায়। নীলু শক্ত করে তার হাত চেপে ধরে। চোখ দিয়ে আগুন ছোটে। বলে—"এ্যাইও চুপ, কথা বললে সাইকেল সুদ্ধু তোমাকে ওই ডোবার মধ্যে চুবিয়ে মারবো।"

নন্দ সাইকেলে উঠে তাড়াতাড়ি চম্পট দেয়।

পরদিন হরেকেষ্ট আর লক্ষ্মী দুজনাই একসংগে শুনল। শিউরে উঠলো তারা। লক্ষ্মী হরেকেষ্টর অস্তিত্ব ভুলে যায়। নীলুর হাতদুটো জড়িয়ে ধরে ডুকরে কেঁদে ওঠে। তার কান্না দেখে হরেকেষ্টরও চোখ সজল হয়ে ওঠে।

লক্ষ্মীর যেন বিশ্বাস হয় না যে নীলু সত্যিই ফিরে এসেছে। সে যেন এখনো সেই আমগাছের আড়ালে দাঁড়িয়ে রয়েছে, যার আর একপাশে রয়েছে সাক্ষাৎ যম।

হরেকেষ্ট বলে—"ভয় কিরে বোন। ওকে আর গ্রামের বাইরে যেতে দেবো না।"

হরেকেষ্টর কথায় লক্ষ্মীর সম্বিত ফিরে আসে। সে তাড়াতাড়ি নীলুর হাত ছেড়ে দেয়। হরেকেষ্ট বলে—"তোরা দাঁড়া, আমি বাবাকে দেখে আসি। বাইরে গেল কোথায় ?"

ঠিক সেই সময়ে প্রাণকেষ্ট বাড়িতে ঢোকে—তার মুখে

হাসি। নীলুকে দেখে হাসি মিলিয়ে যায়, ভ্রূকুঞ্চিত হ'য়ে ওঠে তার। তার দিকে একটা অবজ্ঞার দৃষ্টি ফেলে সোজা হরেকেষ্টর সামনে এসে বলে—"সব ঠিক ক'রে আলাম হরে।"

—"কি ?"

—"লক্ষ্মীর বিয়ে। দেখ না, তিনশ টাকা দিল।" প্রাণকেষ্ট হাতের টাকা দেখিয়ে কোমড়ে গুঁজে রাখে।

—"বিয়ে এখন হবে না।" হরেকেষ্টর স্বর দৃঢ়।

—"ক্যান্—" প্রাণকেষ্ট যেন আঁতকে ওঠে।

—"এমনি।"

—"ওসব চলবি না। নীলু অত ঘুরঘুর করলি কি হবি, এ বিয়ে আটকাতি পারবি না।"

—"এ বিয়ে হতে পারে না বাবা।"

—"ক্যান ? হতে পারে না ক্যান শুনি—"

—"শুনে কাজ নেই। হাঁপানি বাড়বে।"

—"বলতি হবি। হাঁপানী বাড়ুক। চালাকী পায়েছিস।" প্রাণকেষ্ট চেঁচিয়ে ওঠে।

—"বলছি, তুমি চুপ করে বস।" হরেকেষ্টর মধ্যে বিন্দুমাত্র উত্তেজনা নেই।

প্রাণকেষ্ট বসে—ঠেসে বসে, যাতে হরেকেষ্টর কথাগুলো ভালভাবে শুনে তার উপযুক্ত জবাব দিতে পারে। কিছুতেই ভুলবে না সে, যত মতলবই আটুক না কেন ওরা। বুড়ো হলেও ভীমরতি ধরেনি তার।

হরেকেষ্ট নীলুর কাছে যা শুনেছে আগাগোড়া সব বলে যায় একটার পর একটা। একটু রঙও মিশিয়ে দেয় তার মধ্যে।

নন্দকে ঘটনার ভেতরে এমনভাবে হাজির করে যাতে তার পরিচয় পেয়ে প্রাণকেষ্ট কেঁপে ওঠে।

হলোও তাই।

প্রাণকেষ্ট কিছুক্ষণ কথা বলতে পারে না। জোরে জোরে নিঃশ্বাস নেয়, যেন এখনি তার দম বন্ধ হয়ে যাবে। লক্ষ্মী ভয় পেয়ে বাবার কাছে ছুটে আসে। কিন্তু প্রাণকেষ্ট তাকে ইসারায় সরে যেতে বলে।

আরও কিছু পরে সে ধীরে ধীরে সামলে ওঠে। চোখের ঘোলাটে ভাব কেটে যায়। নিশ্বাস স্বাভাবিক হয়ে আসে। সে লক্ষ্মীকে বলে—"এই শরীলডাকে আর স্যাবা করিস না মা। টাকার লোভে তোর কত বড় সব্বোনাশ করছিলাম"

সে কেঁদে ফেলে। শিশুর মত কাঁদে। তার অহংকারের অবশিষ্টটুকু আজ চূর্ণ হয়ে গেল।

কারও মুখে কথা যোগায় না—বৃদ্ধের দিকে চেয়ে নীরবে দাঁড়িয়ে থাকে তারা। ব্যথায় তাদের মন ভরে ওঠে।

শেষে নীলুই বলে—"আপনার দোষ কি? আপনি কি ওকে চিনতেন? আমরাই চিনতাম না।"

প্রাণকেষ্ট নীলুর দিকে চায়। তাকে যেন সে আজ নতুন করে দেখছে। খ্যাপা ঘোষের ছেলে নয়—ফেলীর ছেলে নীলু। শুধু ফেলীর ছেলে। একই মুখের আদল, শুধু একটু রোদে পোড়া।

হরেকেষ্ট বলে—"তুমি বেশী টাকা পাচ্ছিলে, তাই বিয়ে দিচ্ছিলে। তাতে তোমার কি দোষ? এখন না দিলেই হলো।"

প্রাণকেষ্ট কোমড় থেকে ধীরে ধীরে নন্দর দেওয়া তিনশ টাকা হরেকেষ্টর দিকে এগিয়ে দিয়ে বলে—" ট্যাকা কডা ফিরায় দিয়ে

আয় হরে। কোমড়ে জ্বালা ধরছে।"

হরেকেষ্ট বাপের হাত থেকে টাকা নিয়ে নেয়। দেরি করা উচিত নয়। কখন আবার মত পালটে যাবে ঠিক কি। শেষে আর এক হাংগামার সৃষ্টি হবে।

নন্দকে আর দেখতে পাওয়া যায় না গ্রামে। হরেকেষ্ট বাপের দেওয়া তিনশ টাকা নিয়ে অনেকবার ঘুরে এসেছে তার বাড়ি থেকে। বাড়ির লোকেরা কিছু বলতে পারে না। অমন কতদিনই নন্দ বাইরে থাকে, নতুন নয়। তারা জানে সে শুধু শুধু বাইরে থাকে না—উপায় করে। যত বেশীদিন অনুপস্থিত থাকে, ততই তার পকেট ভারী হয়। বেশীদিন ডুব দিয়ে থাকলে তারা খুসীই হয় বরং, আর স্বস্তি পায় সেই সংগে। কারণ আজকাল নন্দর চরিত্রটা 'অন্ধ ভালবাসার অন্ধকার ভেদ করেও তাদের চোখে স্পষ্ট হয়ে উঠেছে! ছেলেকে কিছু বলা যায় না, অথচ গাঁয়ে বাস করতে হ'লে এ-মেয়ের মাসীর ও-মেয়ের পিসির গালমন্দ বা শাপমন্যি শুনতেও ভাল লাগে না। তাই নন্দ যত বেশী না থাকে গ্রামে ততই ভাল। টাকাকে টাকা লাভ, অনুযোগ অভিযোগ থেকেও নিষ্কৃতি লাভ। গাঁয়ের অভিযোগ যতটা সম্ভব ঠেকিয়ে রাখে নন্দর দজ্জাল পিসি ফাতু, যার কাছে সে মানুষ হয়েছে। পিসির জিভে বড় বিষ, সবাই ভয় করে। তাই কিছুটা নিশ্চিন্তে থাকে বাড়ির আর সবাই।

নীলু নন্দর দেওয়া পঞ্চাশ টাকা থেকে দুটো খাসী কিনে মিঞা ভাইদের দিয়ে এসেছিল। হাসানগঞ্জের দাম অনুযায়ী

মিঞা ভাইদের বাকী টাকাটা ফেরত দিয়েছিল সেই সংগে। তাদের কাছে সেদিনের ঘটনা সবই বলেছে নীলু, শুধু খাসীর কথা, নন্দর কথা বলেনি। বলেছিল খাসী দুটো আর একজনকে দিয়ে পাঠিয়ে দিয়েছিল আগে। খাসীর ব্যাপারে সত্যি কথা বললে তারা কখনই টাকা নিত না। তাই মিথ্যে বলতে বাধ্য হ'য়েছিল। নন্দর কথা সে বলেনি হংসপুরের বদনাম ছড়িয়ে যাবার ভয়ে। নিজের গাঁয়ের ওপর তার বড় টান। এই হংসপুর শুধু তার একার জন্মভূমি নয়, লক্ষ্মীও জন্মেছে এখানে। এখানকার প্রতিটি গাছ পালা তার চেনা,—গুঁড়ি, ডাল পালা সমেত। এখানকার কোন্ রাস্তার কোন বাঁকে কোন্ আগাছা রয়েছে নীলু তা চোখ বুজে বলে দিতে পারে। পথের কোথায় কি রকম গর্ত রয়েছে, কোথায় অসাবধানে চললে হোঁচট খেতে হবে তাও সে জানে। কোন জায়গাটা দিয়ে গেলে কি রকম গন্ধ পাওয়া যায় তাও তার জানা। এখানে সে আর লক্ষ্মী এক সংগে বড় হ'য়েছে—খেলতে খেলতে বড় হয়েছে—ঝগড়া করে বড় হ'য়েছে—ভালবেসে বড় হ'য়েছে। মিঞা ভাইদের কাছে কি করে ছোট করে এই হংসপুরকে। সম্ভব নয়—নন্দর জন্যেও নয়।

হরেকেষ্টকে নন্দর বাড়ির কেউ তার কথা জানাতে না পারলেও, বাড়ির বাইরে যে ক্যাম্প রয়েছে সেখানকার লোকেরা কিছুটা খবর দিল। তাদের কাছে সে শুনল যে নন্দ তারই শ্বশুরের গ্রামে গিয়েছে তিনদিন আগে। বি. ও. পির ডাক নিয়ে সদর থেকে একজন সিপাই এসেছিল, তাকে পৌছে দিতে গিয়েছে সাইকেলে।

হরেকেষ্ট বলে—"সিপাইকে পৌছে দিতে গিয়ে তিনদিন

বসে আছে ?"

—"তিনদিন কি আর অমনি বসে আছে ? অন্য কারণ আছে নিশ্চয়"—ক্যাম্পের একজন বলে।

—"কি কারণ ?"

—"সে তুমি বুঝবে না। আমরাও বুঝতাম না আগে।" পেট্রলম্যান হাসে।

—"বলেন না, শুনি।"

—"টাকা কামাচ্ছে, সেখানে বসে।"

হরেকেষ্ট অবাক হয়ে বলে—"সেখানে আবার টাকা কোথায় ?"

—"বললাম তো, তুমি বুঝবে না। নন্দ নাকি শিগগির পাকা বাড়ি তুলবে।"

হরেকেষ্ট বিশ্বাস করতে চায় না। বলে—"অত টাকা পেলো কোথায় ?"

—"ঠিক যখন জানিনে, বলি কি ক'রে ? সে আমাদের নিয়ে মহামুশকিলে পড়েছে হরেকেষ্ট। বাড়িতে জায়গা দিয়েছে, ভালমন্দ খেতেও দেয় মাঝে মাঝে, অথচ তার কথামত চলি না বলে বড় দুঃখ তার।"

—"কেন ?"

—"আমরা নাকি সব ধম্মপুত্তুর। আমার লীডার তো এখন তোমার শ্বশুরের গাঁয়ে—আগের লীডার মার খাওয়ার পর বদলী হয়েছে। লীডারও নাকি আমাদের মত। আগের লীডারের লোকগুলো অন্ততঃ নন্দর হাতে ছিল। তাদেরও সবার চাকরী গিয়েছে।"

—"একটু ভাল করে বলেন দেখি। কথাগুলো ঠিক বুঝতে পারছিনে।"—হরেকেষ্ট সন্দিহান হয়ে ওঠে।

—"ওসব কথা ছেড়ে দাও হরেকেষ্ট।"

—"নন্দ কি করে?"

—"সাধু কাজ করে না—তাতে হঠাৎ বড়লোক হওয়া যায় না।"

—"আমিও তাই ভাবি, কিন্তু ঠিক বুঝতে পারিনে।"

—"বুঝে আর কাজ নেই, তাতে আবার অনেকে দলে ভিড়ে যায়।"

—"আমাকে চেনেন না আপনারা—" হরেকেষ্টর মুখে হাসি ফুটে ওঠে। সে ক্যাম্প ছেড়ে চলে আসে। তার মনে নন্দ সম্বন্ধে নানান প্রশ্ন জাগে, কিন্তু মীমাংসায় আসতে পারে না। নন্দ কোন অন্যায় কাজ করে এটা ঠিক—ন্যায় কিছু করা ওর ধাতে নেই। কিন্তু কি এমন কাজ যাতে অত মুনাফা! হরেকেষ্টর ভ্রূ কুঞ্চিত হয়ে ওঠে, কিন্তু ভ্রূকুঞ্চনই সার হয়। যে কাজের কল্পনা তার চৌদ্দপুরুষের কেউ ঘুনাক্ষরেও কোনদিন করেনি, সে সম্বন্ধে আঁচ পাওয়া একপুরুষের একবারের ভ্রূকুঞ্চনের দ্বারা সম্ভব নয়। অথচ হরেকেষ্টর যদি ছেলে হয়, অবশ্য যদি খুদি হঠাৎ বাড়ন্ত হয়ে ওঠে, তাহলে দেখা যাবে, সে ছেলে দশবছর বয়সেই নন্দর কাজ সম্বন্ধে ওয়াকেবহাল।

প্রাণকেষ্ট জীবনে প্রথম নীলুদের বাড়ির দিকে চলল। খ্যাপা ঘোষ তার যাওয়া পছন্দ করত না। মুখে কিছু না বললেও আভাসে অনেকবার জানিয়ে দিয়েছিল সেকথা। সে তাই এড়িয়ে

চলেছে চিরকাল। ইতরামি সে পছন্দ করে না কোনকালে। যৌবনে ফেলীকে দেখার ইচ্ছে খুবই হতো, কিন্তু বিবেক তখন সংযত রেখেছে তাকে। মরে গেলেও সে অন্যায় করবে না। হরেকেষ্টর মায়ের প্রতি সে ন্যায় করেছে একথা সবাই বলে। কিন্তু সে জানে, সমাজে এটাই অন্যায়। সমাজ আর মানুষের মন এক নয়। যদি এক হতো তাহ'লে করমচা গাছের আড়ালে দৌড়ে গিয়ে ফেলীর হাত ধরে গ্রাম থেকে উধাও হওয়া তার পক্ষে ন্যায় হতো। সে জানত ফেলীর আপত্তি ছিল না তাতে। তবু সেরকম কাজ সে করেনি, কারণ সে সমাজ মানে। আর মানে বলেই হরেকেষ্টর মাকে নির্দোষ জেনেও সে ক্ষমা করেনি। সংসারে ভুলের ক্ষমা নেই—মাশুল দিতেই হবে।

কিন্তু আজকাল প্রাণকেষ্টর সন্দেহ হয়। সমাজের সেই শক্ত মুঠো কেমন যেন আলগা হয়ে গিয়েছে। সমাজ বড় উদার এখন। অনেক অন্যায় চোখে দেখেও এড়িয়ে যায়, আবার অনেক অন্যায় সে ক্ষমা করে। এর কারণ অনুসন্ধান করতে গিয়ে প্রাণকেষ্টর সর্বপ্রথম জগবন্ধু পণ্ডিতের কথা মনে হয়। পণ্ডিতের পাঠশালা ছেলেদের শুধু লেখাপড়া আর ভদ্রলোকের মত কথা বলতেই শেখায়নি, তাদের অসংযত করে তুলেছে। পাঠশালার কাছে হংসপুর আর তার আশেপাশের কয়েকখানা গ্রামের সমাজ বড়-রকম চোট খেয়েছে।

এসব বাড়াবাড়ি প্রাণকেষ্টর ভাল লাগেনি। একদিন তাই সে পণ্ডিতকে প্রশ্ন করেছিল। পণ্ডিত হেসে বলেছিল যে এসব নাকি কালের হাওয়া। সে এটুকু বলেই থেমে যায়নি। বলেছিল, আরও বিশ বছর পরে সমাজ বলতে আমরা যা বুঝি তার

অস্তিত্বই থাকবে না। তখন যে সমাজ থাকবে সে সমাজ শুধু দেখবে লোকে সুখে আছে কিনা, তারা ঠিকমত শিক্ষা পাচ্ছে তারা খেতে কিনা, পাচ্ছে কিনা। দেশের সর্বাধিক মংগলের দিকে সেই দেশজোড়া সমাজের লক্ষ্য থাকবে।

পণ্ডিতের কথা প্রাণকেষ্ট মোটামুটি বুঝেছিল। সে অবাক হয়ে ভাবল, এ আবার কেমন কথা! যে সমাজ একঘরে করে না, চরিত্র দেখে না, কলংকের বিধান দেয় না—সেটা আবার সমাজ নাকি? নাপিত যদি বন্ধ না হলো, ছেলেমেয়েরা যদি ইচ্ছামত বিয়ে করল, জাতধর্মই যদি না থাকল তাহলে দেশ উচ্ছন্নে যেতে আর বাকি থাকল কি? শ্রীমন্ত ডাক্তারও পণ্ডিতের মতই বলেছিলেন—বরং আরও এক কাঠি ওপরে। ডাক্তার বলেছিলেন, দেশ ভাগ হলেও স্বাধীন হয়েছে তো। এমন দিন নাকি আসবে যখন কারও ধোপা-নাপিত বন্ধ করা, একঘরে করা, মৃতদেহ না ছোঁয় অপরাধ বলে গণ্য হবে—কঠোর শাস্তি পেতে হবে। সমাজ হবে আকাশের মত উন্মুক্ত আর উদার।

শ্রীমন্ত ডাক্তারের কথা প্রাণকেষ্ট বুঝতে পারে নি। মুখ বেঁকিয়ে চলে এসেছিল। পণ্ডিতের না হয় বয়স হয়েছে বলে ভীমরতি ধরেছে, ডাক্তারের তো তা হয়নি! ডাক্তার অমন কথা বলেন কেন?

কিন্তু এসব কথাকে একেবারে মিথ্যে বলে উড়িয়ে দিতেও বাধে। দেশটা যেন সেদিকেই চলছে। চলুক। প্রাণকেষ্টর কি? সে আর কদিন? যা টান হয়েছে হাঁপানীর। ভালোয় ভালোয় মেয়েটার বিয়ে দিয়ে যেতে পারলেই হয়। ওরাই সব ঠিক করেছে—শুধু সামনে বসে থাকা। নিজেকে সাক্ষীগোপাল

বলে মনে হয় তার। তার কথার কোনই দাম দেয় না কেউ, অথচ কোন্ এককালে বাপ হয়েছিল বলে সবতাতে থাকতে হয় তাকে। লক্ষ্মী নীলুকে বিয়ে করে শান্তি পাবে না। অর্থের অভাব যেখানে, সেখানে মনের মিলটা কিছুই নয়। প্রাণকেষ্ট জানে সেকথা।

নীলু ছাড়া অনেক পাত্রই ছিল। নন্দর মত অমানুষ সবাই নয়। কিন্তু কে বলতে যাবে সেকথা। হরেকেষ্ট নিজের বেলাতেই কি বাপের কথা শুনেছিল? ঘোষেদাঁড়ার ক্যাবলা ঘোষের মেয়েকে বিয়ে করল না খোঁড়া বলে। আরে, খোঁড়া বলে তো আর বসে থাকত না, কাজকর্ম সবই করত। একটু লেংচিয়ে চললেও বয়স্থা ছিল তো। খুদির মত দুধের মেয়ে নয়। শুনল না বাপের কথা। এখন বুঝুক ঠেলা।

প্রাণকেষ্ট নীলু নেই জেনেই তাদের বাড়ি চলল, ফেলীর সংগে লক্ষ্মী আর নীলুর বিয়ে সম্বন্ধে দুটো কথা বলতে চায় সে। সব ঠিক করে আসবে। ভাগ্য ছাড়া গতি নেই। যে যার ভাগ্য সংগে করে আসে। লক্ষ্মীর যদি ভাগ্য ভাল হয়, নীলুর সংসারই একদিন ফুলে ফেঁপে উঠবে। একবছর আগে নন্দর অবস্থা নীলুর চাইতে এমন কিছু ভাল ছিল না! এখন সেই নন্দকে চেনাই যায় না।

ফেলী প্রাণকেষ্টকে হঠাৎ দেখে একহাত ঘোমটা টেনে দেয়। অতখানি টানার বয়সও নেই, প্রয়োজনও ছিল না। কিন্তু কেন যেন তার ভীষণ লজ্জা হ'লো। মানে যে বত্রিশটা বছর পার হয়ে গিয়েছে সেই বছর-ক'টাকে বত্রিশ দিন বলে মনে হ'লো। নীল শিরা-ওঠা ফর্সা হাত দিয়ে সে একটা বাঁশের খুঁটি চেপে ধরল।

খুঁটিটা না থাকলে হয়তো দাঁড়াতেই পারত না।

—"অমন ক'রে খাড়ায়ে থাকলে ক্যান্। বসতি দাও। হাঁপানির জ্বালায় কি দুদণ্ড খাড়ানের জো আছে?"—প্রাণকেষ্ট কেশে ওঠে।

হাঁপানির কথা শুনে ফেলীর খেয়াল হ'লো বত্রিশ দিন নয়, অতগুলো বছরই পার হয়েছে। ইতিমধ্যে সে ঘোমটা একটু ওপরে তুলে তাড়াতাড়ি পিঁড়ি এনে দাওয়ার ধারে পেতে দেয়।

—"আলাম তোমাদের বাড়ি।—"প্রাণকেষ্ট বসতে বসতে বলে।

—"এতদিন আসো নাই ক্যান্।"

—"কতদিনের কথা বলতিছ?"

ফেলী জবাব দেয় না। সত্যিই তো, কতদিনের কথা সে বলছে? বিয়ের পরের কথা কি? না, খ্যাপা ঘোষ মারা যাবার পরের কথা?

প্রাণকেষ্ট নিজেও চুপ ক'রে থাকে। ঠিক কোন্ কথা দিয়ে শুরু করবে ভেবে পায় না। অথচ এখানে আসার আগে সে ভাবছিল সেকালের সেই বয়স যখন তাদের নেই তখন দুজনাই সহজ হতে পারবে। সে একটু ভুল করেছিল। বয়স না থাকলেও এতদিনের অদর্শনের পর প্রথম নির্জন সাক্ষাৎ তাদের দুজনার মনকেই একেবারে সেকালের দিনে নিয়ে গিয়ে ফেলেছিল। শরীরের চাঞ্চল্য না থাকলেও মনের চাঞ্চল্য যেন ঠিক বত্রিশ বছর আগের মতই অনুভব করল তারা। প্রাণকেষ্ট ভাবে হরেকেষ্টর মায়ের সংগে দেখা করতে যখন ফেলী তাদের বাড়িতে যেত কিংবা যখন রাস্তাঘাটে তার সংগে দেখা হয়ে যেত তখন টুক্‌টাক্

কথা বলার অভ্যাস থাকলে আজ আর এই অস্বস্তি হ'তো না।

—"নীলুকে জামাই করব ভাবতিছি।"—প্রাণকেষ্ট এক সময় বল্লে।

—"এখন আবার ওকে টানো ক্যান।—"ফেলী বলে।

—"নন্দডা খুব খারাপ।"

—"নীলুও গরীব, তোমাদের নাকাল ওর গরু নেই। মুনিষ খাটে খায়। তার ঘরে মিয়েরে দেবা?"

—"রাগের বথা বলতিছ ফেলী।"

—"না, রাগ কবব ক্যান? আমরা যে গরীব রাগ করতি পারি?"

—"আমরা কি বড়লোক?"—প্রাণকেষ্ট বলে।

—"তোমাদের ঘরের চাল থেকেন জল পড়ে না। তোমাদের চাল-কুমড়ো চালের ফাঁক দিয়ে ঘরের মধ্যি ঝুলে পড়ে না।"

—"বর্ষার আগে তোমাদের চাল সারায়ে দেবো। হরেকেষ্ট বলিছি।

—"না. আমরা পারি সারাবো, না পারি ওম্‌নি থাকৃবি।"

—"ফেলী"—প্রাণকেষ্ট আর কিছু বলতে পারে না। সে জানে ফেলীর রাগ অংসগত নয়। তাই সে প্রস্তুত হ'য়েই এসেছে। ফেলী গোড়া থেকে জানত লক্ষ্মী তারই ঘরের বউ। লক্ষ্মীর ওপর তার সেইরকম দরদ। তাছাড়া লক্ষ্মী প্রাণকেষ্টর মেয়ে। সে কি কখনো ভেবেছে যে টাকার লোভে প্রাণকেষ্ট অন্য জায়গায় মেয়ের সম্বন্ধ করবে? এমনকি নীলুকে তার বাড়ি যেতে পর্যন্ত মানা করে দেবে? প্রাণকেষ্ট তার মনের কোণে লুকানো এক বিরাট গর্বকে ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। তাই সে

প্রতিহিংসাপরায়ণ।

—"ফেলী।"—প্রাণকেষ্ট হাঁপাতে থাকে।

—"এখন ফেলী ক্যান্? তোমরা পুরুষ, তোমাদের মন নেই তাই ঠকৃতি হয় না। আমরা মেয়ে মানুষ, আমরা কথায় কথায় ঠকি। তাই বলে, আর ঠকবো না।"

—"ফেলী।"—তার বলার অনেক কিছুই আছে, কিন্তু সেটা বলা কি উচিত হবে?

—"সেদিন আর নাই। নাম ধরে ডাকলি ভুলবো না। নীলু আমার ছাওয়াল।"

—"তা জানি। কিন্তু নীলু খ্যাপা ঘোষের ছাওয়াল—সে কথাডারেও যে ভুলতি পারি না। সেজন্যি তো এত গোলমাল।" উত্তেজনায় সে অবসন্ন হয়ে পড়ে। দুই হাঁটুর ওপর মাথা রেখে কাশতে শুরু করে। কাশতে কাশতে চোখ দিয়ে জল বার হ'য়ে আসে। ফেলী তার সেই বিশীর্ণ চেহারার দিকে চুপ ক'রে তাকিয়ে থাকে।

প্রাণকেষ্ট মুখ তোলে না। মুখ তোলার শক্তি তার নেই—দেহেও নয়, মনেও নয়। কাশি কমে যাবার পরও সে চুপ ক'রে থাকে। ভাবে, একটু সুস্থ হ'লে বাড়ি চলে যাবে, বসে থেকে লাভ নেই। বেঁচে থেকেই বা কি লাভ? চারদিকে শুধু সংঘাত। সে বেঁচে আছে এটা যেন মস্ত অপরাধ। এই অপরাধের কথা পদে পদে পদে তার কাছে প্রকট হয়ে উঠছে। কিছুর মধ্যেই সে আর থাকবে না। না, সে একা থাকবে—একেবার একা।

ফেলী প্রাণকেষ্টর হাঁপানীর টানের উত্থান-পতন দেখছিল

আর ভাবছিল বত্রিশ বছর আগের সেই সুদর্শন যুবকের কথা। আজও সে চেহারা মনের মধ্যে স্পষ্ট ভাসে।

মুখ নীচু করে হাঁপাতে হাঁপাতে প্রাণকেষ্ট এক সময় কষ্ট ক'রে বলে—"ছিমন্ত ডাক্তার বলেছে, আমার নিজের দোষে এ রোগ ধরল। খুব বেশী বাঁশী বাজালি এমন হয়।"

ফেলী চমকে ওঠে—বাঁশী বাজিয়ে প্রাণকেষ্টর এমন হয়েছে? সত্যিই তো বয়স তার খুব বেশী নয়। হাঁপানী না থাকলে এখনো দিব্যি কাজ কর্ম করতে পারত। তার চোখ দুটো সজল হ'য়ে উঠতেই অন্যদিকে মুখ ঘুরিয়ে তাড়াতাড়ি মুছে ফেলে সে।

—"ত্যাল আনি?" সে বলে।

—"না, একটু কমলি বাড়ি যাবো।"—প্রাণকেষ্ট আরও কিছুক্ষণ বসে থেকে আস্তে আস্তে উঠে দাঁড়ায়। হাতের লাঠিটা কাশির সময় দাওয়ার নীচে পড়ে গিয়েছিল, সেটাকে তুলে নেয়।

যাবার সময় সে বলে—'নীলু খ্যাপা ঘোষের ছাওয়াল না হয়ে আমার ছাওয়াল হ'তি পারত। তাহলি এতডি কথা শুনতি হ'তো না।"

তার কথা তীরের মত ফেলীর মর্মে গিয়ে লাগে। সে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তারপর প্রাণকেষ্ট চলে গেলে সে কেঁদে ফেলল। সত্যিই কাঁদল।

পনেরো দিন কেটে যাবার পরেও নন্দর খবর মিলল না। বাড়ীর লোকেরা এতদিন পরে দুর্ভাবনায় পড়েছে ক্যাম্পের লোকেরাও কিছু বুঝে উঠতে পারছে না। তারা দুটো বি' ও

পি তে ই খবর পাঠিয়ে খোঁজ পায় নি। ক্যাম্পের একজন সদরেও গিয়েছে সংবাদ আনতে।

নীলু ভাবল ভুল বুঝতে পেরে নন্দর হয়তো লজ্জা কিংবা অনুশোচনা হয়েছে—তাই কিছুদিনের জন্যে গা ঢাকা দিয়ে রয়েছে।

হরেকেষ্ট বলে—"আরে, তা না, মারের ভয় নেই।"

লক্ষ্মী বলে—"ওর অসাধ্য কিছু নেই দাদা, নতুন কোন মতলব নেই তো?"

অসম্ভব নয়। নন্দ সব পারে।

ক্যাম্পের লোকটা সদর থেকে আজ ফিরবে—হরেকেষ্ট তাই সেখানে গেল। গিয়ে দেখে তারা মহা উৎসাহে কিসের যেন আলোচনা করছে। নন্দর খবর পাওয়া গিয়েছে নিশ্চয়।

সে সেখানে দাঁড়াতেই, একজন তাকে চিৎকার ক'রে অভ্যর্থনা জানালো—"এসো হরেকেষ্ট। তোমাদের তো কপাল খুলল।"

হরেকেষ্ট বুঝতে পারে না এত উৎসাহে তাকে ডেকে কি শোনাতে চাইছে এরা। দেশটা আবার এক হ'য়ে গেল নাকি?

সে হেসে বলে—"আবার এক হ'লো নাকি?"

তার কথা ক্যাম্পের লোকেরা বুঝতে পারে না। বলে—"কি এক হলো?"

—"বলছি দেশটা আবার এক হ'লো নাকি?"

—"হুঁঃ, ওই আনন্দেই থাকো। ভুলে যাও হরেকেষ্ট—ওসব কথা ভুলে যাও। মিছি মিছি কষ্ট পাবে। শুনছি নাকি পাশপোর্ট হবে।"—একজন বলে ওঠে।

—"সেটা আবার কি জিনিস।" হরেকেষ্টর কথায় কৌতূহল।

"সেটা মস্ত জিনিস। বর্ডারের ওপারে যেতে হ'লে টিকিট লাগবে। সেই টিকিট দেখলে তবে ছাড়বে। অনেক পুলিশ-টুলিশের ব্যাপার।"

—"তাহলে"—তার কথায় হতাশা।

—"তাহলে আর কি। ওপারে যেতে হলে আগে সদরে যাও পাশপোর্ট করাও। তারপরে বর্ডারে যাও। যখন তখন টুপ্ টাপ্ পার হলে চলবে না।"

—"মৈজুদ্দিনের কি হবে তাহলে।"

—"কোন্ মৈজুদ্দিন?"

—"ওই তো যার উঠোনের মাঝ দিয়ে লাইন গিয়েছে?"

—"ওখানে আর থাকতে হবে না তাকে। হয় এপারে চলে এসো, না হয় ওপারে চলে যাও। হয় এদেশের প্রজা হও, না হয় ওদেশের প্রজা হও। কতলোক বর্ডার পার হ'য়ে চলে আসছে। তোমাদের এদিকে কেউ আসেনি এখনো। আসবে আসবে, ঠিক আসবে। দলে দলে এসে ভরে যাবে।"—মাতব্বর গোছের একজন বলে।

—"এই খবরের জন্যে ডাকলেন? আমি ভাবলাম নন্দর খবর পেলেন বুঝি।"

—"নন্দর কোন খবর নেই, গরু খোঁজা করা হ'য়েছে তাকে।"

—"গেল কোথায়?"

—"সবুর কর। একদিন আসবেই, কাঁচা ছেলে সে নয়।"

তা সে নয় বরং একটু বেশীরকম পাকা। সে নন্দর কথা আর না তুলে বলে—"টিকিটের কথা শুনে তো মন খারাপ হয়ে গেল, ভাল খবর দিলেন কই ?"

—"ঐ যাঃ যার জন্যে ডাকলাম তাই বলতে ভুলে গিয়েছি। তোমাদের আর পায় কে? যখন ইচ্ছে তখনই সদরে যেতে পারবে।"

কথাটার মধ্যে হরেকেষ্ট এমন কিছু খুঁজে পায় না। সে তো সবাই যেতে পারে সদরে। কিন্তু এতখানি রাস্তা হেঁটে যাওয়া সহজ নয় বলেই যাওয়া হয় না। নন্দর সাইকেল ছিল, সে তো হামেশাই যেতো। হরেকেষ্ট বোকার মত তাকিয়ে থাকে।

ক্যাম্পের একজন বলে—"অমন ক'রে দেখছ কি ? বুঝতে পারলে না ? রাস্তা হবে গো—পাকা রাস্তা—পিচ ঢালা।

—"কোথায় হবে ?"

—"সদর থেকে সোজা এসে তোমাদের গাঁয়ের মধ্যে দিয়ে একেবারে বর্ডারে চলে যাবে।"

কথাটা তার বিশ্বাস হয় না। সদর থেকে পাকা রাস্তা এসে বর্ডার পর্যন্ত গিয়ে লাভ কি ? তার পরেই তো ভিন্ন দেশ।

বলে—"তাই কি হয় ? ভুল শুনেছেন।"

যে সদরে গিয়েছিল। হরেকেষ্টর কথা শুনে সে চটে উঠে বলে—"নিজের চোখে দেখে এলাম হে। পাঁচ মাইল পথ এর মধ্যেই হয়ে গিয়েছে।"

—"তা হ'তে পারে। কিন্তু বর্ডারে যাবে না।"

—"বর্ডারেই যাবে।—"লোকটা তার কথায় জোর দিয়ে বলে—"সেজন্যই তৈরী হচ্ছে। কি রকম গুলি চলছে শুনতে

পাও না? সদর থেকে যাতে তাড়াতাড়ি পুলিশ আসতে পারে তার ব্যবস্থা হচ্ছে। ভাল লোকের কাছেই শুনেছি।"

হরেকেষ্টর এখন যেন কিছুটা বিশ্বাস হয়। মাস তিনেক আগে অদ্ভুত যন্ত্র নিয়ে তিনজন লোক ঘুরে গিয়েছিল বটে। তখন রাস্তা হবার একটা কথাও শুনেছিল। কিন্তু পিচের রাস্তা হ'লেই তো আর সদরে পৌঁছানো যায় না। তাই এমন কিছু উৎসাহ বোধ করে না সে। তবু ভাবতে আনন্দ লাগে যে তাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে একটা পাকা সড়ক চলে যাবে। ঠিক সদরের মত দেখাবে হংসপুরকে।

—"পাকা রাস্তা হবে, ভাল কথা, কিন্তু আমাদের কি লাভ?" সে বলে।

—"লাভ নেই? সদর যে হাতের কাছে চলে আসবে।"

—"পথ তো আর কমে যাবে না।"

—"তোমার কোন ধারনা নেই দেখছি, রাস্তা পাকা হলে মোটর চলবে, বাস চলবে। সদরে পৌঁছতে একঘণ্টাও লাগবে না।"

এতক্ষণে হরেকেষ্টর কাছে সবটা পরিষ্কার হয়। তাইতো, একথা আগে ভাবেনি সে। ক্যাম্প থেকে সে তাড়াতাড়ি চলে আসে। খবরটা সব চেয়ে আগে তাকেই ছড়িয়ে দিতে হবে সারা গ্রামে। এতবড় খবর এখনো কেউ জানে না। লক্ষ্মী শুনলে খুব আনন্দ হবে তার। তার কতদিনের সাধ সহর দেখবে।

হরেকেষ্টর মুখে গ্রামের ছেলে বুড়ো খবরটা শুনে ছুটে গিয়ে ভিড় করল ক্যাম্পে—সত্যি কিনা যাচাই করতে। তারপর গুলজার করতে করতে ফিরল ক্যাম্প থেকে। মিথ্যে না সত্যিই।

ক্যাম্পে গ্রামের লোকের ভীড় দেখে বাড়ির ভেতর থেকে নন্দর পিসি ফাতু শুধু বিষোদ্গারণ করতে লাগল। তার বক্তব্য, নন্দ চলে গিয়ে যে-গ্রাম কানা হয়ে গিয়েছে সেখানে এত আনন্দ কিসের? আর আনন্দ যদি করতেই হয়, চুলোয় গিয়ে না করে তারই বাড়িতে কেন? সবাই চুপ করে শোনে—অভ্যাস আছে তাদের।

বুড়োদের দুঃখ হলো এই ভেবে যে তারা বেঁচে থাকতে হয়তো পাকা রাস্তা দেখে যেতে পারবে না। একটা পাকা বাড়ি তুলতেই কত সময় লাগে, আর এই আট দশ ক্রোশ পথ হতে হতে তো তারা মরে ভূত হয়ে যাবে। পায়ে হেঁটেই চিরকালটা গেল, মোটর চড়া ভাগ্যে হলো না।

ক্যাম্পের লোকেরা বুড়োদের অভয় দিয়ে বলল যে তারা মোটরে চড়ার পরই মরবে। রাস্তা ছুটে আসছে! আট দশ ক্রোশের মধ্যে আড়াই ক্রোশ তো একমাসেই শেষ হয়েছে। কতলোক খাটছে। দু-তিন মাসেই এই গ্রামে পৌঁছে যাবে রাস্তা। শুনে বুড়োরা বিস্মিত হয়।

প্রাণকেষ্ট শুধু ভাবল, যেটুকু অবশিষ্ট ছিল এবারে তাও ধ্বসবে। সহরের সংগে যদি অত মেলামেশা হয়, তাহলে পণ্ডিত যা বলেছিল, তা ফলতে বিশবছর কেন, বিশদিনও লাগবে না। যা হয় হোক, রসাতলে যাক সব। তার কি? সে আর কদিন?

অঘোরপাড়ার হাটে খবরটা শুনে হরেকেষ্ট চমকে উঠল। শ্বশুরের গ্রামের লোকই দুঃসংবাদটা দিল। সত্যি বলে জেনেও যেন বিশ্বাস করতে পারল না সে। এ কখনো হতে পারে?

এত তাড়াতাড়ি ?

উমার মুখ তার সামনে ভেসে ওঠে। সে মুখ এখন অশ্রুসজল থমথমে। কিংবা এর মধ্যে হয়তো সামলে নিয়েছে উমা। এখন শুধু একটা বিষাদের ছায়া ম্লান করে রেখেছে তার মুখখানাকে। এমনিতে যা বলুক না কেন, ট্যানা ঘোষ তার স্বামী তো। স্বামীর ওপর কোন মেয়ের না টান থাকে।

হরেকেষ্টর ভাবতে অদ্ভুত লাগল যে যতদিন বিছানায় শুয়ে থাকল ট্যানা ঘোষ ততদিন মরল না। বিছানা ছেড়ে উঠে, যেই একটু সবল হলো অমনি মরল। লাঠিতে ভর দিয়ে সেদিনই প্রথম হাঁটতে হাঁটতে একটু দূরে গিয়েছিল। কতদিন জমিজমা দেখতে পারেনি নিজে। অন্যের ওপর ভার দিয়ে রেখেছিল। সেদিন নিজে তাই দেখতে গিয়েছিল ক্ষেতের ফসলের অবস্থা।

এ বছরে সেদিনই প্রথম চৌতুয়ারের আকাশে ঘন কালো মেঘের ঘটা দেখা গিয়েছিল। মেঘের দিকে চেয়ে যখন ট্যানা ঘোষের মুখে হাসি ফুটেছিল, ঠিক সেই সময়ই হয়তো বাজ পড়েছিল তার ওপর। সারা দেহ ঝলসে গিয়ে চিনবার উপায় ছিল না।

চৌতুয়ারে সেদিন বৃষ্টি পড়েছিল সামান্য অথচ বাজ পড়েছিল অজস্র। সেই মেঘ যখন আরও উজিয়ে হংসপুরের আকাশে এলো তখন ইন্দ্রদেবের অস্ত্র সব ফুরিয়ে গিয়েছে—মেঘের গাঢ়ত্বও তত ছিল না।

বজ্রের জন্মকথা পড়েছে হরেকেষ্ট। দধীচির অস্থিতে তৈরী বজ্র দিয়ে অসুর বধ হয়েছিল এককালে। দধীচি মুনির অস্থির প্রতিটি অনু দিয়েই বোধ হয় অসংখ্য বজ্র তৈরী করেছিলেন বিশ্বকর্মা।

নইলে অসুর বধ তো কবেকার কথা, এখনো এ-সবের উৎপাত কেন? এতদিন পরে ট্যানা ঘোষও কেন সেই বজ্রাঘাতেই মরল? সেকালে কি সে অসুর ছিল? হ'তে পারে। সেকালের অসুররাই বোধ হয় একালে তালগাছ, নারকেলগাছ, সুপুরীগাছ আর ট্যানাঘোষ হ'য়ে জন্মায়। তাই এদের উপর ইন্দ্রের ঝোঁক।

এ সমস্ত কাহিনীর অনেক কিছুই হরেকেষ্ট ঠিক বিশ্বাস করতে পারে না—আবার অবিশ্বাসও করতে বাধে। সে ধর্ম মানে। কিন্তু সাক্ষী উমা আর উমার মা যে ভাবে মানে সেই ভাবে মানতে যেন মন সায় না।

উমাই একদিন তাকে চমকে দিয়ে বলেছিল "তুমি ধর্মো মানো না জামাই।"—হয় তো কথাটা একেবারে মিথ্যে নয়। সেই উমাই বিধবা হ'লো।

ট্যানাঘোষ মারা যাওয়াতে তার বিশেষ দুঃগ হয় নি। তবু উমার কথা তাকে ভাবিয়ে তুলল। তার জন্যে হরেকেষ্টর কষ্ট হ'লো, আর সেইজন্যেই ট্যানা ঘোষের মৃত্যু সংবাদ নিজের কানে শুনেও সে বিশ্বাস করতে চাইল না। ট্যানা ঘোষের সংগে যে উমার ভাগ্য জড়িত। সে মরলে উমার সিথির সিঁদুর মুছে যায় —তাকে রঙীন সাড়ী পরা ছাড়তে হয়। তার হাতে আর চুড়ির মিষ্টি আওয়াজ পাওয়া যাবে না। সব চাইতে বড় কথা, সে যদি আর বিয়ে না করে তাহ'লে সন্তানের জননী হ'তে পারবে না কখনো।

উমা কি আবার বিয়ে করবে? হরেকেষ্টর বুকের ভেতরটা মোচর দিয়ে ওঠে।—খুদি এতদিনে কতদূর লেখা পড়া শিখল

কে জানে। তাকে এবার নিয়ে আসতে হবে।

হাট থেকে হরেকেষ্ট বাড়ি ফিরছিল। কালই তাকে যেতে হবে শ্বশুরবাড়ি। এত বড় বিপদে একবার যেতেই হয়। সে মরলেও ট্যানাঘোষ আসত। বিপদের সময়ই তো আত্মীয়েরা সান্ত্বনা চায়। তাছাড়া খুদিকেও গিয়ে নিয়ে আসতে হবে। উমার এখন মন খারাপ, খুদিকে পড়ানো তার পক্ষে সম্ভব নয়। বাড়ি নিয়ে এলে লক্ষ্মী তবু অবসর মত দেখতে পারবে।

নীলুর বাড়ির পাশ দিয়ে আসার সময় নীলুর মা ডাকে। হরেকেষ্ট দাঁড়ায়।

—"খপর সব ভাল রে হরে?"

হরেকেষ্ট ট্যানা ঘোষের মৃত্যু সংবাদ দেয়।

—"আহাহা এত শিগ্‌গির মিয়েডার সব্বোনাশ হ'লো।"

"সর্বনাশ কি আর দেখেশুনে হয়।"

—"বুঝি রে বাবা। কিন্তক শুনলি যে বুকের ভিতরডা ছ্যাৎ ক'রে ওঠে। কপালের নেখন। তোর সাথে বিয়ে হবি, তা না, কি হতি কি হলো।"

—"এখন আর ওসব বলে কি লাভ।" হরেকেষ্ট থামিয়ে দিতে চায় ফেলীকে।

—"সে ঠিক কথা।"

—"যাই, কাজ আছে।"

—"তোর বাপ ভাল আছে রে—"

—"এক রকমই আছে। কদিন থেকে খুব মনমরা দেখি। কি যেন হ'য়েছে।"

ফেলী বোঝে প্রাণকেষ্ট কেন মন-মরা। বড় বেশী আঘাত

দেওয়া হ'য়েছে সেদিন। গিয়ে ক্ষমা চেয়ে এলে মনটা শান্তি পেতো। সে বলে—"বিয়ের দিনডা" কবে ঠিক করল তোর বাবা? সেই তো সব। আমার আর কে আছে?"

—"বাবা আর বিয়ের কথা কিছু বলে না।"

—"বলবি—শরীলডা খারাপ তো তাই। একবার তাকে আসতি বলিস।"

—"আচ্ছা বলব। নীলুকে একটু পাঠিয়ে দিও কাকী। কাল শ্বশুরবাড়ি যাবো। দু-তিনদিন দেরী হবে। নীলু যেন চালিয়ে দেয়।"

—"তা দেবো। এখন না গেলি, আর কবে যাবি। এই তো সময়। বউডারে আনবি নাকি?"

—"হ্যাঁ, আনব।"

হরেকেষ্ট তাড়াতাড়ি বাড়ি চলে যায়। বাড়িতে ট্যানা ঘোষের খবর দিতে হবে। কেউ শোনেনি এখনো। শ্বশুরবাড়ি যাবার কথাও বলতে হবে। মাস শেষ হলো, দুধের হিসেবগুলো ঠিক করে রাখলে এই দুদিনে নীলু আদায় করতে পারবে। কালকে আর সময় হবে না। রোদের যা তেজ, ভোরে উঠে রওনা দিতে হবে।

এবারেও উমাই দাঁড়িয়েছিল, তবে এবারে আর ঘুঁটে দিচ্ছিল না সে। সামনের দিকে চেয়ে কি যেন ভাবছিল। এখন কি আর ভাবার অন্ত আছে! হরেকেষ্ট একেবারে কাছে এলেও সে দেখতে পেল না। হরেকেষ্ট ভাবে, কি বলে কথা আরম্ভ করবে

সদ্য বিধবার সংগে। আগেরবারের মত সহজ কিছুতেই সে হতে পারবে না। উমার পাশে খুদি থাকলে বেশ হ'তো, কথাটা খুদিকে অবলম্বন ক'রে সুরু করা যেত। সে দেখল, উমার পরনে শাড়িই রয়েছে, তবে হাতে চুড়ির বাহুল্য নেই, শুকনো চুল হাওয়ায় উড়ছে। মুখখানাকে যথাসম্ভব গম্ভীর ক'রে হরেকেষ্ট সামনে এসে দাঁড়ালে উমার প্রথম নজর পড়ে তার উপর।

সে হেসে বলে—"এই দেখো, তোমার জন্যেই দাঁড়িয়ে আছি, আর তোমাকেই দেখতে পেলাম না। আনমনা হ'য়েছিলাম।"

তাকে হাসতে দেখে হরেকেষ্ট একটু আশ্চর্য হলো, তারপর ভাবল, হয়তো বিষণ্ণতাকে ঢেকে রাখার জন্যেই জোর করে হাসল। সে বুদ্ধিমতী, গম্ভীর হ'য়ে থেকে বাড়ির জামাইকে অস্বস্তিকর অবস্থায় ফেলল না।

—"জামাই যে চুপচাপ?" কথা বললে না। সে আবার হাসে।

—"তুমি জানতে আমি আসব?"

—"ওমা, তা জানবো না কেন। সেজন্যেই যে দাঁড়িয়েছিলাম।"

—"আমি তো কাউকে বলিনি।"

—"না বললে কি জানা যায় না।"

—"কি করে?"

উমা বুকের ওপর ডান হাত রেখে বলে—"মন থেকে।"

অন্য সময় হ'লে তার কথার একটা অর্থ আবিষ্কার করতে পারত হরেকেষ্ট এবং আবিস্কার ক'রে আনন্দই পেতো সে। কিন্তু এই অবস্থায় কথাটা শুনে তার মাথা গুলিয়ে গেল। সে কি

বলবে বুঝে উঠতে পারল না। ছেলে আর স্বামীর আঘাত পর পর পেয়ে মাথা ঠিক আছে তো মেয়েটার? আহা, না থাকলে সত্যিই বড় দুঃখের। সে নিবিষ্টভাবে উমার হাবভাব লক্ষ্য করে।

—"জামাই, ভাবছো আমার মাথা খারাপ হয়েছে। হয়নি গো। আমি ভাবছি আর এক কথা—সে কথা তোমারই। তুমি আমাকে ভাবিয়ে তুলেছো জামাই।"

—"কি কথা?" হরেকেষ্ট প্রশ্ন করে।

—"ভাবছি, এত তাড়াতাড়ি সে যে মারা গেল, আমি যদি এখন না মরি তাহলে বুড়ো বরই যে আবার কপালে জুটবে। এতদিনে ও আবার জন্মাতে চলেছে যে—"

—"আমি কিছু ভেবে বলিনি সেকথা, তোমার সংগে ঠাট্টা করেছিলাম। এরজন্যে অত ভাবনা কিসের। তুমি তো জানই ওসবে আমার বিশ্বাস নেই।"

—"সে জানি, কিন্তু কথাটা খারাপ বলেছিলে জামাই। তোমরা তো বলেই খালাস, কিন্তু আমরা যে ভয়ে মরি। মেয়ে মানুষের মন তো, ওসবে বড় বিশ্বাস। পরের জন্মেও যদি আবার বুড়োর হাতে পরি, তাহলে গলায় দড়ি দেবো।"

—"পরের জন্মের কথা, পরের জন্মে ভেবো। এ জন্মের কথা ভাবো এখন।"

—"সেকথা ভেবে কুল পাইনে, তাইতো ভাবছি।"

শুনে হরেকেষ্টের বড় দুঃখ হয়। মেয়েমানুষের পক্ষে কুল পাওয়া সম্ভবও নয় এসব ক্ষেত্রে। সে বলে—ঘোষ মশায় তো বুড়োই ছিল, তুমি কি গলায় দড়ি দিয়েছিলে তার জন্যে। তাকে ভালই বাসতে।"

—"ছাই ভালবাসতাম।"

উমার 'ছাই' কথাটা হরেকেষ্টর মুখেও যেন ছাই লেপে দিল। সে এতক্ষণে বোঝে উমার হাসি লোক দেখানো হাসি নয়, সেটা স্বতঃস্ফূর্ত। ট্যানা ঘোষের মৃত্যুতে তার দুঃখ হয়নি, সে বরং নিষ্কৃতি পেয়েছে। যদি তা সত্যি হয়, তাহলে নিজের পছন্দমত অল্পবয়স্ক কোন যুবককে বিয়ে ক'রে সে সুখী হতে পারে। এ গ্রামেই হয়তো সেরকম ছেলে রয়েছে।

হরেকেষ্ট সে সম্বন্ধে ইংগিত করবে ভেবে বলে—"তোমার মায়ের মুখে একটা কথা শুনেছিলাম।"

—"কি কথা—"উমা উজ্জল দৃষ্টিতে হরেকেষ্টের দিকে চেয়ে থাকে।

—"বুড়ো বরের ঘর দুদিনের জন্যে মেয়েরা কেন করে সে কথা শোননি।"

—"শুনেছি।"

—"তবে? আগের জন্মের পাপের প্রায়শ্চিত্ত হ'লো। এবারে চিরজন্মের বরকে খুঁজে নাও।"

—"সে যে হাতছাড়া জামাই।" উমা খিলখিল করে হেসে ওঠে।

—"কোথায় সে?"—হরেকেষ্ট বিস্মিত হয়।

—"আগের জন্মে আমার এক সতীন ছিল, এজন্মে সে আমার বোন হ'য়ে জন্মেছে।" সে কথাটা শেষ করে তাড়াতাড়ি বাড়ির ভেতরে ছুটে যায়।

হরেকেষ্ট যেখানে দাঁড়িয়ে ছিল সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে—এক পা অগ্রসর হ'তে পারে না। মনে হ'লো তার পা দুটো

মাটির নীচে শিকড় ছড়িয়ে দিয়েছে। এক অনাস্বাদিত আনন্দ তার মনকে উতলা করে তোলে, কিন্তু তা মুহূর্তের জন্যে। সে দেখল তার আনন্দ একমুখী হয়ে ধাক্কা খাচ্ছে সাত বছরের এক নিরপরাধ সরল বালিকার সংগে। ধাক্কা খেয়ে খান্ খান্ হয়ে ভেঙে যাচ্ছে সব আনন্দ—অবশিষ্ট কিছুই থাকছে না।

কিন্তু এ কী ভাবছে সে! যে শিশুর জীবন সামান্য যত্নের অভাবে নষ্ট হ'য়ে যেতে পারে, মনের এই জ্বালা তাকে যে এক মুহূর্তে পুড়িয়ে ছাই ক'রে ফেলবে? সেও কি নন্দর মত অমানুষ হ'য়ে উঠল? তার মনের মধ্যে সে এক আদিম বন্য প্রবৃত্তি অনুভব করল যা অপর এক প্রবৃত্তির চরিতার্থের জন্যে নির্বিচারে একটার পর একটা হত্যা করে যেতে পারে। এ প্রবৃত্তি দমন করতে হবে। নইলে উপায় নেই।

হরেকেষ্ট নিজের মাথাটাকে খুব জোরে ঝাঁকায়—অনেকক্ষণ ধরে। চৈত্র সংক্রান্তির সন্ন্যাসীদের মত ঝাঁকায়। তারপর ভাবতে চেষ্টা করে সে হংসপুরের হরেকেষ্ট। সে লক্ষ্মীর ভাই—যে লক্ষ্মী তাকে কত শ্রদ্ধা করে। সে খুদির স্বামী—যে খুদির কপালে সে কালীবাড়ির সিঁদুর লাগিয়েছে কিছুদিন আগে। উমা তার কে? কেউ না। সে হ'তে পারে কেউ—খুদির সতীন হতে পারে। কিন্তু তাতে যে খুদির সর্বনাশ হবে। না, না—উমা তার কেউ না। সে ট্যানা ঘোষের স্ত্রী—সে এক মৃত সন্তানের জননী। বৃদ্ধ ট্যানা ঘোষের সন্তান সে গর্ভে ধারণ করেছিল।

বাড়ির ভেতর ঢুকতে খুদি ছুটে আসে। দিদির মুখে হরেকেষ্টর কথা শুনেছে সে। ছুটে এসেই তার হঠাৎ খেয়াল হয়

যে ঘোমটা দেওয়া হয়নি। সে তাড়াতাড়ি ঘোমটা দিতে যায়, কিন্তু পারে না। যে কাপড়খানা তার পরনে ছিল সেটা শুধু কোমড়েই জড়ানো চলে—তাতে ঘোমটা দেওয়া যায় না। সে অপ্রস্তুত হ'য়ে পালাতে চেষ্টা করে কিন্তু হরেকেষ্ট হেসে তার হাত ধরে ফেলে।

—"পালাচ্ছিস কেন ?"

—"ঘোমটা নেই"—খুদি অসহায় ভাবে তাকায়।

হরেকেষ্ট নিজের জামার ওপর দিয়ে কোমরে বাঁধা লাল গামছাখানা খুলে খুদির মাথায় দিয়ে বলে—"নে, হ'য়েছে তো—"

সে হেসে ঘাড় নেড়ে বলে—"আমি লাল গামছা নেবো।"

—"আচ্ছা কিনে দেবো।"—হরেকেষ্টর কথায় খুদির মুখ খুসীতে উজ্জল হ'য়ে ওঠে।

খুদির হাতের বইএর দিকে এতক্ষণে হরেকেষ্টর চোখ পড়ে, বলে—"ওটা কি—"

—"বর্ণবোধ।"

—"পড়ছিস তো ?"

—"হ্যাঁ—কর, জল, অচল সব পড়েছি। দিদি বলেছে জল পড়ে পাতা নড়ে পড়া হ'লে নতুন বই দেবে।"

—"সত্যি ?"—হরেকেষ্ট তাকে উৎসাহ দেয়। সে অবাক হয়, এই দেড় মাসে সংসারের ঝড় ঝাপটার মধ্যেও উমা তাকে এতদূর পড়িয়েছে। খুদি নিঃসংশয়ে বুদ্ধিমতী, নইলে এত তাড়াতাড়ি শিখতে পারত না।

খুদির সংগে কথা বলতে বলতে হঠাৎ হরেকেষ্টর খেয়াল হয়

যে যেজন্যে সে এখানে এসেছে তা একেবারে ভুলে গিয়েছে। সে এসেছে, উমার বিপদে দুটো সান্ত্বনার কথা বলতে—শ্বশুর শ্বাশুড়ীর পাশে দু'দণ্ড গম্ভীর হ'য়ে বসে থাকতে। কিন্তু উমার সংগে সাক্ষাতের পরে সবকিছু ওলট-পালট হ'য়ে গিয়েছে। তার আনন্দের সময় সে সান্ত্বনার কথা বলবে কি? নদীর ঘাটে শাঁখা ভেঙে সে মুক্তিস্নান করে এসেছে যে।

তবু হরেকেষ্ট রান্নাঘরের সামনে গিয়ে দাঁড়ায়। ঘরের ভেতরে উমা তার মায়ের সামনে চুপ করে দাঁড়িয়ে রয়েছে। হরেকেষ্টর আগমন সংবাদ মাকে জানিয়ে মায়ের ওপর তার প্রতিক্রিয়া লক্ষ্য করছে। শাশুড়ীর চাপা কান্নার আওয়াজ বাইরে থেকে কানে এলো। তার জন্যে হরেকেষ্টর কষ্টও হলো। শাশুড়ীর শোক কৃত্রিম নয় তা তো সে জানে। কিন্তু সেই সংগে কৌতুক বোধ করল এই ভেবে যে, যে মেয়ের জন্যে তার এই শোক সে মেয়ে তার অবস্থা দেখে নিশ্চয় মনে মনে হাসছে। অথচ মায়ের কান্না দেখে মুখের চেহারা বদলে ফেলা ছাড়া গত্যন্তর নেই। তাই কান্নার দিকে চেয়ে চেয়ে চোখে একটু জল আনার চেষ্টা করছে। হরেকেষ্ট জানে, মেয়েরা তা পারে। অন্য মেয়েমানুষের কান্না দেখে একটু ভাবলেই তারা চোখে জল এনে ফেলতে পারে। সেরকম তারা কত কাঁদে। পরের বাড়ির মেয়ে প্রথম শ্বশুরবাড়ি গেলে ঐভাবে দল বেঁধে গিয়ে কেঁদে আসে। অনাত্মীয় মরলেও তেমনিভাবে কাঁদে।

জামাইকে দেখতে পেয়ে হরেকেষ্টর শাশুড়ী উঠে এসে হাউ হাউ করতে করতে তার সামনে বসে পড়ে।

হরেকেষ্ট ভাল কথাই বলে—সবাই যা বলে—"কি করবেন

বলেন। কাঁদলে তো আর ফিরবে না। সহ্য করতে হবে।”

—“কি কপাল উমার—হা ভগবান।”

—“একি এক জন্মের ফল মা, কত জন্মের পাপ আমাদের ঘাড়ে।”

—“কিন্তুক সারা জীবনডা কেডা দেখবি ওকে। ছাওয়াল প্যাটে না ধরলিও কথা ছিল।”

—“ভগবানই সব করবেন। আমরা ভেবে কি করতে পারি।”—হরেকেষ্টর চোখ হঠাৎ উমার ওপর গিয়ে পড়ে। সে ভেবেছিল উমা হয়তো গম্ভীর হয়ে অন্যদিকে চেয়ে রয়েছে। কিন্তু তা তো নয়! সোজা হরেকেষ্টর মুখের দিকে তার দৃষ্টি। চোখাচোখি হ'তেই সে ফিক্ করে হেসে মুখ নীচু করে।

উমার হাসি দেখে হরেকেষ্টর সব রাগ গিয়ে পড়ে শাশুড়ীর ওপর। তার মনে হয়, এরা মানুষ নয়—গরু-ভেড়ার মত। মেয়ে বিধবা হলে কাঁদতে হয় কাঁদছে। মন বলে কিছু নেই এদের। তাই নিজের গর্ভের মেয়ে সব সময় কাছে থাকা সত্ত্বেও তার মনের কথা এরা টের পায় না। কিন্তু এই উমাকে এখন যদি কারও সাথে মিশতে দেখে, আর সেই মেশায় যদি আবিলতা নাও থাকে তবু চিৎকার করে উঠবে—। বিধবাদের যে কারও সাথে মিশতে নেই। অথচ কারও সাথে না মিশেও মনটা যদি অনাচারে ভরে যায় তাতে ক্ষতি নেই।

সে ভাবে কালই হংসপুরে চলে যাবে। এখানে থেকে লাভ নেই বরং ক্ষতি আছে। হ্যাঁ, ভীষণ ক্ষতি, সে ক্ষতির হয়তো কোনদিন পূরণ হবে না। তার চেয়ে চলে যাওয়াই ভাল। খুদিকে নিয়ে চলে যাবে। কিন্তু আজ এসেই কথাটা বলা উচিত হবে না

ভেবে সে চুপ করে থাকে।

সন্ধ্যাবেলা বসে থাকতে থাকতে ঝিমুনি এসেছিল হরেকেষ্টর। কাজ না থাকলে ঘুম পায় তার—শ্বশুরবাড়িতে কোন কাজ নেই। খুদি ঘুমিয়ে পড়েছে সন্ধ্যা লাগতে। নইলে তার সংগে কিছুক্ষণ গল্প করা যেত। ওর সংগে বকবক্ করতে ভালোই লাগে। উমা আর তার মা রান্নাঘরে। জামাইয়ের জন্যে পরিপাটি ক'রে রান্না হচ্ছে বোধহয়। ইলিশমাছের গন্ধ নাকে আসে। শ্বশুরমশায় বাড়ি নেই। কোনবারই তাকে দেখতে পায় না হরেকেষ্ট। সে জানে, তাকে এড়িয়ে চলে তার শ্বশুরমশায়। তার আগমনবার্তা পেয়ে প্রতিবারই অন্য দরজা দিয়ে বাইরে চলে যায়।

ঝিমোতে ঝিমোতে একসময় দেওয়ালে ঠেস দিয়ে সত্যিই ঘুমিয়ে পড়ে সে। হঠাৎ কার স্পর্শে ঘুম ভেঙে যায়।

—"কে?"—দেখে সামনে উমা দাঁড়িয়ে।

—"ভয় পেলে নাকি জামাই? ডেকে তো সাড়া পাওয়া যায় না।"

হরেকেষ্ট লজ্জিত হয়। বসে ঘুমোলেও ঘুমটা বেশ গাঢ় হ'য়েছিল। সে তাড়াতাড়ি সোজা হয়ে বসে বলে—"খেতে ডাকছো?"

উমা হেসে বলে—"না, অনেক দেরি আছে। মা, জামাইয়ের দাম বুঝেছে—"

—"ছিঃ কি যে বল।"

—"ঠিকই বলি! তোমার অত লজ্জা কেন?"

হরেকেষ্ট চুপ করে থাকে।

—"জামাই, তুমি আমাকে কি ভাবছ বল তো?"

—"কেন ?"

—"সকালের কথাটা বলার পর আমাকে খুব ঘেন্না করছ, তাই না ?"

—"না"—হরেকেষ্টর স্বর গম্ভীর।

—"না ?"—উমা দুঃখের হাসি হাসে—"তুমি অবাক করলে জামাই। অমন পরিস্কার শোনার পরও ঘেন্না করছ না ?"

হরেকেষ্ট কিছু বলে না। আসলে সে ভেবে পায় না, কি বলবে। উমাকে সে ঘৃণা না করলে ও ঠিক শ্রদ্ধা করতে পারছে না আগের মত।

—"জামাই, একটা কথা বলব ?"

—"কি কথা।"

—"তোমার সংগে আমার বিয়ে হ'তো, তাই না ?"

—"হ্যাঁ।"—হরেকেষ্টর স্বর যেন একটু কেঁপে যায়।

—"সব ঠিকই ছিল শুধু পয়সার লোভে বাবা আমাকে বুড়োর হাতে দিয়ে বসল সেই রাতে।"

—"হুঁ।"

—"আমি কিন্তু তোমাকেই আমার বর বলে জানতাম। জগবন্ধু পণ্ডিতের কাছে তোমার কত কথা শুনেছি বিয়ের আগে। শুধু তোমার কথাই ভাবতাম।"

—"সত্যি বলছ ?"—হরেকেষ্টর চোখ উজ্জ্বল হয়।

—"হ্যাঁ"—উমা একটু থেমে বলে, "জামাই, যার সংগে আমার বিয়ের ঠিক্ঠাক্, যার কথা আমি এত শুনেছি, তাকে যদি আগে থেকে মনে মনে স্বামী ক'রে নি—সেটা কি অন্যায় ?"

হরেকেষ্ট স্তব্ধ হয়ে যায়।

—"জামাই কি ভাবছো ?"

—"ভাবছি, তোমাকে কোনদিন ঘেন্না করতে পারব না।"

—"তবু ভাল। আমি ভাবলাম তুমি বুঝি আর কথাই বলবে না আমার সংগে।"

হরেকেষ্ট হাসে। বলে—"তুমি এত সুন্দর কথা বলা কোথায় শিখলে ?"

—"বই প'ড়ে।"

—"এখনো পড় ?"

—"হ্যাঁ। বই এর মত ক'রে নিজের কথা আপন মনে বলে বলে অভ্যাস করি।"

—"তোমার জন্যে দুঃখ হয়।"

—"কেন জামাই ?"

—"বুঝতে পারো না ? নিশ্চয় বোঝো।"

—"তার কি প্রতিকার নেই ?"—উমার গলায় আকুতি।

হরেকেষ্ট উমার হাত চেপে ধ'রে উত্তেজিত হয়ে বলে—"আছে, তুমি রাজী আছো ?"

—"ছিঃ, হাত ছাড়ো।" উমা শিউরে ওঠে।

—"না।"

—"ছাড়ো।"

হরেকেষ্ট হাত ছেড়ে দেয়। উমা চলে যেতে চায়।

—"যেও না, একটা কথা শোনো।"

—"না, তোমার মাথা খারাপ।"

—"মাথা খারাপ হলে অনেক আগে এমন হ'তো। শোনো।"

উমা একটু দূরে দাঁড়ায়।

হরেকেষ্ট বলে—"আমি জন্তু-জানোয়ার নই।"

—"আমার ভয় করে।"—উমা বলে।

—"সকালে তোমাকেও আমার ভয় করছিল। ভেবেছিলাম পালিয়ে যাবো।"

—"কেন?" উমা বিস্মিত হয়।

—"রাগ করোনা। তখন ভেবেছিলাম তোমার মন নেই। তুমি শুধু দেহটাকেই চেন।"

—"এখন মত পালটেছে?"—উমার স্বর বিষণ্ণ।

—"হ্যাঁ। কিন্তু এখন তুমি আবার আমাকে সেই রকম ভাবছ।"

উমা কোন কথা বলে না। চুপ করে দাঁড়িয়ে সে আঙুলে আঁচল জড়ায়।

হরেকেষ্ট বলে—"আমিও মানুষ উমা, জন্তু নই। আমার কাছে তোমার আসতে ভয় করছে তোমার দেহের জন্যে। কিন্তু তোমার দেহের ওপর আমার লোভ নেই। লোভ তোমার মনের ওপর। খুদি আমার মন বুঝবে না, আমার মন উপোস করছে। খুদি যখন বড় হবে, ওর মনের কথা কি আমি বুঝবো? আমি তখন যে ট্যানা ঘোষ।"—হরেকেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

উমা এক পাও নড়তে পারে না। সেখানেই দাঁড়িয়ে থাকে।

হরেকেষ্ট হঠাৎ উঠে তাকে জড়িয়ে ধরে বলে—"তোমাকে আমি বিয়ে করব উমা।"

—"জামাই—" উমা শরীরের সমস্ত রক্ত মুখে এসে জড়ো হয়। সে বুঝতে পারে আর এক মুহূর্ত দেরি করলে তার শরীরের আর মনের সমস্ত শক্তি লুপ্ত হবে। সে সজোরে

হরেকেষ্টর হাত কামড়ে দেয়। হরেকেষ্ট ছেড়ে দিতে সে কাঁদতে কাঁদতে ছুটে চলে যায়।

হরেকেষ্ট বোঝে, উমার দাঁত তার হাতে অনেকখানি বসে গিয়েছে। কিন্তু ঠিক যেন অনুভব করতে পারে না সে। শুধু মনে হয় কোথায় যেন মস্ত একটা ভুল হ'য়ে গেল—যে ভুলের জন্যে সে উমার কাছে অনেক ছোট হয়ে গেল। দেহের ব্যাপারে তাকে অভয় দিয়েও কেন জড়িয়ে ধরতে গেল? কেন প্রতারণা করল? অভয় না পেলে উমা তো দাঁড়িয়ে থাকত না। সে নিশ্চয় ভেবে বসে আছে যে হরেকেষ্ট ধাপ্পা দিয়ে তার সর্বনাশ করতে চেয়েছিল। কিন্তু মনেপ্রাণে সে তো জানে সেটা কত বড় মিথ্যে। অথচ এই মিথ্যাকে প্রমাণ করার মত কোন সূত্র সে রাখেনি। উমার মনের আস্থা সে হারিয়েছে। সকালে সে যে হরেকেষ্ট ছিল এখন আর সে হরেকেষ্ট নেই। সে পশু—অন্ততঃ একজনের কাছে প্রমাণ হয়েছে যে, সে পশু। নন্দ আর তার মধ্যে কোন প্রভেদ নেই। নন্দও অন্যায় করে আজ একমাস গা ঢাকা দিয়েছে, গ্রামের লোকের কাছে মুখ দেখাবার লজ্জায়। কিন্তু সে কি করবে? সেও কি চলে যাবে শ্বশুরবাড়ি ছেড়ে? কিন্তু খুদি রয়েছে যে? তবে কি সে আত্মহত্যা করবে? মাথার মধ্যে ঝড় বয়ে যায়। না, আত্মহত্যা সে করবে না। সে উমার কাছে ক্ষমা চাইবে। উমা ক্ষমা করুক আর না করুক সে এ গ্রামে আসবে না আর। কোনদিন না।

পরদিন হরেকেষ্ট রওনা হতে পারে না। শাশুড়ীর একান্ত অনুরোধ। বড় জামাইয়ের মৃত্যুর পর ছোট জামাইকে অত

সহজে ছাড়তে রাজী নয় সে। আরও একটু আদরযত্ন করবে। কিন্তু সে আদরে হরেকেষ্টর কি লাভ? তার যন্ত্রণাই বাড়বে শুধু। উমার চোখের সামনে অমন ছোট হয়ে উপস্থিত থাকতে সে এক নিদারুণ অস্বস্তি অনুভব করে। অথচ অন্য পথ নেই। তাছাড়া লক্ষ্মীরাও জানে যে সে এখানে কম ক'রে অন্ততঃ দুদিন থাকবে। হঠাৎ চলে গেলে তারাই বা কি ভাববে? তাই শাশুড়ীর কথায় হরেকেষ্ট সেদিনের মত থাকতে রাজী হ'লেও মনে মনে ঠিক করল পরদিন ভোরবেলাতেই সে খুদিকে নিয়ে চলে যাবে।

উমাকে বড় গম্ভীর দেখাচ্ছিল। হরেকেষ্ট অনেকবার তার দিকে চেয়ে রয়েছে, কিন্তু উমা তাকায় নি। একসময় নিরিবিলিতে তাকে দেখে, আগের দিনের ভুলের জন্য তার কাছে ক্ষমা চাইলে। উমা কোন কথা না বলে তাড়াতাড়ি চলে যায়।

মাটির সঙ্গে মিশে যেতে ইচ্ছে হয় হরেকেষ্টর। খুদির সংগে কথা বলতেও প্রবৃত্তি হয় না। বসে থাকতে থাকতে দম বন্ধ হ'য়ে যাবার উপক্রম হ'লো। ছট্‌ফট্ করতে করতে সে একসময় বাড়ির বাইরে চলে আসে। রাস্তায় এসে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল সে।

দেশ ভাগ হবার পর সে বর্ডার দেখেনি। মৈজুদ্দিনের বাড়ি গেলে সেই আশা পূরণ হয়। সে হাঁটতে হাঁটতে সেদিকে চলে।

পথে একজন জিজ্ঞাসা করে—"কোন্ গাঁয়ের লোক গো তুমি?"

—"হংসপুর।"

—"ঘোষ ?"

—"হ্যাঁ।"

—"কোনে যাও ?"

—"বর্ডার দেখতে।"

—"যায়ো না।"

—"কেন ?"

—"উসব বডার-ফডারে কম যাওয়া ভাল।"

—"তোমরা যাও না ?"

—"যাবো না ক্যান্, না পারতি যাই। সখ ক'রে যাই না।"

—"কেন। গোলমাল আছে নাকি ?"—হরেকেষ্ট উদগ্রীব হয়।

—"হতি কতক্ষণ ? বল্‌তি পারে না কেউ। কালই তো হ'লো।"

—"কি হলো।"

—"অবনী মণ্ডলকে চেন ? ওই যে গো। যার জমির মধ্যে দিয়ে লাইন গিয়েছে।"

—"চিনি।"

—"তার জনি্য হ'লো গোলমালডা। মণ্ডল ভায়ের সব জমি তো উপ্পারে। আমন ধান যখন উঠিছিল, ওদের পুলিশ তার ধান ইদিকে আনতি দেয় নি। সে না দিল,—তাদের রাজ্যের ধান তাদের থাক। মণ্ডল ভাই কিছু মনে করেনি সেজনি্য। কিন্তু গোলমালডা এক-ধামা ধানের জনি্য।"

—"এক-ধামা ধান ?"

—"হ্যাঁ, গো, বলতেছি কি তাহলি। জমির ধান উঠল,

লবান্ন করবি না? ওদের সরকার সব ধান তো ছয় ট্যাকা দরে নিল। একধামা ধান লবান্নের জন্যও আনতি দিবি না?"

—"দেয় নি আনতে?"

—"নাগো, তাদের পুলিশ ঠেকায় দিল! কাণ্ডটা দেখ। মণ্ডল ভাই ছয় ট্যাকা দরে কিনে নিবি বলল, তাও দিল না।"

—"দিল না?"—হরেকেষ্ট স্তম্ভিত হয়। বিশ টাকা মণ ধান ছয় টাকা দরে কিনে নিয়েও সামান্য একধামা ধান পয়সার বিনিময়েও ছাড়ল না? জমি তো মণ্ডলেরই, কত পুরুষ ধরে চাষ করেছে কে জানে।

—"দিল না।" লোকটার স্বরে অশেষ সহানুভূতি।

—"খুব অন্যায়।"

—"সেজন্যি তো কালকের গোলমালডা হ'লো। ক্ষেপেই ছিল মণ্ডল, কাল সেই পুলিশদের একজনকে বাগে পেয়ে খুব দিয়েছে।"

—"মেরেছে পুলিশকে?"

—"হ্যাঁ।"

—"এটা ঠিক হয়নি।"

—"অন্যাজ্জোও হয়নি। আমার তোমার হলি আমরাও অমন করতাম।"

হরেকেষ্ট মনে মনে সেকথা স্বীকার করে। সত্যিই অন্যায় করেনি মণ্ডল বরং ভাবলে মনে হয় ঠিকই করেছে।

সে বলে—"এবারে মণ্ডল ভাই যে ছয় টাকা দরও পাবে না, আউষ ধান তো ক'মাস পরে উঠবে।"

লোকটা হেঁ হেঁ ক'রে হেসে বলে—"মণ্ডল ভাইকে বোকা

ভাব নাকি? ঐপারের ফকির শেখের সাথে জমি বদল করেছে না? ফকির শেখের জমি ইধারে ছিল যে।"

—"তাই নাকি? তবে ভালই করেছে। কিন্তু যে মার খেলো সে কি ছাড়বে? তাও আবার ওধারের পুলিশ।"

—"ভয়ডা তো সেইখানডায়। তাই তোমাকে জাতি মানা করনু। কখন কি হয়, কেডা বলতি পারে।"

—"আমি না গেলেও, অন্য লোক তো যাবে? যাদের বাড়ি বর্ডারে?"

—"তারা তো যাবেই।"

—"কাজডা ভাল হয়নি।"

—"আরে ও-কথা ছাড়ান দাও। তখন কি মাথার ঠিক ছিল?"

হরেকেষ্ট চিন্তিত হয়। বুঝতে পারে, এই জাতীয় ঘটনা থেকেই বর্ডারের গোলমাল। এসব ঘটনা সব সময় এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয় বলে অহরহ ঘটছে। আজ অবনী মণ্ডল ওদের পুলিশকে পিটিয়েছে, কাল ওদের পুলিশ এদের গরু নিয়ে যাবে। পরশু হয়তো ওদের কয়জনে এসে রাতের অন্ধকারে এদের ধান কেটে নিয়ে পালাবে। এমন ঘটনা কত ঘটবে—গুলি তো চলবেই। দেশের শান্তি গেল একেবারে।

লোকটা বলে—"হ্যাঁ গো, একটা কথা শুনমু—সত্যি?"

—"কি কথা?"

—"রাস্তা আসবি নাকি শহর থেকেন—একেবারে পাকা রাস্তা?"

—"হ্যাঁ।"

—"খুব ভাল হবি।"

—"ভাল তো হবেই। পাকা রাস্তা হ'লে গোলমাল কমে যাবে। দেখতে দেখতে শহর থেকে পুলিশ চলে আসবে।"

—"তোমাদের হংসপুরের মধ্যিখান দিয়ে নাকি ইদিক পানে চলে আসবি?"

—"তাই তো শুনি।"

—"মটোর গাড়ী চলবি?"

—"হ্যাঁ।"

—"খুব ভাল হবি, খু-ব ভাল হবি—" লোকটা চলে যায়।

সন্ধ্যা হ'তে হরেকেষ্ট শ্বশুরবাড়ি ফিরে আসে। খুদি তখনো জেগে বসে আছে। সে হরেকেষ্টর কাছে এসে বলে—"আমি যাবো না।"

—"কোথায়?" হরেকেষ্ট বুঝতে পারে না।

—"ওখেনে।"

—"হংসপুরে?"

—"হ্যাঁ।"

—"আর কত থাকবি? অনেক দিন তো হ'য়ে গেল।"

—"ওখেনে যে পড়তে পারব না।"

—"কেন, লক্ষ্মী পড়াবে?"

—"ও পড়াতে জানে না।"

তার কথা শুনে হরেকেষ্টর রাগ হয়। নিজের বোন সম্বন্ধে যে-কোন কথাই তার গায়ে লাগে। সে এটা বুঝল, এটা খুদির নিজের কথা নয়, শেখানো। বলে—"কে বলল তোকে?"

—"দিদি।"

—"দিদিকে বল, লক্ষ্মী শুধু বাংলা নয়, ইংরিজিও জানে। তোর দিদি তো শুধু বাংলা জানে।" গায়ের জ্বালা কমাতে সে কথাটা বলে। নিজেকে বড্ড বেশী উঁচু মনে করে উমা, অতটা ভাল নয়। ক্ষমা চাইলেও যে মেয়ে ক্ষমা করতে জানে না সে আবার কি লেখাপড়া শিখল ?

তার গম্ভীর কথা শুনে খুদি ভয় পেয়ে যায়। সে চুপ করে থাকে। হরেকেষ্ট বোঝে, খুদির কোন দোষ নেই। তাকে যা শেখান হয়েছে সে তাই বলেছে। কিন্তু উমার এ কি কাণ্ড ! এই বয়সেই কচি মনটা ওভাবে বিষিয়ে দিচ্ছে কেন ?

খুদিকে এবারে নিয়ে যেতেই হবে। এবার নিয়ে গিয়ে আর আসতে দেবে না কখনো। তার বুদ্ধি আর একটু পাকলে উমার আরও সুবিধা হবে মন ভেঙে দেবার।

—"কি রে, বসে আছিস কেন ?"

—"আমি যাবো না "

—"কেন ?"

—"কষ্ট হয় যে—"

—"আমার জন্যে তোর কষ্ট হয় না ?"

—"না।"

কথা বন্ধ হয়ে যায় হরেকেষ্টর। বহুক্ষণ চেষ্টার পর সে বলে —"আমার জন্যে তোর কোনদিনই কষ্ট হবে না রে। আমার আর ট্যানা ঘোষের একই দশা।"

খুদি নিঃশব্দে ফ্যাল্‌ফ্যাল্‌ ক'রে চেয়ে থাকে। সে শুধু অনুভব করে যে হরেকেষ্ট এক গভীর বেদনা নিয়ে কথা বলছে। সে বলে—"দিদিকে ডাকবো ?"

—"কেন ?"

—"দিদি এলে তুমি হাসবে।"—খুদি জানে তার দিদির সংগে হরেকেষ্ট খুব হেসে কথা বলে।

তার কথা শুনে হরেকেষ্ট চমকে ওঠে। সে তাকে দু'হাত দিয়ে ধ'রে বলে—"তোর কাছে হাসি না বুঝি—"

—"হাসো।"

—"তবে দিদিকে ডাকবি কেন ?"

—"দিদি এলে বেশী হাসবে।"

—"ও"—হরেকেষ্ট হাসে একটু। খুদির দিকে চেয়ে থাকে একভাবে। সরল শিশুমন। সরল বলেই সত্যের দিকে তার স্বাভাবিক গতি। সরলতা সত্যকে খুঁজে বার করে না—সত্য আপনিই এসে ধরা দেয়। সে বলে—"তোর দিদি এলে আর হাসব না।"

—"না হাসলে, আমি যাবো না। আমি দিদির কাছে পড়ব।"

—"বেশ, তাই পড়িস তবে।"—কেটে কেটে কথাগুলো বলল হরেকেষ্ট; মনে মনে সে ঠিক করে এবারও সে খুদিকে নেবে না। কখনো আর নিতেও আসবে না। যদি এরা পাঠায় পাঠাক—না পাঠালেও ক্ষতি নেই।

রাতে খাবার পরে হরেকেষ্ট দাওয়ার ওপরই শুয়ে পড়ে। ভোর হবার আগে কেউ না উঠতে রওনা হয়ে যাওয়াই ভাল। সকলের চোখের সামনে সে এ বাড়ি ছাড়বে না। শাশুড়ীর ওপর বিতৃষ্ণা না থাকলেও তার স্নেহেও কোন আকর্ষণ নেই। মনের খবর সে রাখে না। চিরকাল শাশুড়ীরা যা ক'রে থাকে ঠাটটুকু শুধু বজায় রাখে। এর বেশী সে জানে না, ভাবে এতেই বুঝি স্নেহ

করা হলো জামাইকে। এক জামাই মরেছে তাই আর এক জামাইকে দু'দিন কাছে রেখে আদর যত্ন করার ইচ্ছে হয়েছিল। মনের থেকে অদম্য ইচ্ছে হয়েছিল কিনা সে বিষয়ে হরেকেষ্টর সন্দেহ আছে। হয়তো শাশুড়ীর মা ঠাকুমা কিংবা পাড়ার অন্য কেউ—এক জামাই মরলে আর এক জামাইকে ভাল খাইয়েছিল কোনদিন। শাশুড়ী সেটা শিখে রেখেছিল। শিখে রাখা কোন জিনিস ছাড়া প্রাণের তাগিদে একটা কিছু করার মত হৃদয় বুদ্ধি বা সাহস কিছুই নেই এদের। শাশুড়ীর চোখের সামনেও এ বাড়ি ছাড়তে চায় না হরেকেষ্ট—এ রকম পরিস্থিতিতে কান্নার প্রচলন নিশ্চয় রয়েছে।

শোবার পর মাথার মধ্যে দু'দিনের সমস্ত ঘটনা তোলপাড় করে। সে ছটফট করে। রাতে অনিদ্রা তার এই প্রথম, কোনদিন এমন হয়নি। অনিদ্রা যে এত বড় শাস্তি সে এই প্রথম উপলব্ধি করল। নিজের বাড়ি হ'লে পায়চারী করত কিংবা ছুটে বার হ'য়ে যেত রাস্তার ওপর। গিয়ে বসত হয়তো বলাইএর খড়াতে। বলাই রাত জাগে, আর দুপুরে ঘুমোয়। কিন্তু এখানে মুখ বুজে অনিদ্রার জ্বালা সহ্য করতে হবে।

রাত আর কাটতে চায় না। কত রাত হ'লো কে জানে। চারিদিকে নিঝুম, অর্ধেক রাত শেষ হয়েছে নিশ্চয়। ঘরের মধ্যে খুকি একবার ঘুমের ঘোরে চিৎকার করে ওঠে। হরেকেষ্টর হাসি পায়। সে ভাবে, খুকি হয়তো স্বপ্ন দেখছে যে সে তাকে জোর ক'রে হংসপুর নিয়ে যাচ্ছে। নারে খুকি—তুই থাক্, যতদিন ইচ্ছে থাক্ তুই। তোকে নিয়ে গিয়ে কি করব আমি। দশ বছর বাদে যদি কখনো নিতে আসি তোকে তখন তুই-ও আমার

মত এই কথাই ভাববি সেদিন! আমাকে দেখে তোর হাসি পাবে সেদিন। তোর দিদির মত গলায় দড়ি দিতেই ইচ্ছে হবে। দিদির বোন তুই—এখন থেকেই শিখছিস তার কাছে। এখন থেকেই আমাকে দেখতে পারিস না।

হরেকেষ্ট ভাবে খুকিকে এ সময় একবার তোলা দরকার। স্বপ্ন দেখার পর বাইরে থেকে ঘুরিয়ে না নিয়ে গেলে বিছানা ভাসায় সে। ভাসাক্, তার কি। উমাই টের পাবে মজা।

একটা কাক ডেকে ওঠে। মাঝ রাতেও কাক ডাকে কিন্তু সে শুক্লপক্ষে। এই অন্ধকার রাতে এক বাচ্চাদের ঠোঁটের খোঁচা খেয়ে জেগে উঠতে পারে। কিন্তু বাচ্চাদের কিচির-মিচির শোনা গেল না। সম্ভবতঃ ভোর হয়েছে। ঠাণ্ডা ঝিরঝিরে বাতাস এসে গায়ে লাগছে। গরম কালের শেষে রাতের বাতাসের মত।

হরেকেষ্ট উঠে বসে। এখনি সে যাবে। এঁর পরেই হয়তো ভোরের আলো ফুটবে। সে উঠে দাঁড়ায়। দাঁড়িয়ে ঝুলিয়ে রাখা জামাটা গায়ে দেয়। কোমরের সংগে গামছাটা বেঁধে নেয় ভাল করে। পাটিটা গুটিয়ে রেখে উঠোনে নামে সে।

চমকে ওঠে হরেকেষ্ট। উমার গলা, সে ফিরে তাকায়—উমা হাতে ল্যাম্ফো নিয়ে দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে রয়েছে। ল্যাম্ফোর আলো উঠোনে ছড়িয়ে পড়ে। কখন এলো উমা—আগে তো আলো ছিল না?

হরেকেষ্ট একটু দাঁড়িয়েই আবার চলতে সুরু করে।

—'জামাই শুনবে না?'—উমার স্বরের আর্তিতা তাকে থামিয়ে দেয়। সে দু'চার পা এগিয়ে আসে ধীরে ধীরে। উমা

কি বলে শুনেই যাওয়া যাক।

—'কোথায় যাচ্ছো জামাই, এ যে মাঝ রাত। না ঘুমিয়েও বুঝতে পারলে না?"

সে ঘুমোয়নি উমা কি করে জানল? সে বলে—"না ভোর রাত।"

—'ভুল করেছ জামাই।'

—'তা হোক্ আমি চলে যাবো।

—'ও'।

হরেকেষ্ট কিছুক্ষণ দাঁড়িয়ে থেকে আট আনা পয়সা পকেট থেকে বার ক'রে উমার হাতে দিয়ে বলে—"খুকিকে একটা নতুন বই দিও—ওটা ছিঁড়ে গিয়েছে। আর একটা লাল গামছা দিও, আমার গামছা দেখে নিতে চেয়েছিল।"

পয়সা কয়টা উমা হাতে নিতে হরেকেষ্ট স্বস্তি পেল, তার ভয় ছিল হয়তো নেবে না সে।

সে বলে—'তুমি আমাকে হয়তো খুব নীচ ভাবছো। সেটা ঠিক নয়। আর একবার একটু ভেবে দেখো, কোন খারাপ উদ্দেশ্য আমার ছিল না।"

উমার চোখে জল। সে ল্যাম্ফোটা মাটিতে নামিয়ে রেখে হরেকেষ্টর হাত দু'খানা শক্ত ক'রে চেপে ধ'রে তার ওপর মাথা রাখে। হরেকেষ্টর হাতে শ্রাবণের ধারা।

—'ভুল বুঝিনি জামাই, কিন্তু আমরা যে মেয়েমানুষ'—

কতক্ষণ তারা ওভাবে ছিল জানে না, হয়তো সামান্যক্ষণ, কিংবা অনেকক্ষণ হয়তো—দুজনার কারও খেয়াল ছিল না।'

হঠাৎ খুদির গলা শুনে তারা চমকে দূরে সরে যায়। খুদি কখন যে ঘুম থেকে উঠে তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে—তারা

জানে না। উমাত পাশেই শুয়েছিল, সে স্বপ্ন দেখার পর আর ঘুমোয়নি। উমা বিছানা ছেড়ে উঠলে সে টের পেয়েছিল, বাইরে কথাবার্তা শুনে চলে এসেছে।

সে হেসে বলে—'জল পড়ে, পাতা নড়ে।'

হরেকেষ্ট খুদিকে দেখে কেন যেন সংকুচিত হয়। তার সরল চোখে সে অনুভব করে, 'যুবতী'র বেদনা-ভরা অনুযোগ। সম্পূর্ণ কল্পনা—রাত-জাগা মস্তিষ্কের কল্পনা। তবে এ কল্পনা তার অপরাধী মনের সৃষ্ট নয়। সে কোন অপরাধ করেছে বলে মনে মনে স্বীকার করে না। তবু বাইরের সংকোচ—সংস্কারের সংকোচ—গ্রাম্য সংকীর্ণ জীবনের সংকোচ—যা কথামালা শেষ করা এবং আরও দু'চারটে পুঁথিপড়া হরেকেষ্টর পক্ষে কাটিয়ে ওঠা সম্ভব নয়। কথামালা, অভিজ্ঞতা আর যুগপ্রভাব তাদের সংকীর্ণতার অন্ধকার-ঘরের ছাদে শুধু দু'চারটে ছিদ্রের সৃষ্টি করেছে, যে ছিদ্র দিয়ে উদারতার সূর্যরশ্মি এসে বাইরের এক সংস্কারবিহীন জীবনের আভাস দেয় মাত্র। সেই আভাস পেয়ে হংসপুরের পণ্ডিতের পাঠশালার ছাত্ররা মাঝে মাঝে চঞ্চল হ'য়ে ওঠে। তারা অন্ধকার ঘর থেকে ছুটে বার হতে চায়, কিন্তু পারে না। তাদের মনের সেই সংঘাত আলোড়ন হরেকেষ্টর মনেও সক্রিয়।

খুদি আবার বলে ওঠে—"জল পড়ে, পাতা নড়ে।"

উমা ভাবল তার বোন বোধহয় ঘুমের ঘোরে আবোল-তাবোল বকছে। সে হরেকেষ্টকে বলে—'ওর জল পড়ে পাতা নড়ে পড়ার খুব সখ।"

সে খুদিকে ঝাঁকি দেয়—"এই খুদি, খুদি—"

—"ঝাঁকাও কেন ?"

—"কি বলছিস, যা-তা।"

—"ওই তো জল পড়ছে, পাতা নড়ছে।" সে উমার চোখে দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেয়। ল্যাম্ফের আলো এসে পড়ায় উমার চোখের জল মুক্তোর মত চিক চিক করছিল।

হরেকেষ্ট হেসে ওঠে।

উমা তাড়াতাড়ি চোখ মুছে নেয়।

হরেকেষ্ট তাড়াতাড়ি বলে—"ও জল নারে,—বৃষ্টির জল।"

তার কথায় খুদিকে একটু চিন্তিত দেখা যায়। সে কিছুক্ষণ পরে বলে—"আর পাতা ?"

—"চোখের পাতা না, গাছের পাতা।"

খুদি যেন নিরাশ হয়। কিন্তু হরেকেষ্টর কথার প্রতিবাদ করতে পারে না। সে বুঝতে পারে হরেকেষ্টই ঠিক বলেছে—তার ভুল হয়েছিল। যেদিন উমা প্রথম তাকে 'জল পড়ে পাতা নড়ে' পড়াতে বসেছিল সেদিন সেই সময়েও তার চোখে কেন যেন জল ছিল—তাই খুদির অমন ধারণা হয়েছিল।"

—"আসি উমা।"

—"এসো, কবে আসছো ?"

—"আসব না আর।"

—"আমি জানতাম।" উমা ম্লান হাসে। একটু পরে বলে—"খুদিকে তুমিই পড়িও জামাই, আমি আর পারি না।"

—"কিন্তু ও তো থাকবে এখন।"

—"পাঠিয়ে দেব কিছুদিন পরে।"

উমার কথার অর্থ পরিস্কার হয় না তার কাছে। হঠাৎ খুদিকে

পড়াতে এত অনিচ্ছা হ'লো কেন তার, বুঝতে পারে না। ভাবতে ভাবতে সে রাস্তায় এসে পড়ে।

নন্দ ফেরেনি আর। তার বাড়ির সবাই কেঁদে কেঁদে এখন চুপ ক'রে গিয়েছে—বাড়ির ক্যাম্প উঠে গিয়েছে। এ এলাকায় ক্যাম্প থাকার প্রয়োজন ফুরিয়েছে সরকারী মতে। ক্যাম্প তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে সীমান্তের পাশে কোনখানে—ধানের স্রোত চলেছে বর্ডারের ওপারে। কিছুতেই সামলানো যাচ্ছে না।

স্থলপথে গরুর গাড়ি আর মোষের গাড়ি, জলপথে বড় বড় নৌকোয় বোঝাই হয়ে চলেছে ধান। এক আধটা গাড়ি বা নৌকো নয়—যখন যায় সারিবদ্ধ হয়ে যায়। সবাই জানে, সবাই দেখে অথচ বন্ধ করবার উপায় নেই। ওদের দলগত শক্তি বেশি, ওদের পয়সা বেশি, এমনকি অনেক সরকারী লোকও ওদের সাহায্য করে। গ্রামবাসীদের বিচ্ছিন্ন প্রচেষ্টায় ফল হয় না।

আজকাল ধানের সংগে সংগে সরষের তেলও চালান যাচ্ছে —বর্ডারের ওধারে নাকি তেলেরও খুব অভাব।

এপারে ওপারে কোলাকুলি। দেওয়া নেওয়ার মধুর সম্পর্ক। এই সম্পর্কে মাঝে মাঝে ছেদ পড়ে দু'চারজন সৎ আর সাহসী কর্মীর হস্তক্ষেপে। তারা প্রাণকে তুচ্ছ করে, যেমন করেছে সেই পেট্রল লীডার, অজ্ঞান হয়ে যে ধানক্ষেতের মধ্যে পড়েছিল।

শুধু সৎ ব'লে চলে না এখানেই। সৎ হ'লে নিজেকে গুটিয়ে রাখা যায়, অন্যের অন্যায়ে প্রতিবাদ করা যায় না। সেজন্যে সাহসীও হ'তে হয়। সাহসী হবার চরম বিপদ এখানে।

সীমান্তে সৎ লোকের অভাব নেই, কিন্তু তারা মরতে চায় না—তাই সীমান্তের চোরাই চালান বন্ধ হয় না। সৎ এবং সাহসী হবার চরম পরিণতি কিছুদিন আগেই ঘটে গেল।

হাকিমপুরের খাল দিয়ে গভীর রাতে নিঃশব্দে চলছিল পঁচিশখানা নৌকো। খালটা বরাবর চলে গিয়েছে বর্ডার পার হ'য়ে ওধারে। নৌকো বোঝাই সরষের তেলের টিন। হাকিমপুর বি, ও, পির কনষ্টেবল মধু দাস ছিল খালের ধারে ডিউটিতে। হাতে তাঁর রাইফেল।

জল কেটে চোরের মত নৌকোগুলোকে এগিয়ে আসতে দেখে মধুদাস রাইফেল উঁচিয়ে রুখে দাঁড়ালো! নৌকো থেমে গেল।

—"গুলি করো না ভাই"—চেঁচিয়ে ওঠে কেউ সামনের নৌকো থেকে।

—"কি যায় নৌকোয় ?"—মধু বলে।

—"তেল"—স্পষ্ট জবাব আসে।

—"হবে না যাওয়া"—মধু হুংকার দিয়ে ওঠে।

—'এর একটিন তোমার পায়ে ঢালবো,—তেলে কি না হয় ?" —বিদ্রূপের স্বর ভেসে আসে।

—"গুলি করছি—"

—"কত চাও ?"

—"একপয়সাও না"—মধু ঠোঁট কামড়ে ধরে।

—"বাপের জমিদারী আছে ?"

মধু জবাব দেয় না।

—"রাগ কোরো না ভাই, লোক পাঠাচ্ছি।" সর্দার গোছের

কেউ বলে কথাটা। সংগে সংগে সাত আটজন লোক ঝুপঝাপ নেমে পড়ে নৌকো থেকে। তারা এগিয়ে যায় মধুর দিকে।

সে সতর্ক প্রহরীর মত বলে—"একজন এসো। সকলে একসংগে এলে গুলি করব।

—"কি যে বল ভাই"—সাতজনের একজন হেসে বলে। মধুর কথা গায়ে না মেখে তারা আবার এগিয়ে আসে।

—"হল্ট।"

থেমে যায় সাতজন লোক। কৃষ্ণ পক্ষের দেরিতে ওঠা চাঁদের আলোয় তাদের ভীতি আর প্রতিহিংসা মেশানো চোখগুলো চক্‌চক্ ক'রে ওঠে।

—'একজন এসো।'—মধু বলে।

একজন এলো। একশো টাকার চারখানা নোট এগিয়ে দেয়।

—"এতে হবে না"—বধু বলে।

—"আর দুটো নাও—দুশো।"—লোকটা মিনতি করে।

—"তাও হবে না—"রাইফেলের লক্ষ্য স্থির।

—"কত চাও তাইলে!" লোকটা অধৈর্য হয়।

—'পঞ্চাশ হাজার।'

—'পাগল নাকি? পঞ্চাশ হাজার টাকার মালই নেই আজকে।"

—'উপায় নেই, ফিরে যাও।"—মধু জোরে হেসে ওঠে ভাবে খুব জব্দ করেছে।

কিন্তু তার হাসি শেষ হবার আগেই লোকটাও হো হো করে হেসে ওঠে। মধু বিস্মিত হয়, কিন্তু মুহূর্তের জন্যে শুধু। পেছন

থেকে একগাদা লোক ঝাঁপিয়ে পড়ে তার ওপর। রাইফেল কেড়ে নেয়।—পেছনের নৌকো থেকে নেমে লোকগুলো জংগলের মধ্যে দিয়ে সরীসৃপের মত এগিয়ে এসে তাকে আক্রমণ করেছে। এমন আক্রমণের কথা সে ভাবতে পারেনি।

পরদিন মধুর মৃতদেহ পাওয়া গেল সেখানে। রাইফেল উধাও। মধুকে না মেরে উপায় ছিল না ওদের—ওরা তার খুবই পরিচিত।

পকেটে একটা চিঠি পাওয়া গিয়েছিল, তার স্ত্রীকে লেখা—

কণিকা,

তোমার চিঠি পেলাম। পোষ্ট অফিস অনেক দূরে। তাই খাম এনে তাড়াতাড়ি লেখা শেষ হ'য়ে ওঠে না। এখানকার কথা আর কি লিখব। রামরাজ্য না রাবণ রাজ্য বুঝতে পারি না। আমার মনে হয় রাবণরাজ্য। কিন্তু হংসপুরের নন্দ ঘোষ, অঘোর পাড়ার আশরফ আলি, ভাজাংলার শ্রীনাথ কবিরাজরা বলে এটা নাকি রামরাজ্য। রামরাজ্য থেকে কবে যে উদ্ধার পাবো জানি না। চারিদিকে শুধু রামের ছড়াছড়ি।.........হেমেন আমার পকেট থেকে মাইনের পাঁচ টাকা নিয়ে তোমাকে দেখিয়ে বলেছিল, আমি ঘুষ নিয়েছি। তুমি সে টাকা ছিঁড়ে ফেলেছিলে—দু'দিন ভাত খাওনি আর চারদিন কথা বন্ধ করেছিলে, মনে আছে? সে মাসে আমার বড় কষ্ট হয়েছিল, মাইনের পাঁচ টাকা চলে যাওয়া কি কম কথা? ছেলেটা বরাবরের বাঁদর। আমি ভাবি এদের ঘরে কি তোমার মত বৌ-বৌদি, মা-বোন নেই? তবে কেন এরা এ পথে চলে?......

মধু দাসের চিঠির খবর শুধু পুলিশ জানে, আর জানে তার স্ত্রী কণিকা, যার হাতে শেষ পর্যন্ত সেটা গিয়ে পৌঁচেছিল। কিন্তু এখানকার লোকে চিঠির খবর রাখে না। তারা শুধু জানে মধু মরেছে—পুলিশ হয়েও মরেছে। পুলিশও যদি বাঁচতে না পারে, তাহলে সাধারণ মানুষ কি করবে?

তাই অবাধ গতি—। প্রখর রৌদ্রে চকচকে তেলের টিন গ্রামবাসীদের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়ে নিরুপদ্রবে সীমান্ত পার হ'য়ে যায়। ওপারের সুপুরীর বস্তাগুলোও তেমনি এ পারে আসে। সবাই জানে, অথচ কেউ জানে না—সবাই দেখে, অথচ কেউ দেখে না।

বর্ডারের খবর হরেকেষ্টও শোনে। আগে অতটা বুঝতে পারত না, আজকাল বোঝে। আজকাল সবাই বোঝে। নন্দ কি ক'রে পয়সা করেছিল, এতদিনে সে খবর সবার জানা হ'য়ে গিয়েছে। সহরের কোন্ ভদ্রলোক তার সাইকেল কিনে দিয়েছিল, সবাই জেনে ফেলেছে। তাই তার অন্তর্ধানে গ্রামের কারও সহানুভূতি নেই। আপদ গিয়েছে।

নন্দ তো অনেকদিনই উধাও। কিন্তু নীলুর সংগে লক্ষ্মীর বিয়েটা হবো হবো করেও হতে চাইছে না। দুরন্ত ইচ্ছে নিয়েও লক্ষ্মী নীলুকে ঠেকিয়ে রেখেছে। আষাঢ় মাস পড়তে প্রাণকেষ্ট শয্যা নিয়েছে। সামনে পুরো বর্ষা পড়ে আছে। বর্ষায় এ-রোগ বাড়ে। এখন তার বিয়ে হ'লে হরেকেষ্টর চরম অসুবিধা হবে। ঘরে-বাইরে দু'দিকে সামলাতে হবে। বাইরের সমস্ত কাজ সেরে ঘরের রুগী আর নাবালিকাকে সামলানো তার পক্ষে অসম্ভব হ'য়ে উঠবে।

এদিকে সুযোগ চলে যায় প্রতিদিনে। এর পর কখন কি হবে বলা যায় না। লক্ষ্মী সারাদিন কাজ করে আর সারা রাত কাঁদে। নীলু রোজ এসে ফিরে যায় হতাশা নিয়ে। প্রতিদিনই সে আশা ক'রে আসে, কিন্তু লক্ষ্মী বিয়ের সম্বন্ধে কোন কথাই বলেনা। কি ক'রে বলবে—তার সুখই তো সব নয়। সংসারে স্বার্থপর হওয়া বড় কথা নয়।

নীলু শেষে একদিন বলেই ফেলে—"আমাকে বিয়ে করতে দ্বিধায় পড়েছো নাকি লক্ষ্মী? সংকোচের কি আছে, বলে দাও স্পষ্ট করে।"

লক্ষ্মী কেঁদে ফেলে। জবাব দিতে পারে না। তার এই ভেবে দুঃখ হয় যে, নীলুও তাকে ভুল বুঝল। নীলু কি তার অসুবিধে বুঝতে পারে না?

—"চুপ করে আছো কেন?"

—"তুমি ওকথা কি করে বললে?"

—"জানি না, তবে নিজের ওপর দিন দিনই যেন আস্থা হারিয়ে ফেলেছি। নিজে জানি তো কতবড় অপদার্থ আমি।"

—"আমার মনের অবস্থা তুমি বুঝতে পার না।"

—"পারি। কিন্তু আমার ভয় হয় এরপরে হয়তো সুযোগ হারাবো। নন্দ যদি আবার ফিরে আসে? যদি সে তোমার বাবার হাতে হাজার টাকা তুলে দেয়? যদি সে বলে যে তোমার বাবাকে সহরের হাসপাতালে রেখে চিকিৎসার সব ব্যবস্থা করে দেবে?"

সেকথা ভাবতে লক্ষ্মীও শিউরে ওঠে। না, না, তা কখনো হ'তে পারে না। প্রাণকেষ্ট আর যাই হোক, অমানুষ নয়। কিন্তু

তবু কেন যেন সে মনের ভীতি ভাবকে সম্পূর্ণ ঝেড়ে ফেলতে পারে না।

—"বাবা আর বাঁচবে না নীলুদা। এ অবস্থায় তুমি ছেড়ে যেতে বল?"

নীলু জবাব খুঁজে পায় না।

কিন্তু বিয়ে হঠাৎ হ'য়ে গেল। হরেকেষ্টর শ্বশুরের গ্রামের গোলমাল নীলুদের বিয়ে তরান্বিত করল। গোলমালটা অবনী মণ্ডলকে নিয়ে। সে ও-রাজ্যের পুলিশ পিটিয়েছিল, তার প্রতিশোধ নিয়েছে ওরা। অবনীর মন ভেঙে দিয়ে গিয়েছে—মেরুদণ্ডও! এমনভাবে ভেঙে দিয়েছে যে কোনদিন আর জোড়া লাগবে না। প্রচণ্ড প্রতিশোধ নিয়েছে তারা। মণ্ডলের স্বপ্নের অগোচর ছিল।

দিনদুপুরে কাণ্ডটা ঘটেছিল। মণ্ডলের বউ স্বচক্ষে দেখল কিন্তু বাধা দিতে পারল না। তার বাতের ব্যথা বেড়েছিল, শয্যাশায়ী ছিল সে দাওয়ার চাটাইএর ওপর। পালিয়ে গিয়ে গ্রামের দু'চারজনকে ডাকলে হয়তো রক্ষা পেত মেয়েটা। কিন্তু অক্ষম বলে পালাতে পারেনি। চিৎকার করতে গিয়েছিল, সংগে সংগে একজন ছুটে এসে তার মুখ চেপে ধরল। মুখের ভেতরে গামছা পুরে দিয়ে হাত দুটো শক্ত ক'রে বেঁধে ফেলল পিছন দিকে। চিৎকার করা বা নড়ার উপায় থাকল না। বিস্ফারিত দৃষ্টিতে চেয়ে চেয়ে তার নিজের গর্ভের মেয়ে গংগার ওপর পশুদের তাণ্ডবলীলা দেখল।

তারা কুৎসিতভাবে হাসতে হাসতে চলে গেলে গংগা

কোনদিকে তাকায় নি। কিছুক্ষণ ধস্থ ধ'রে পড়ে থেকে উঠে দাঁড়াল, তারপর টলতে টলতে ধীরে ধীরে বাড়ির বাইরে চলে গেল। পৃথিবীতে আর তার কেউ নেই—কিছু নেই। চার বছর আগে স্বামীকে হারিয়েছিল—এতদিনে সব হারালো।

গংগার মা বুঝল মেয়ে তার জন্মের মত চলে যাচ্ছে। সে শরীর আর মনের তীব্র যন্ত্রণা নিয়ে ছটফট করল, কিন্তু বাধা দিতে পারল না। তার বলার ইচ্ছে ছিল—"ওরে হতভাগী—যাসনে। কেউ দেখেনি—"

কেই বা দেখবে। গ্রামের একপ্রান্তে নিরিবিলি এই বাড়িতে মরা-কান্না কাঁদলেও সে-কান্না মিহি হ'য়ে অন্যান্য গ্রামবাসীদের কানে গিয়ে পৌছয়।

অসহায় ভাবে প'ড়ে থেকে সে মেয়েটাকে বাড়ি ছেড়ে চলে যেতে দেখল। গংগার চোখ দুটো ছিল অদ্ভুত রকম শুকনো—একফোঁটা জল ছিল না তাতে।

তার মা চিৎকার করতে গেল—"তুই মরিস না রে গংগা —মরিস না।"

কিন্তু গামছাটা কণ্ঠনালীকে চেপে ছিল—তার স্বর বার হলো না। সে অজ্ঞান হ'য়ে পড়ল। অবনী মণ্ডল তাড়াতাড়ি না এলে সে নিজেও মরত—দম আটকে মরত।

স্ত্রীকে ও ভাবে পড়ে থাকতে দেখে, অবনী চিৎকার ক'রে উঠেছিল। সে এক অজ্ঞাত আশংকায় কাঁপতে কাঁপতে তার মুখ থেকে গামছা বার ক'রে নিয়েছিল—হাতের বাঁধন খুলে দিয়েছিল। মেয়েকে ডাকতে লাগল—গংগা—অগংগা—গেলি কোনে হারামজাদী।"

গংগাকে না দেখে সে ভাবল, মেয়েটা কি মায়ের সংগে ঝগড়া ক'রে এ দশা করল? ঝগড়াঝাটি অবশ্য মায়ে-ঝিয়ে কখনো-সখনো হয়, কিন্তু গংগা তো সে রকম মেয়ে নয়। অমন শান্ত মেয়ে ক'টা দেখা যায়। তার মায়েরই মেজাজটা বরং ইদানীং বাতের ব্যথায় খিটখিটে হয়েছে। কিন্তু সে-ই বা যাবে কোথায় এই অসময়ে।

অবনী আবার ডাকে গংগাকে। তার ডাক বাতাসে ভাসতে ভাসতে মাঠের ওপর দিয়ে বর্ডার পার হ'য়ে চলে যায়,—প্রতিধ্বনিও হয় না কোথাও।

সে কি করবে ভেবে পায় না। গংগা এলে এ সময় একটা কিছু করত।

স্ত্রীর চেতনা ধীরে ধীরে ফিরে আসে। বড় বড় চোখে চারদিকে তাকিয়ে চিৎকার করে ওঠে সে—"ধর ধর, যাতি দিও না।"

—"কারে?" বিস্মিত হয় অবনী।

—"গংগা গো গংগা। মরতি চলেছে। তোমার পায়ে পড়ি, মিয়েডাকে ধর।" কান্নায় সে ভেঙে পড়ে।

অবনী থ' হ'য়ে দাঁড়িয়ে থাকে। তার মাথায় কিছুই ঢোকে না। চাটাইয়ের পাশে বাতের ব্যথায় মালিশের জন্যে শূয়োরের চর্বি ছিল একটা বোতলে। সেই বোতল তুলে নিয়ে অবনীর স্ত্রী সজোরে স্বামীর হাতের ওপর আঘাত করে।

—"দাঁড়ায়ে আছো ক্যান। যাও, শিগগির যাও, মিয়েডা কি আর আছে—হা ভগবান!"

অবনী ছোটে। কিন্তু কোথায় যাবে? সে কিছুই জানে

না। গংগা যে কেন মরতে যাবে, বউএর যে কি ক'রে ও-দশা হলো, কিছুই বুঝতে পারল না। তবু চারদিকে তন্ন তন্ন করে খুঁজতে লাগল আর মাঝে মাঝে চিৎকার ক'রে ডাকতে লাগল মেয়েকে। লোকের বাড়ি-বাড়ি গেল, কিন্তু পেলো না তাকে। ফিরে এলো মুখ নীচু ক'রে।

—"পালে না?"

—"না।"

অবনীর স্ত্রী বুক চাপড়াতে থাকে—"হায় ভগবান—হায় ভগবান।"

—"কি হয়েছে বল না!" অবনী মণ্ডলের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে।

—"ওগো, তা কি মুখে আন্‌তি পারা যায়? ওহো হো—"

অনেকক্ষণ পরে একটু একটু করে সমস্ত ঘটনা সে বলে। পাষাণের মত দাঁড়িয়ে অবনী শুনে যায়। এত অবিশ্বাস্য যে সে ভাবতে পারে না এমন কাণ্ড সত্যিই ঘটেছে। যেন দুঃস্বপ্ন—একটু পরেই জেগে উঠবে।

অবনীর স্ত্রী বলল যে, তারা যাবার সময় বলে গিয়েছে যে ওপারের পুলিশকে মারার প্রতিফল।

—"ওগো, ওদের মারতি গেলে ক্যান। এ বছরে তো লবান্ন আটকাতো না ওরা। ওগো, ওরা মিয়েডাকে এ্যাকিবারে মারি ফেললি পারত। গংগার গলায় দা দিয়ে কোপ বসালি পারত। মা হয়ে কি দেখনু। গংগারে—গংগাঃ।"—অবনীর স্ত্রী আর্ত চিৎকার ক'রে ওঠে।

কালীবাড়ির অশ্বত্থ গাছের ডালে গংগাকে ঝুলতে দেখা গিয়েছিল। অবনী কত যত্ন ক'রে তার দেহখানা নামিয়ে

নিয়েছিল মাটিতে। তার মেয়ে—একমাত্র সন্তান! সে তাকিয়ে দেখল গংগা ঘুমোচ্ছে,—ছোটবেলায় যেমন ক'রে ঘুমোতো। এতটুকুও পরিবর্তন হয়নি। অথচ সে এতদিন গংগার দিকে তেমনভাবে চেয়ে দেখেনি কখনো। গংগা, তার মা, ধানের গোলা, লাঙল—সবই সমান ছিল তার কাছে। লাঙলকে তবু সাবধানে নাড়াচাড়া করতে হয়, নইলে ফলা ভেঙে যেতে পারে। ধানের গোলা মাঝে মাঝে দেখতে হয়—নইলে ইঁদুরে ফুটো করে ফেলে। স্ত্রীর খোঁজও মাঝে মাঝে নিতে হয় অবনীকে; বাতের ব্যথায় বেশি কাতরালে শূয়োরের চর্বি যোগাড় ক'রে আনতে হয়। কিন্তু গংগার খোঁজ সে তো কোনদিনও করেনি। সেই কবে বিধবা হয়ে ফিরে এসে বলল যে, সে আর বিয়ে করবে না, তারপর থেকে তাকে নিজে হাতে কিছু খেতে পরতে দিয়েছে বলে মনে হলো না। দুটো মিষ্টি কথাও হয়তো বলেনি কখনো। ভাবতে ভাবতে অবনীর ভেতরটা কেমন করে উঠল। যে অগাধ বাষ্প জমল ভেতরে সেটা বাইরে আসতে পথ না পেয়ে তার দেহখানাকে প্রচণ্ডভাবে ঝাঁকি দিতে লাগল।

গংগার ঘটনার পর ও-গ্রামে আর কিছু না ঘটলেও খোল্‌সে-কুঁড়ি গ্রামের ঘটনা শুনে সবাই ত্রস্ত হয়ে উঠল। বুঝল, ওপারের সিপাইরা নতুন খেলার স্বাদ পেয়েছে। এতদিন শুধু গরু চুরি যেত, গুলি চলত, ধানকাটা নিয়ে বিবাদ হতো, চোরাই-চালান যেত; কিন্তু তাতে ওরা আর তৃপ্ত নয়। আরও সাংঘাতিক খেলায় মেতেছে ওরা। খোল্‌সেকুঁড়ির পতিত হালদারের কিশোরী মেয়ের মৃতদেহ তো একদিন ক্ষতবিক্ষত অবস্থায় পড়ে থাকতে দেখা গেল সীমান্তের পাটক্ষেতের মধ্যে। শিয়ালে খাওয়া

ক্ষত নয়।

হরেকেষ্টর শ্বশুর কূটবুদ্ধিতে যতই বাজীমাৎ করুক, এসব ঘটনা শুনে সে রীতিমত ভয় পেলো। উমাকে সে তাড়াতাড়ি নিয়ে গেল হংসপুরে।

উমা এলো বলেই নীলু লক্ষীর বিয়েটা হলো। প্রথম যখন সে বাড়িতে ঢুকল তখন হতভম্ব হরেকেষ্টকে দেখেও সে মুচকি হাসেনি, দাওয়ায় খুদিকে বসে থাকতে দেখে তার কাছে যায়নি। সোজা রান্নাঘরের মধ্যে লক্ষীর কাছে গিয়ে দাঁড়ালো।

লক্ষী অবাক হয়েছিল। উমাকে সে আগে কখনো দেখিনি। উমাই পরিচয় দিল। তারপর সংক্ষেপে গংগা আর পণ্ডিত হালদারের মেয়ের কাহিনী শেষ করে বলল—"ভয় হয় ভাই, ওখানে থাকতে! বাবা তাই নিয়ে এলো। তাড়িয়ে দেবে না তো?"

—"না না, সেকি? আমার তো খুব আনন্দ হচ্ছে। একা একা কি ভাল লাগে?"

উমা এসেছিল দুপুরে। বিকেলেই দেখা গেল লক্ষীর সংগে তার ভীষণ মাখামাখি। জন্মে অবধি দুজনার যেন ছাড়াছাড়ি হয়নি। হরেকেষ্ট আহত হ'লো তার ওপর উমার তাচ্ছিল্য ভাব দেখে। তারই সম্বন্ধের জের টেনে এখানে এলো, অথচ একটা কথাও বলল না এ পর্যন্ত। সে আরও অবাক হয় লক্ষীর আনন্দ দেখে। এত উৎফুল্ল তাকে দেখাই যায় না আজকাল।

লক্ষীর আনন্দের কারণ সে নিজে এসে বলল হরেকেষ্টকে—

"উমাদি এখেনে থাকবে দাদা। বর্ডারে গোলমাল খুব।"

হরেকেষ্ট আস্তে আস্তে বলে—"উমা এখেনে থাকবে তাতে তোর এত আনন্দ কেন রে লক্ষ্মী?"

—"জানি না যাও।" তার এমন আহ্লাদের স্বর হরেকেষ্ট বহুদিন শোনেনি। সে অনুমান করে, ভেতরে নিশ্চয় কোন ব্যাপার রয়েছে।

—"সত্যি করে বল না লক্ষ্মী।"

—"সত্যি কথা হলো উমাদি এখানে থাকলে আমার বিয়ে হ'তে পারবে।"

—"কেন?"

—"তোমার সংসার উমাদি চালিয়ে দেবে কিছুদিন।"

—"উমা কি চিরকাল থাকবে?"

—"না, দু'মাস থাকবে বলেছে—বেশিও থাকতে পারে। ততদিনে বর্ষা চলে যাবে।"

—"উমা দু'মাস থাকবে!" হরেকেষ্ট কথাটা বিশ্বাস করে উঠতে পারে না। শ্বশুরের সংগে তার কোন কথা হয়নি। শ্বশুর দাঁড়ায়নি একদণ্ড। উমার পেছনে পেছনে চোরের মত এসে প্রাণকেষ্টর সংগে দেখা করতে চাইল। হরেকেষ্ট তাকে বাবার ঘরে দিয়ে চলে এসেছিল। কিন্তু সে চলে আসার কিছুক্ষণ পরেই শ্বশুর বাইরে এসে খুদির সংগে দুটো কথা বলল। উমাকে একপাশে ডেকে নিয়ে নীচু গলায় অনেকক্ষণ কি যেন বোঝাল। শেষে হেসে হরেকেষ্টকে বলল—"আচ্ছা চললাম। অনেকডা পথ তো—"

হরেকেষ্ট থাকতে বলেনি শ্বশুরকে। তাকে দেখলেই বিয়ের

রাতের কথা মনে হয়। শ্বশুর হয়তো তার সে মনোভাব বুঝতে পারে, তাই বিশেষ ঘাঁটাতে সাহস পায় না। তবে মুখের ভাবখানা এমন করে যেন বুদ্ধির খেলাতে তাকে হারিয়ে দিয়েছে।

উমা দু'মাস থাকবে শুনে হরেকেষ্ট বিস্ময় প্রকাশ করাতে লক্ষ্মী বলে—"ওমা, তোমার শ্বশুর বলেনি তোমাকে ?"

—"না তো !"

—"সে কি দাদা !" সে যেন আকাশ থেকে পড়ে।

তার কথা শেষ হ'তেই উমা সেখানে এসে দাঁড়ায়। সে হেসে বলে—"আমার বাবার সংগে তো জামাইয়ের কথা নেই।"

—"কেন ?" লক্ষ্মী নতুন শুনল কথাটা। হরেকেষ্ট কোনদিন বলেনি।

তার মুখের ভাবে উমা খিল খিল করে হেসে উঠে বলে—"তোমার দাদাকে যে আমার বাবা ফাঁকি দিয়েছে।"

কথাটাকে সে ঘুরিয়ে বললেও, লক্ষ্মীর বুঝতে অসুবিধা হয় না। দাদার উপর সহানুভূতিতে তার মন ভরে ওঠে। সে বলে—"দিয়েছেই তো ফাঁকি। দাদা ভালো তাই শুধু কথা বন্ধ করেছে। আমি হ'লে আরও কিছু করতাম।"

উমার মুখ ফ্যাকাশে হয়ে যায়। তার মুখের দিকে চেয়ে লক্ষ্মী লজ্জিত হয়। সে ভুলে গিয়েছিল উমাকে কেন্দ্র করেই যতোকিছু হয়েছিল একদিন। যে তার বৌদি হতে পারত সেই আজ এ বাড়িতে এসেছে—অথচ কত প্রভেদ। এ বাড়ীর কেউ নয় সে।

উমার একটা হাত চেপে ধরে সে বলে—"অন্যায় করেছি। মাপ করো ভাই। কথাটা সত্যি বলে চাপতে পারিনি।"

—"সত্যি বলেই তো বলতে নেই ভাই। আমি যে প্রতিবাদ

করতে পারব না। মিথ্যে হলে কি চুপ করে থাকতাম?"

উমা লক্ষ্মীর হাত ধরে হরেকেষ্টর সামনে থেকে চলে যায়।

লক্ষ্মীর বিয়ের দিন জগবন্ধু পণ্ডিতকে নিয়ে এলো হরেকেষ্ট। অথর্ব হ'য়ে পড়ায় বাড়ির বাইরে যেতে পারে না পণ্ডিত। তবু তার আগ্রহ দেখে লাঠিতে ভর দিয়ে কোনরকমে এলো।

হরেকেষ্ট বলেছিল—"নীলু আপনার সেরা ছাত্র পণ্ডিতমশায়। আর লক্ষ্মী আপনার পাঠশালায় না পড়লেও বাড়িতে এসে কতবার পড়ে গিয়েছে। সেও আপনার ছাত্রীই। তাদের বিয়ে আপনি না দিলে আর কে দেবে?"

এ কথার পরে পণ্ডিত কি আর আপত্তি করতে পারে?

গ্রামের সকলের উপস্থিতিতে বিয়ে সুরু হয়। নীলু আর লক্ষ্মীর মুখের দিকে চেয়ে আনন্দে হরেকেষ্টর মন ভরে যায়। এমন সার্থক বিয়ে সে আর দেখেনি। এ তো তার আর খুদির বিয়ে নয়—ট্যানা ঘোষের সংগে উমার বিয়েও নয়—এখানে দুজনাই দুজনকে চায়। দুজনার মুখেই সেই পরিতৃপ্তি। আর দুজনাই তার পরম প্রিয়—লক্ষ্মী তার একমাত্র বোন, নীলু তার ভাইয়ের চেয়েও বেশি।

উমা কোমরে কাপড় জড়িয়ে উৎসাহের সংগে কাজ করছিল। সে ছাড়া এ বাড়িতে কাজের লোক কেউ নেই। এ গৃহিনীপণার মধ্যে সে এক বিষাদ-সুখ অনুভব করে—একটা দুঃখ মেশানো তৃপ্তি। দুঃখটুকু মনের ভেতরে গোপন থাকে, তৃপ্তির হাসিটুকু শুধু তার মুখে লেগে থাকে।

এমন সময় নন্দর পিসির ধূমকেতুর মত আবির্ভাবে বিবাহ-বাসরের আবহাওয়া যেন পালটে যায়।

পিসি বাড়িতে ঢুকেই হরেকেষ্টকে বলে—"হ্যাঁরে হরে, নন্দডাকে সত্যিই মারলি তোরা?"

পিসির কথায় হরেকেষ্ট একটু থতমত খায়। সে বলে—"নন্দকে মারব কেন?"

—"নন্দ যে মরেছে, এ কথাডা কেডা বলল তোরে?"

—"কেউ বলেনি। কেউ জানেও না সে মরেছে কিনা। হয়তো ফিরে আসবে একদিন।"

—"তবে যে বোনডারে সাত তাড়াতাড়ি বিয়ে দিলি?" পিসির কথায় বিষ।

—"নন্দর ফিরে আসার সঙ্গে লক্ষ্মীর বিয়ের কি সম্পর্ক?"

—"তা তো বলবি এখন। হাতি কাদায় পড়েছে যে। নন্দ থাকতি তোর বাপ যে আমাদের বাড়ি যাতি যাতি পায়ের সুতো ছিঁড়ে ফেলেছিল।"

হরেকেষ্টর রাগ হলেও সেটা প্রকাশ করলে পিসি কোন কেলেংকারী করতে পারে এই ভয়ে সে মোলায়েম ভাবে বলে—"বিয়ের কথা কি বলা যায় পিসি? যার সংগে যার লেখা। এই আমাকেই দেখ না কেন?"

শেষের কথাটুকু বলে হরেকেষ্ট মারাত্মক ভুল করল। নন্দর কথা চেপে গিয়ে পিসি তার শেষ কথাটুকুর জের টানল। উমার কথা এক সময়ে এমনিতেই তুলতো নিশ্চয়, কিন্তু হরেকেষ্ট আগেই সুযোগ করে দিল তাকে।

—"ওই মিয়েডার সাথেই তোর বিয়ে ঠিক হয়েছিল না?"

পিসি উমার দিকে আঙুল দিয়ে দেখায়।

হরেকেষ্ট কথা বলে না।

—"চুপ করলি ক্যান্? ক'।"

—"হুঁ।"

—"মিয়েডার শুনহু কপাল পুড়িছে।"

হরেকেষ্ট বিরক্ত হয়। সে বলে—"দেখে বুঝছো না?"

—"বুঝছি না বলিই তো বলতিছি।"

—"তুমি কি কাণা? কপালে সিঁদুর নেই দেখছ না?"

—"সিঁদুর তো আইবুড়ো মিয়েদেরও থাকে না। ভাবহু ও বুঝি আইবুড়ো। কপাল পুড়িয়েছে তো নাচানাচি ক্যান লা।" পিসি চিৎকার করে ওঠে।

—"চুপ করো পিসি। পণ্ডিতমশায় মন্তর পড়ছেন।"

পিসি আরও জোরে চেঁচিয়ে ওঠে—"মন্তর পড়ছে তো আমার কি? সেদিন বিধবা হ'লো, আর আজই এমন নাচন? ঢং দেখে আর বাঁচতি ইচ্ছে হয় না। সোয়ামী মরায় য্যান বাঁচেছে। মনে মনে মতলব আছে নাকি—হ্যাঁরে হরে!"

—"পিসি"—হরেকেষ্ট তীব্রভাবে পিসির দিকে তাকায়।

পিসির গলা সপ্তমে চড়ে। কুৎসিত ভংগী করে বলে—"উঃ, ভয় দেখাস? সেদিনের ছাওয়ালের ত্যাজ দেখো না। তোর আঁতুরঘরে আমি রাত জেগেছিলাম রে। ভয় দেখাস কারে —এ্যা?"

—"চুপ কর পিসি।" হরেকেষ্ট তার হাত চেপে ধরে। বিয়ের বাসরের সকলের চোখ পিসির দিকে। পণ্ডিতও মন্ত্র পড়া বন্ধ করেছে।

—"চুপ করব না। দেখি ক্যামনডা চুপ করাতে পারিস। তুই না পারিস তোর বাপকে ডাকে আন। বললিই চুপ করব? মিয়েডার মতলবের কথা বুঝি না? তোরও মতলব আছে।"

জগবন্ধু পণ্ডিত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়ায়। রাগে তার সর্বশরীর কাঁপে। সে বলে—"ফাতু, বেরিয়ে যাও।"

পণ্ডিতের কথা শুনে ফাতু মুহূর্তের জন্যে থমকে যায়, তারপর বলে—"বুড়ো হইয়েছেন বলে কী ভীমরতি ধরিছে? হরেকেষ্টর শালীডা বিধবা, বিয়ের জিনিস ছোঁয়াছুয়ি করছে দেখতি পান না?"

—"বিধবা হয়েছে তো কি হয়েছে?"

পিসি গালে হাত দিয়ে বলে—"ওমা আমি কোনে যাবো, পণ্ডিত বলে কি গো। শাস্তর ভুলিছেন—হ্যাগো পণ্ডিত।"

—"চুপ কর। তুমি চলে যাও এখান থেকে। তোমার কাছে শাস্ত্র শিখতে চাইনে।"

—"রাগছেন ক্যান্। সত্যি কথাডা ক'ন তো দেখি—বিধবা মানষের বিয়ের কাছে অত যাতি হয়?"

—"তোমাদের মত বিধবাদের আসতে নেই। এরা পারে, এদের মধ্যে বিষ নেই।"

—"বিষ নেই?"—ফাতু খলখল ক'রে হেসে বলে—"বিষ দাঁত এখনো বার করেনি গো পণ্ডিত। সময় হলি বার করবি। বিয়েডা হোক তখন দেখতি পাবেন। নিজের বোনডার সব্বোনাশ ক'রে ছাড়বি ওই আবাগির বেটি।"

হরেকেষ্ট চমকে ওঠে, লক্ষ্মী ঘোমটা সরিয়ে তাকায়। নীলু একবার নড়ে চড়ে বসে। পাড়ার সবাই চোখাচোখি করে।

এদিকে ওদিকে চেয়ে তারা উমাকে খোঁজে।

উমা ততক্ষণে রান্নাঘরের এককোণে গিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদছে। অচেনা গ্রামের একদল লোকের মধ্যে বিরাট লজ্জার বোঝা তার মাথায় চাপান হ'য়েছে—সহ্য করা যায় না। যে আনন্দ আর অনুপ্রেরণা নিয়ে সে লক্ষ্মীর বিয়ের জন্যে উঠে পড়ে লেগেছিল, নিমেষে তা অন্তর্হিত হ'লো। সে এর জন্যে প্রস্তুত ছিল না বলে ভেঙে পড়ে।

খুদি তার বিয়ের লাল চেলী প'রে এতক্ষণ লক্ষ্মীর পেছনে গম্ভীর হ'য়ে বসে ছিল। সকলের মুখের দিকে চেয়ে সে আস্তে আস্তে উঠে এসে হরেকেষ্টর পাশে দাড়ায়। সে বুঝতে পারে নন্দর পিসির জন্যে একটা অভাবনীয় কিছু ঘটে গিয়েছে। সারাদিন বাড়ীতে আনন্দের যে ঐক্যতান বাজছিল তার তাল কেটে গিয়েছে সহসা। সে নন্দর পিসিকে দেখিয়ে হরেকেষ্টকে বলে—"ও খুব দুষ্টু। ও চলে যাক্।"

—"হ্যাঁ যাক'—হরেকেষ্ট আপন মনে বলে। সে নিজে সংযম হারিয়ে ফেলছে বুঝতে পারে।

খুদি এগিয়ে ফাতু পিসিকে বলে—"তুমি যাও, চলে যাও।"

—"ক্যান্‌রে ছুঁড়ি, সোয়ামী শিখায় দিল বুঝি।"

—"যাও।" খুদি উত্তেজিত হয়ে নন্দর পিসিকে ধাক্কা দেয়।

ধাক্কা দিয়ে একচুলও তাকে নড়াতে পারে না সে। বরং তাতে পিসি আরও হিংস্র হয়ে ওঠে। সে খুদির গালে সজোরে চপেটাঘাত করে।

খুদি কেঁদে ওঠে।

হরেকেষ্টর ধৈর্যচ্যুতি হয় এতক্ষণে। সে আর সামলাতে

পারে না নিজেকে। খুদির গানের আঘাত যেন তার গালে এসে লাগে। চোখ দুটো মোষের মত লাল হয়ে ওঠে। তার এ চেহারা ফাতুপিসির অজানা নয়। সাগরখালির ধারে গাজনের মেলায় পঞ্চাশজনের সংগে লড়ে হরেকেষ্ট যখন তাদের ঠাণ্ডা করেছিল তখন পিসি তার এ চেহারা দেখেছে। পঞ্চা ডাকাতের মাথা ফাটিয়েছিল যেবার, সেবারও এমন চেহারা হয়েছিল তার। আজ আবার তা দেখে পিসির পা কেঁপে ওঠে, সে ছুটে পালায়। তাকে পালাতে দেখে হরেকেষ্ট তার পেছনে ছোটে। বিয়ের আসর ছত্রভংগ হয়।

জগবন্ধু পণ্ডিত চিৎকার করে ওঠে—"হরেকেষ্ট!" আতংকে তার গলা কাঁপে।

নীলু ছুটে গিয়ে হাত চেপে ধরে বলে—"হরেদা ঠাণ্ডা হও।"

—"ছাড়, ওকে ঠাণ্ডা করব।" নীলুর সবল মুঠো হরেকেষ্টর এক ঝাঁকিতে ছিটকে খসে পড়ে।

পণ্ডিত ততক্ষণে এসে হরেকেষ্টকে জড়িয়ে ধরে বলে—"আমার কথা শুনবি না বাবা?"

বৃদ্ধের কণ্ঠের আকুতি তার মন স্পর্শ করে। সে চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকে—যেন বাহ্যজ্ঞান নেই। সে জানে এভাবে দাঁড়ালে মাথার রক্ত তাড়াতাড়ি নেমে যায়। চোখ দুটো আবার স্বাভাবিক হয়।

বিয়ে শেষ হ'লে লক্ষ্মী চুপি চুপি এসে হরেকেষ্টকে বলে—"দাদা, উমাদিকে পাঠিয়ে দাও।"

—"সে কেমন করে হয়, সেদিনই এলো।"

—"না, আমার কেমন ভয় হচ্ছে। পিসির কথা মিথ্যে নাও হ'তে পারে।"

—"তুইও শেষে একথা বললি ?"

লক্ষ্মী উত্তেজিত হয়ে ওঠে। সে বলে—"বলবই তো। আমরা মেয়ে, মেয়েদের মনের কথা ভাল বুঝি। উমাদি এতদিন আসেনি, আজ বিধবা হয়ে এখানে আসার ঝোঁক হলো কেন ?"

—"সে তো তুই জানিস লক্ষ্মী। পিসির কথায় নাচিস কেন ? পিসির মুখে কি কিছু আটকায় ?"

—"ওসব বর্ডারের গোলমালের কথা বাজে। ওখেনে যেন মানুষ নেই। তোমার শ্বশুরের মতলব আছে দাদা।"

—"অমন করে বলিস না লক্ষ্মী।"

—"না দাদা, আমার ভাল মনে হচ্ছে না। তা ছাড়া এত কাণ্ড হ'লো, এরপর ও এখেনে থাকলে গ্রামে দুর্নাম হবে, তুমি দেখো।"

হরেকেষ্ট চিন্তান্বিত হয়। লক্ষ্মীর শেষ কথাটাকে একেবারে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। সে ভাবতে ভাবতে বাড়ির বাইরে চলে যায়।

লক্ষ্মী নীলুদের বাডি চলে যাওয়ার পরের দিন উমাও এসে বলে—"আমাকে পাঠিয়ে দাও জামাই।"

খুদি পাশে ছিল, বলে ওঠে—"না, আমি তোমার কাছে পড়ব।"

এবারে হংসপুরে আসার পর সে আর বই নিয়ে বসতে পারে নি।

উমা বলে—"জামাইয়ের কাছে শিখিস খুদি।"

—"ও শেখায় না, খালি গরু দেখে।"

হরেকেষ্ট হেসে ফেলে। উমাও হেসে বলে—"নারে, জামাই খুব বিদ্বান। সে বইও পড়ে।"

খুদি চুপ করে থাকে।

হরেকেষ্ট উমাকে বলে—"তুমি যেতে চাও কেন, সেদিন তো এলে। লক্ষ্মী চলে গেল, এখনই তো তোমার থাকা দরকার। তুমি এখেনে থাকবে বলেই লক্ষ্মীর বিয়ে হলো।" লক্ষ্মীর সংগে যে-কথা হয়েছিল হরেকেষ্ট তার উল্লেখ করে না।

—"বদনামের ভয় নেই জামাই?"

—"বদনামের কথা আগে মনে হয় নি?"

—"হয়েছিল।"

—"তবে? লক্ষ্মীর বিয়ের জন্যে তোমার আগ্রহ কম ছিল না।

উমার চোখ সজল হ'য়ে ওঠে। সে বলে—"লক্ষ্মীকে দেখে আমার কষ্ট হ'তো। ওর বিয়ে হ'য়ে যাওয়ায় বড় আনন্দ হ'লো। এখন হংসপুর ছাড়তে আমার তত দুঃখ নেই।"

—"তুমি গেলে আমি একা কি ক'রে পারব?"

—"জানি। কিন্তু কি করব?"

—"কি করবে জানি না, তবে তুমি থাকলে আমি নিশ্চিন্ত হতাম।"

—"আমাকে যেতে দাও জামাই।"

—"আমি তোমাকে আটকে রাখিনি; তোমাকে আসতেও বলিনি।"

—"অমন করে ব'লো না, মেয়েদের চোখে বড় বেশী জল থাকে?"

—"ছেলেদের ? কিছুরই বালাই নেই, তাই না ?"

—"জামাই—"

—"তুমি যাও উমা, কিন্তু ক'দিনের জন্যে এসে আমাকে মুশকিলে ফেলে গেলে।"

উমা মুখ নীচু করে থাকে। কিছুক্ষণ নীরবেই কাটে।

—"কবে যাবে ?" হরেকেষ্ট শেষে বলে।

—"আজকে।"

—"আজই ? আজ যে হাটবার। আমাকে হাটে যেতে হবে। কাল যেও।"

খুদি উমার হাত ধরে বলে—"দিদি থাকবে, আমি বই পড়ব।"

খুদির মাথায় ঘোমটা ছিল। হরেকেষ্ট তার ঘোমটা খুলে দেয়। সে জিভ বার করে তাড়াতাড়ি আবার উঠিয়ে দেবার চেষ্টা করে।

হরেকেষ্ট হেসে তাকে সস্নেহে কাছে টেনে নিয়ে বলে—"অমন করে নিজের পায়ে কুড়োল মারিস না খুদি, তোকে আমিই পড়াবো।"

—"ওকথা বললে কেন জামাই ?" উমা বলে ওঠে।

—"ঠিক কথাই তো বলেছি। আগুন আর ঘি কখনো পাশাপাশি রাখতে হয় ? শাস্তর মানো না ?"

লজ্জায় উমার মুখ লাল হয়ে ওঠে।

হরেকেষ্ট হেসে বলে—"লজ্জা পাচ্ছো কেন ? খুদি এখন ঘি-আগুনের কোনটাই না। ও কিছু বুঝবে না।"

—"মুখ সামলাও জামাই, তোমার মুখ বড় খুলে যাচ্ছে।"

—"তুমি যেটা মনে মনে জানো, আমি সেটা মুখে বলছি।

ছেলেরা যদি না বলে তাহলে সব কথা যে মানুষের পেটের মধ্যে মরে যাবে।”

—“তাই বলে অমন করে বলবে?”

“—বলা ভাল।”

—“জামাই আমাকে অত ছোট ভাব কেন?”

—“তোমাকে ছোট ভাবছি না, আমাকেও বড় ভাবছি না। কিন্তু তোমার মন তো আমি জেনে ফেলেছি। আমার মনও তুমি জানো। এরপরেও কাছাকাছি থাকা কি নিরাপদ? খুদি তোমার বোন আর আমার বউ যে। পিসি আমাদের উপকারই করল।” হরেকেষ্ট দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

উমা কোন কথা বলে না। হরেকেষ্টর জন্য এক অপরিসীম বেদনায় তার ভেতরটা ভারী হয়ে ওঠে। হরেকেষ্ট তাকে উপদেশ দিচ্ছে, না নিজের মনের টুঁটি চেপে ধরছে? তার তবু সান্ত্বনা আছে—সে বিধবা। কিন্তু হরেকেষ্টর সান্ত্বনা কোথায়? সে তো সন্ন্যাসী নয়।

দেশ নাকি স্বাধীন হয়েছে। স্বাধীন হয়েছে বলেই নাকি দেশটা ভাগ হয়েছে। দেশ ভাগ হওয়ায় গংগা মরল, পতিত হালদারের মেয়ে মরল। কিন্তু কই, উন্নতি হয়েছে কই? খুদির মত শিশুকে হরেকেষ্টর মত যুবকের হাতে দেওয়া বন্ধ হবে কবে? তার মত যুবতীকে কি ট্যানা ঘোষের মতো বুড়োর হাতে দেওয়া এখনো চলবে?

সব নাকি বদলে যাবে। কাঁচা রাস্তা বদলে যেমন পাকা হচ্ছে, তেমনি বদলাবে। পাকা রাস্তা অনেকদূর এগিয়ে এসেছে বলে শুনেছে উমা। ছুটে আসছে নাকি। যত তাড়াতাড়ি

সম্ভব বর্ডারে গিয়ে পড়বে রাস্তা। হংসপুর থেকে আর মাত্র তিন মাইল দূরে রয়েছে। দেড় মাস দু'মাসের মধ্যে এসে যাবে— তারপরে এ গ্রামের ওপর দিয়ে চলে যাবে তাদের গ্রামের কাছাকাছি। নতুন রাস্তাই যেন আশার আলো। এই রাস্তাই যেন স্বাধীনতার প্রথম পদাতিক। সব বদলাবে।

ট্যানা ঘোষের দল জব্দ হবে। বাবারা মেয়েদের জীবন নিয়ে খেলা করতে পারবে না। হরেকেষ্টর মত বলিষ্ঠ যুবকদের ভালমানুষ সেজে মন-মরা হয়ে দিন কাটাতে হবে না। উমাদের মত মেয়েদের আর অন্ধকার ঘরে লুকিয়ে মাথা কুটতে হবে না। এত কথা উমাকে কেউ বলে দেয় নি। কিন্তু সে যেন অনুভব করে। কে যেন ভেতর থেকে ডেকে তাকে বলে দেয়। এমন সাজিয়ে হয়তো ভাবতে পারে না; কিন্তু যা ভাবে তার মূলকথা এই। শুধু উমা নয়, অনেকেই ভাবে। যে গ্রামে কেউ আসত না কখনো, সে গ্রামে বড় বড় সরকারী লোক আসে। তাই তাদের মনে হয় দেশ ভাগ হয়ে অসুবিধা হয়েছে বটে, কিন্তু একটা বিরাট কিছু তাদের জন্যে অপেক্ষা করছে।

হরেকেষ্ট কিছুই ভাবে না, অন্ততঃ যা ভাবে সেটা চমকপ্রদ কিছু নয়। তবে সরকারী লোকদের মুখে শুনে আর ভদ্র-লোকদের বাড়ির খবরের কাগজ দেখে তার ধারণা হয়েছে, একটা পরিবর্তন আসছে ঠিকই, তবে তাদের জীবনে কতখানি সেটা ভোগ করে যেতে পারবে বলা কঠিন। দেশ স্বাধীন হবার কথা সেই ছেলেবেলা থেকে শুনে এসেছে সে। দু'চারজন নেতা গ্রামে এসে বক্তৃতাও দিয়ে গিয়েছে এককালে। তারা বলত, স্বাধীন হবার পরদিন থেকেই নাকি রামরাজ্য। কিন্তু হলো কই?

হরেকেষ্ট ঠেকে শিখেছে, যা রটে তার সবটা বটে নয়। তবে ধীরে ধীরে একটা পরিবর্তন হ'লেও হ'তে পারে। সেটা রাস্তা তৈরির কথা শোনার পর থেকে সে বিশ্বাস করতে শুরু করেছে।

উমা চলে গেল। তবে হরেকেষ্টর মনে স্থায়ী ব্যথা রেখে গেল। যাবার আগের রাতে, হরেকেষ্টর পাশে অনেকক্ষণ দাঁড়িয়েছিল সে। ভেবেছিল সে ঘুমোচ্ছে। কিন্তু আসলে হরেকেষ্ট চোখ বুজে পড়েছিল। সে ঠিক করেছিল উমা কথা না বললে সেও বলবে না।

উমাই কথা বলল।

অনেকক্ষণ হরেকেষ্টর দিকে চেয়ে থেকে একসময় বলল—"জামাই ঘুমোলে?"

—"না।"

—"আমি জানতাম তুমি জেগে আছো।"

—"কি করে জানলে?"

—"আজকে কি ঘুম হয়?"

—"আমি জানতাম, তুমি আসবে।" হরেকেষ্ট বলে।

—"রাতের বেলায় আমার ভয় করে জামাই। নিজেকে বিশ্বাস করতে পারিনে। কিন্তু আর কোন্ সময় আসব? খুদি সব সময় কাছে কাছেই থাকে।"

—"সে কি কিছু বোঝে?"

—"না। কিন্তু সে মেয়ে যে। যখন বড় হবে তখন আমাদের এই কাছে আসা-আসির কথা তার মনে হবে। সহজেই মানে বুঝবে।"

সে অনেক সময় নীলুকে বলে—"আমি মরলে এই গাছের গোড়ায় আমাকে পুতে রেখো।"

নীলু বলে—"আমার এখানে এসে বুঝি আর বাঁচতে ইচ্ছে করছে না তোমার।"

—"এখন মরলে বড় সুখ।"

—"তোমাদের এমন অদ্ভুত সুখ হয় কেন? তোমরা বড় স্বার্থপর। শুধু নিজের কথাই ভাবো। তার চেয়ে আমি মরি।"

লক্ষ্মী নীলুর মুখে হাত চাপা দেয়। গম্ভীর হয়ে বলে—"চুপ। আর বলব না।"

—"আচ্ছা।"

—"তোমরা কম বোঝো। গাছটাকে আমার কত ভাল লাগে, তাই বলছিলাম।"

—"কম বুঝি বলে বুঝতে পারিনে এত মরার কথা আসে কি ক'রে।"

—"আনন্দেই তো মরার কথা আসে।"

—"সে আবার কেমন?" নীলুর কথায় বিস্ময়ের রেশ।

—"আহা, মরি মরি।" লক্ষ্মী হাসে। নীলুও জোরে হেসে ওঠে তার ভংগী দেখে। কত সহজে লক্ষ্মী তাকে কথাটা বুঝিয়ে দিল।

—"আমার কথাটা বুঝলে গো কর্তা—"

—"বুঝলাম।"

—"তাহলে রাগ করলে কেন? মরেই যদি যাই, গন্ধরাজ গাছের গোড়াতেই পুঁতো। আমি তো বলছি না যে মরব।"

—"আচ্ছা। কিন্তু কেমন করে—"

—"ও, তুমি ভাবছ আমি কবর দেবার কথা বলছি। না গো, পুড়িয়ে দেহের যে ছাই পাবে, সেই ছাই নিয়ে এসো।"

—"আচ্ছা। আর তুমি একটা কলাগাছের ভেলা তৈরি করে রেখো।"

—"কেন ?" লক্ষ্মী বিস্মিত হয়।

—"তার ওপর তোমাকে বসতে হবে যে !"

—"কেন ?" লক্ষ্মী হাসে।

—"আমি যে তার ওপর শোবো।"

—"কি জন্যে ?" লক্ষ্মী ভ্রূ কুঞ্চিত করে।

—"লক্ষ্মীন্দর হবো যে। ধান কাটি আর ঘর তৈরি করি—একবার ফোঁস করলেই তো হ'য়ে গেল।"

লক্ষ্মীর মুখ গম্ভীর হয়—আর-একটুতেই চোখ ফেটে জল বার হবে। ঘুরিয়ে কথা বলে নীলু তাকে জব্দ করেছে। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়।

নীলু তার হাত চেপে ধরে।

—"না, ছাড়ো,—আমার ভাল লাগে না।"—লক্ষ্মী হাত ছাড়িয়ে নিতে চায়।

—"আমার বুঝি খুব ভাল লাগে।"

—"না লাগুক, ছাড়ো—"

—"রাস্তাটা কিছুদিন পরেই দেখা যাবে লক্ষ্মী। ও গ্রামের জহরালীর বাড়ির কাছে এসে পড়েছে।"

—"ওমা, তাই নাকি ?" লক্ষ্মী আবার বসে পড়ে। "তাহ'লে তো এসে গেল। মাঝখানে একটা মাঠ শুধু।"

—"তাই তো বলছি—" নীলু মনে মনে হাসে। ওষুধ

কাজে লেগেছে।

—"মাঠটা বড় লম্বা। আধক্রোশ হবে, তাই না?" লক্ষ্মী বলে।

—"তা হবে।"

—"মটোর চলতে কতদিন লাগবে?"

—"রাস্তা শেষ হ'লেই চলবে।"

—"আমি প্রথম দিনেই সহরে যাবো কিন্তু।"

—"যদি শীতের সময় শেষ হয় তাহলে?"

—"তাহলেও যাবো।"

—"কেমন করে?"

—"কেমন করে আবার, মটোর করে।" লক্ষ্মী বলে।

—"উঁহু, শীতকালে তোমার যাওয়া হবে না, তখন আমি একা যাবো।"

—"না, আমিও যাবো। বাঃ, তুমি একা যাবে কেন?"

—"তুমি যে তখন যেতে পারবে না লক্ষ্মী।"

—"তুমি পারো, আমি পারিনে?"

—"আমি যে ব্যাটাছেলে।"

—"ব্যাটাছেলে বলে মাথা কিনেছো? তা হবে না, আমি যাবো। মেয়ে হওয়া বুঝি অপরাধ?"

—"ছি ছি, অপরাধ কে বলল?"

—"তুমিই তো বললে।"

—"আমি তো সেকথা বলিনি। আমি বলেছি মেয়ে হয়ে না জন্মালে শীতকালে যেতে পারতে।"

—"কেন, ছেলে হ'য়ে জন্মালে বুঝি যাওয়া যায়।" লক্ষ্মীর

মুখ অভিমানে ভারী হ'য়ে ওঠে।

—"হ্যাঁ লক্ষ্মী। ছেলেদের পেটে যে ছেলে আসে না।" নীলু লক্ষ্মীর গালদুটো দুহাতে চেপে ধরে। লক্ষ্মী লজ্জায় রাঙা হয়ে ওঠে। সে নীলুর দুহাত জোর করে ছাড়াতে চায় কিন্তু পারে না। নীলুটা যেন কি।

তীরের মত ছুটে আসছে রাস্তা। অযথা দিক পরিবর্ত্তনের ইচ্ছে নেই। তাতে সময় আর অর্থ নষ্ট। শুধু দু' জায়গায় একটু বেঁকে গিয়েছে।

কত লোকের বাড়ির ওপর দিয়ে ছুটে আসছে রাস্তা—কত লোকের ক্ষেতকে দ্বিখণ্ডিত করেছে। সরকার ক্ষতিপূরণ হিসেবে টাকা দিয়েছে সবাইকে—এখনো দিচ্ছে। বাস্তুভিটে নষ্ট হয়েছে যাদের, তাদের মন খুঁতখুঁত করে একটু। কিন্তু সেটা সাময়িক। ভিটে ছাড়ার আগেই নতুন ঘর তুলে ফেলেছে। তাছাড়া রাস্তার কথা ভেবে দুঃখটা মনের ভেতরে বেশীক্ষণ দাঁড়াতে পারছে না। ভিটে তো কত কারণেই ছাড়তে হয়। একবার বন্যা হয়েছিল তেরশো তেতাল্লিশ সালে। সেবার শুধু ভিটেই ছাড়তে হয়নি, গ্রামও ছাড়তে হয়েছিল। ফিরে এসে ঘরবাড়ির অস্তিত্ব খুঁজে পাওয়া যায়নি সেবার। আবার নতুন করে ঘর তুলতে হয়েছিল, কত কষ্টে টাকার যোগাড় করে! মহাজনদের সে ধার সাত পুরুষেও শোধ হ'তো না। হক সাহেবের ঋণ-শালিসী বোর্ড হয়েছিল বলেই না, দেশের গরীবরা বেঁচে গেল।

এখন দেশ স্বাধীন হয়েছে বলেই সরকার টাকা দিচ্ছে। সেই

টাকায় নতুন ঘর উঠছে। এক হিসেবে বরং উপকারই হয়েছে—অধিকাংশ ঘরেরই তো জরাজীর্ণ অবস্থা। নতুন বাড়িতে আম গাছ, নারকেল গাছের ছায়াটুকু অবশ্য পাওয়া যাবে না। বাড়ির পাশে ওসব লাগালে তো আর দু'দিনে ধাঁকধাঁক করে বড় হয়ে উঠবে না—সময় লাগবে। কিন্তু যে গাছ বড় হয়ে তাড়াতাড়ি ছায়া দিতে পারে সেরকম গাছ লাগায় সবাই—পেঁপে গাছ, কলা গাছ। তাতে রোদ্দুরটা অন্ততঃ সোজা এসে পড়বে না বাড়ির উঠোনে, তবু একটু ছায়া হবে। অসুবিধে তো একটু হয়ই। কিন্তু সুবিধে যে মস্ত বড়। ঢালাই রাস্তা—চকচক্ করবে মোষের পিঠের মত।

হংসপুরে একদল সরকারী লোক আসে। রাস্তা গ্রামের ওপর দিয়ে কিভাবে যাবে, ঠিক করতে এসেছে এরা। গ্রামের সবাই ভীড় করে। কার কার জমির ওপর দিয়ে রাস্তা যাবে, ঠিক হবে আজ। ফিতে হাতে মাপতে মাপতে দুজন লোক এগিয়ে যায় আর তাদের পেছনে পেছনে প্যাণ্ট-পরা অফিসার।

নীলুর বাগানের সামনে এসে সবাই থামে।

অফিসার বলেন—"বাগানটা কার ?"

—"আমার।" নীলু সামনে এগিয়ে আসে।

—"তোমার বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে রাস্তা। জায়গাটা উঁচু, তাছাড়া ঠিক সোজা পড়ে গিয়েছে।"

নীলু ভাবে, লক্ষ্মী শুনলে তো নাচতে আরম্ভ করবে—কালবাউস মাছ দেখে ছেলেবেলায় যেরকম নাচত। সে ছুটে বাড়ির ভেতরে চলে যায়।

লক্ষ্মী তখন কুয়ো-তলায় বাসন মাজছিল। নীলুকে ছুটে

আসতে দেখে সে প্রশ্ন করে—"কি হ'লো ? মাথা খারাপ ?"

তার কথা নীলুর কানে যায়নি। সে বলে—"মজার খবর লক্ষ্মী। বাবুরা বললেন, রাস্তাটা আমাদের বাগানের মধ্যে দিয়ে যাবে। তাঁরা আছেন এখনো, দেখবে এসো।"

—"তাই নাকি ?" লক্ষ্মী জল দিয়ে তাড়াতাড়ি হাত ধুয়ে কাপড়ে মুছে নিয়ে উঠে পড়ে।

বেড়ার আড়ালে দাঁড়িয়ে সে তাঁদের দেখতে পায়। তারা তখন গন্ধরাজ গাছটার ত্ন'পাশ দিয়ে মেপে চলেছে।

নীলু বলে—"দেখছো ?" তার কথায় আর চাহনীতে উৎসাহ ঝরে পড়ে।

কিন্তু লক্ষ্মীর চোখদুটো নিষ্প্রভ হ'য়ে যায়। সে যেন কেমন ক'রে তাকায় নীলুর দিকে।

—"কি হ'লো ?" নীলু বিস্মিত হয়।

—"গন্ধরাজ গাছটা থাকবে না ?"

—"থাকতেও পারে, নাও থাকতে পারে। ঠিক জানিনে।"

—"তুমি অমন ক'রে ব'লো না। গাছটাকে যে আমি ভালবাসি।"

—"আমার চেয়েও ?"

লক্ষ্মী নীলুর ঠাট্টা শুনতে পায় না। তার মনে ঝড় উঠেছে। সে বলে—"জিজ্ঞাসা করে দেখো না, গাছটা থাকবে কিনা ?"

—"মাথা খারাপ তোমার ? অতবড় রাস্তা হচ্ছে। তা না, গাছের জন্যে ভাবনা।"

—"তোমার পায়ে পড়ি, ওদের জিজ্ঞাসা ক'রে এসো।"

অগত্যা নীলু যায়। গিয়ে শোনে রাস্তার ঠিক মাঝখানে

পড়েছে বলে গাছটাকে কাটতে হবে। সংকুচিত হ'য়ে সে যখন অফিসারকে প্রশ্ন করল যে গাছটা রাখা সম্ভব কিনা, তখন তিনি হেসে উঠলেন—যেন তামাশা করছে নীলু। সে আর বেশী কিছু বলতে ভরসা পেলো না পাছে তিনি রাগ করে রাস্তাটাকে ঘুরিয়ে অন্যদিক দিয়ে নিয়ে যান। বাড়ির ভেতরে বসে মোটরগাড়ি দেখা যাবে না তাহলে।

লক্ষ্মীকে গিয়ে বলতে সে মুখ ভার করে। নীলুরও মন কেমন করে। কতদিনের গাছ—গন্ধরাজ গাছের অত মোটা গোড়া দেখা যায় না।

নীলু লক্ষ্মীকে প্রবোধ দিতে চেষ্টা করে। সে বলে—"কত লোকের বাস্তুভিটে গেল, তারা দুঃখ পেলো না। তুমি একটি সামান্য গাছের জন্য মন খারাপ ক'রো না।"

লক্ষ্মী কথা বলে না।

নীলু বলে—"গাছটাকে তুলে নিয়ে অন্য জায়গায় লাগানো যাবে।"

—"অতবড় গাছ তুলে লাগালে বাঁচে বুঝি—তুমি জানো না?"

—"নারকেল গাছ বাঁচে, এটা বাঁচবে না?"

—"বড় নারকেল গাছ বাঁচে না।"

—"দেখো, এটা বাঁচবে।"

লক্ষ্মীর বিশ্বাস হয় না। সে বলে—"ভেবেছিলাম রাস্তা হ'লে কত আনন্দ করব। কিছুই হ'লো না।"

—"কেন?"

—"মনে হবে, আমার গন্ধরাজকে মেরে ফেলে তার বুকের দিয়ে রাস্তা তৈরি হ'য়েছে। রাস্তায় গিয়ে দাঁড়াতে আমার

কান্না পাবে।"

—"তুমি একেবারে পাগল। আমি ঠিক ওটাকে তুলে আনব, দেখো।"

নীলুর কথায় সে ভরসা পেলো বলে মনে হ'লো না। ধীরে ধীরে আবার কুয়োতলায় গিয়ে ব'সে বাসনগুলো টেনে নেয়।

হরেকেষ্ট আর পারে না একা একা। খুদির জন্যে তার ভাবনা নয়। সে বরং হরেকেষ্টকে সাহায্য করে—নিপুণভাবে অনেক কাজ করে যা তার মত বয়সে সম্ভব নয়। লক্ষ্মীর সব কাজ সে লক্ষ্য করত। তাই হরেকেষ্ট দুধের কলসী নিয়ে যখন দুধ ঢালার কথা তখন দাওয়ার ওপর কলসীগুলোকে ঠিক দেখতে পায়। দুধ দিয়ে ফিরে আসার সংগে সংগে কলসীগুলোকে জল দিয়ে ধুয়ে খুদি উনোনের ধোঁয়ার সামনে রেখে দেয়। সে জানে ভালভাবে ধোঁয়া না লাগলে পরের দিনের দুধ ছানা কেটে গিয়ে নষ্ট হ'তে পারে। তার কাজকর্ম হরেকেষ্টর মনে বিস্ময় জাগায়।

মুশকিল হয় প্রাণকেষ্টকে নিয়ে। মনে হয়, বর্ষাকাল আর পার হবে না। এখন প্রাণকেষ্ট উঠতে পারে না বললেই হয়। মাঝে মাঝে ছেলের কাঁধে ভর দিয়ে বাইরে আসে বটে, কিন্তু সে সামান্য সময়ের জন্যে। কাশি সুরু হ'লে বসে থাকা সম্ভব হয় না আর।

এত কষ্টেও হরেকেষ্ট লক্ষ্মীকে আনেনি, আসতে চাইলেও বাধা দিয়েছে।

তবু লক্ষ্মী রোজই একবার করে আসে। কিছুক্ষণ বাবার

কাছে বসে। সংসারের টুকটাক কাজকর্ম করে দিয়ে যায়। নীলুও অবসর মত মাঝে মাঝে এসে হরেকেষ্টর বাইরের কাজের ভার কিছু লাঘব ক'রে দিয়ে যায়। তার মা ফেলীকেও হরেকেষ্ট অনেকদিন দুপুরে দেখেছে প্রাণকেষ্টর ঘর থেকে চোখ মুছতে মুছতে বার হ'য়ে আসতে। ফেলী কখন আসে আর কখন যায় সে টের পায় না। বাড়ি ফেরার সময় কচিৎ কখনো তার সামনে পড়ে গেলে চোখের জলের কারণ দেখিয়ে বলে—"তোর বাপকে দেখলি, চোখে জল আসে। আমারও অমন হবি কিনা কেডা জানে।"

—"তোমার কেন হবে?"

—"হতি পারে। কত পাপ করিছি, তার কি ঠিক-ঠিকানা আছে।"

পাপের কথা শুনে হরেকেষ্ট নীলুর মায়ের মুখের দিকে তাকায়। তার কি ধারণা প্রাণকেষ্ট পাপের প্রায়শ্চিত্ত করছে? মায়ের সংগে কথা বন্ধ করাকে তার বাবা কখনো পাপ বলে মনে করেনি। প্রাণকেষ্ট সমাজের প্রতি নিষ্ঠাবান। সেই নিষ্ঠা হয়তো কড়াভাবে প্রকাশ পেয়েছিল।

কিন্তু হরেকেষ্ট বুঝতে পারে না, নীলুর মা কী এমন পাপ করেছে, যার জন্যে তার এত উদ্বেগ। কথাটা সম্ভবতঃ ভেবে বলেনি সে। সকলের মত তারও ধারণা মানুষ প্রতি পদে পাপ করে যায়—যার জন্যে এক অজানা পাপ বোধ মনকে সব সময় ভারাক্রান্ত করে রাখে। ফলে, কথায় কথায় সংকোচ, কথায় কথায় লজ্জা আর কথায় কথায় কুসংস্কার।

নীলুর সেই ছোট্ট গল্পটার কথা মনে পড়ে হরেকেষ্টর। গল্পটা

সুন্দর। শ্রীমন্ত ডাক্তারের কাছে শুনেছিল নীলু। সেই গল্প বলে নিশিথগঞ্জের বাবুদের বাড়ির ছোটবাবু আনন্দ রায়কে সেদিন ঘায়েল ক'রে দিয়ে এসেছিল সে। সে পারেও বটে। বি. এ. পাশ ছেলের সামনে দাঁড়িয়ে তর্ক করার মত সাহস শুধু তারই আছে। সেদিন কেন জানি নীলুই দুধ দিতে গিয়েছিল নিশিথ-গঞ্জের বাবুদের বাড়ি। ফিরে এসে ঘাড় থেকে বাঁক নামিয়ে হাসতে সুরু করেছিল।

—"কিরে, হাসিস কেন?" হরেকেষ্টর কৌতূহল হয়েছিল।

—"মজা হয়েছে হরেদা—"

মজাটা হ'লো এই যে, আনন্দ রায়ের বাড়ি দুধ নিয়ে যেতেই তিনি বলে উঠলেন যে হরেকেষ্টর দুধ আর নেবেন না। অন্য লোক ঠিক করবেন তিনি। শুনে নীলু বিস্মিত হয়েছিল। সে না-নেবার কারণ জিজ্ঞাসা করায়, বাবু বললেন যে দুধে বড় বেশী জল মেশানো হচ্ছে। বর্ষাকালে দুধ একটু পাতলা হয়, বাবু তা জানেন না। নীলু বোঝাতে চেষ্টা করলেও তিনি কোন কথা শুনতে চাননি।

আনন্দবাবু বললেন—"সত্যি কথা বল তো, জল মেশাও না?"

রোদে ঘুরে ঘুরে নীলুর মাথাটাও চড়া ছিল। সে ফস্ ক'রে বলে ফেলে—"জল না মেশালে আমাদের ধর্ম থাকে না বাবু।"

—"সে কি?" আনন্দ রায় উল্টো কথা শুনে থ' হ'য়ে গেলেন।

নীলু বলেছিল—"আমরা যদি ভগবানের শপথ নিয়ে বলি যে খাঁটি দুধ, তবু আপনাদের বিশ্বাস করা উচিত নয়।"

—"কেন?"

"জানবেন, খাঁটি দুধেও জল আছে। একটা দুব্বো ঘাসের ডগায় যতটুকু জল থাকে অন্ততঃ ততটুকু। জলের মধ্যে ঘাসটা ডুবিয়ে একফোঁটা জল ফেলে দিই খাঁটি দুধে।"

—"সবাই তাই দেয়?"

—"হ্যাঁ।" নীলু ভাল মানুষের মত নিশ্চিন্তে ঘাড় নাড়ে। সোনামুখী গরুটার ঘন দুধ খেয়ে খেয়ে বাবুদের জিভের স্বাদ বদলে গিয়েছে। অন্য গরুর দুধ আর পছন্দ হয় না। সোনামুখীর দুধ আজকাল খুদি, প্রাণকেষ্ট কিংবা লক্ষ্মী খায়। প্রাণকেষ্ট রুগী, খুদি শিশু আর লক্ষ্মী মা হ'তে চলেছে। তাছাড়া, প্রাণকেষ্টর অন্য গরুর দুধ আর ভাল লাগে না।

—"এতে তোমাদের পাপ হয় জানো?" আনন্দবাবু বলেছিলেন।

—"আজ্ঞে না।"

—"এখন থেকে জেনে রেখো—পাপ হয়।"

—"আমরা তো জানি এটা ধর্ম। এতে পাপ নেই।"

—"তোমরা জানলেই তো হবে না। না জেনে পাপ করেছ তোমরা, আর মনে মনে ভাবছ খুব ধর্ম করছ।"

—"যদি জানি পাপ করছি না, তাহলে কি ক'রে পাপ হয়?"

বাবু রেগে উঠেছিলেন—"খুব বেশী বুঝতে শিখেছো, না? হংসপুরের পাঠশালা তোমাদের মাথা খেয়েছে—বড় বড় কথা বলতে শিখেছো শুধু। মনে রেখো, যে-লোক পাঠশালা খুলেছিল, সেই জগবন্ধু আমাদের কাছারীর খাজাঞ্চি ছিল। হিসেব ঠিক রাখতে পারত না বলে, বাবা তাড়িয়ে দিয়েছিলেন।"

মনে মনে নীলু ভীষণ চটে যায়। কিন্তু বাইরে সেটা প্রকাশ

করে না। সে বিনীতভাবে শ্রীমন্ত ডাক্তারের কাছে শোনা গল্পটা বলেছিল। সেই কসাইয়ের গল্প—দাড়িপাল্লায় শালগ্রামশিলা চাপিয়ে যে মাংস ওজন করত। একদিন এক নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণ অমন সুলক্ষণ শিলাটার দুর্গতি দেখে বলেছিল কসাইকে—"শালগ্রামশিলা দিয়ে মাংস মাপছিস? তোর যে নরকেও স্থান হবে না রে।"

—"তাতে কি হ'লো ঠাকুরমশায়?" কসাই অবাক হয়। নিজের ব্যবসায়ের মধ্যে ভগবানকে রেখেছে—এতে ভাল হবে বলেই তার ধারণা ছিল এতদিন।

—"রক্ত মাংসের মধ্যে ঠাকুরকে রেখেছিস? তোর কাণ্ডজ্ঞান নেই? ঠাকুর যে হাঁপিয়ে উঠেছেন। পবিত্র জায়গায় স্থাপন ক'রে পুজো করা দরকার।"

—"পুজো তো আমি করি।"

—"তুই পুজো করিস? হায় ভগবান! কখন করিস?"

—"কেন, বাড়ি ফিরে ধুয়ে মুছে পুজো করি।"

—"আরে রামো রামো। তুই যে মরবি। পশু হত্যায় পাপ তো রয়েইছে, তার ওপর আবার শালগ্রামশিলা নিয়ে ঠাট্টা? দে, আমাকে দে—দে বলছি! ব্রাহ্মণ হয়ে এ আমি দেখতে পারব না।"

কসাই ভাবে, ঠাকুরমশায়ের কাছে থাকলে যখন ভালভাবে পুজো হবে তখন তাঁর কাছেই থাক। সে বাটখারা দিয়ে কাজ চালিয়ে নেবে। ব্রাহ্মণকে সে শিলাটি দিয়ে দেয়।

পরদিন ভোর না হ'তেই কসাই তার দোকান খুলে বসে। মন তার খারাপ। কেমন যেন ফাঁকা ফাকা লাগে শালগ্রামশিলা

না থাকার জন্যে। কতদিন ধরে পুজো করার অভ্যাস। সে অন্যমনস্ক হ'য়ে সামনে তাকিয়ে ছিল এমন সময় দেখল ব্রাহ্মণ ছুটতে ছুটতে এসে হাজির—হাতে শিলা। কসাই আনন্দে লাফিয়ে উঠে শিলাটাকে নিয়ে বুকে চেপে ধরে। ব্রাহ্মণ রাতে স্বপ্ন দেখেছে যে শালগ্রামশিলা ক্রুদ্ধ হয়েছেন। তিনি কসাইয়ের কাছে ফিরে যেতে চান। সরল কসাই তাঁকে ভক্তি করে। সে তার কাজকে পাপ বলে মনে করে না। তাই তার কাজ পাপ নয়। শিলা তার কাছেই থাকতে চান। ব্রাহ্মণের মত কুটবুদ্ধির লোকের মন্দির তাঁর পছন্দ নয়। ব্রাহ্মণের মনে পাপ-বোধ বেশী।

নীলুর গল্প শেষ হ'লে আনন্দ রায় কিছু বলতে পারেন নি। ধীরে ধীরে চলে যাচ্ছিলেন।

নীলু বলেছিল—"কাল থেকে তাহলে আসব না বাবু?"

—"আসবে না কেন, এসো।"

আনন্দ রায়ের মুখের অবস্থা দেখে তার খুব হাসি পেয়েছিল সে বলেছিল—"আপনি বিশ্বাস করেন নি, তাই গল্পটা বললাম বাবু। দুধে আমরা সত্যিই জল মেশাইনে। বর্ষাকাল বলে দুধ একটু পাতলাই হয়। গরু জোলো জিনিস বেশী খায়। সব দুধই এমন দেখবেন। তাছাড়া যে গরুর দুধ আপনাদের জন্যে আনা হতো সে দুধ কিছুদিন দিতে পারব না।"

সেই নীলুর মা হ'য়ে ফেলী নিজেকে কি ক'রে পাপী ভাবল হরেকেষ্ট বুঝতে পারে না। নিজেকে পাপী ভাবার সংগে সংগে সেই পাপের প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধেও একটা ধারণা করে নেয় এই জাতীয় মানুষ। এদের মনে শান্তি নেই—একেবারে নেই। সব সময়ই আতংক। নীলুর মায়ের ওপর হরেকেষ্টর অনুকম্পা হয়।

শত কাজের মধ্যেও হরেকেষ্ট কিছুদিন হলো খুদিকে নিয়ে নিয়মিত পড়াতে বসে। মাথা যখন রয়েছে, তখন মূর্খ হয়ে থাকবে কেন? পড়ুক যতটুকু পারে।

আগ্রহভরে খুদি পড়ে। জানবার একটা তীব্র আকাংখা রয়েছে তার মধ্যে। হরেকেষ্ট সামান্য একটু বলে দিতেই সে ধরে নেয়। কাউকে পড়াতে যে এত আনন্দ হয়, হরেকেষ্ট জানত না। পণ্ডিতমশায়কে দেখেছে পড়াতে গিয়ে মেজাজ তার সপ্তমে উঠেছে। ভাল ছাত্র পেলে তারও হয়তো আনন্দ হ'তো। নীলুকে পড়িয়ে পণ্ডিত সে আনন্দ পেয়েছে নিশ্চয়।

'বর্ণ-বোধ' প্রায় শেষ হ'য়ে এলো খুদির। হরেকেষ্ট ভাবে বর্ণবোধের পর বর্ণপরিচয় প্রথম ভাগখানাও একবার তাড়াতাড়ি পড়িয়ে নিতে হবে। তার শেষের দিকে অনেক গল্প আছে। তারপরে দ্বিতীয় ভাগে হাত দেওয়া যাবে।

খুদি আজকাল বলে, উমার চেয়ে হরেকেষ্টই ভাল পড়ায়, পড়াতে পড়াতে কত গল্প করে সে। উমা শুধু ধমক দেয়। শুনে হরেকেষ্ট হাসে।

—"তুই কবে বড় হবি রে খুদি—" একদিন পড়াতে বসে হরেকেষ্ট প্রশ্ন করে।

—"দ্বিতীয় ভাগ শেষ হলেই তো বড় হবো।"

—"তাই নাকি? তাহলে দ্বিতীয় ভাগ শেষ কর তাড়াতাড়ি।"

—"তুমি পড়াও।"

খুদির পিঠে হাত রেখে সে বলে—"পড়াবো রে পড়াবো।

কত কাজ দেখিস না? বেশী পড়াতে পারি না।"

কাজ যে বেশী, সে কথা খুদিও বোঝে। দেখে তো সব। হরেকেষ্ট হঠাৎ বলে—"তোর দিদি দেখতে ভাল, না তুই দেখতে ভাল বো?"

—"দিদিকে দেখতে খুব ভাল।"

—"কেন?"

—"দিদি যে বড়।"

তার জবাবে হরেকেষ্ট বোবা হ'য়ে যায়। কেন খুদি একথা বলল সে বুঝতে পারে না। তবে কি উমার কথাই ঠিক। এখন থেকেই একটা অস্পষ্ট ধারণা গড়ে ওঠে মেয়েদের মনে? তাই যদি হয়ে থাকে, তাহলে তো বড় হয়ে খুদি তাকে শ্রদ্ধা করতে পারবে না। ভাবতে কষ্ট হয় তার। সে বলে—"বড় হলে বুঝি দেখতে ভাল হয়?"

—"হয়। এ'ত বড় চুল হয়। সুন্দর শাড়ি পরে। কানে দুল থাকে।"

—"তোকে আমি দুল কিনে দেবো, শাড়ি কিনে দেবো।"

—"যাঃ, দুল পরতে নেই ছোটদের, কান ছিঁড়ে যায়।"

—"কে বলল?"

—"মা বলেছে, বড় হ'লে দুল পরতে হয়।"

খুদির কোথায় দুঃখ এতক্ষণে হরেকেষ্ট উপলব্ধি করে। সে বলে—"আমি পাতলা দেখে সুন্দর একটা দুল কিনে দেবো তোকে। কান ছিঁড়বে না।"

আনন্দে খুদির মুখ উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তবু তার আসল দুঃখ ছোট চুলের কথা হরেকেষ্টকে বলতে বাকী রাখে না।

সে জানে, বড় হ'তে চাইলেই বড় হওয়া যায় না। তার ছোট মনে এমন কত দুঃখ আর কত আকাংখা রয়েছে কে জানে। হরেকেষ্ট সে সমস্তের খবর রাখে না, যেমন খুদি খবর রাখে না তার মনের।

লক্ষ্মীর চুল-বাঁধার আয়নাটা দাওয়ার একটা বাঁশে ঝুলছিল। হরেকেষ্টর চোখ পড়ে তাতে। সে সেটা নামিয়ে আনে, খুদিকে দেবে বলে। লক্ষ্মীর আর প্রয়োজন হবে না—নতুন আয়না পেয়েছে সে। আয়নাটা নামাতে গিয়ে নিজের মুখ তার মধ্যে ভেসে ওঠে। কতদিন দেখেনি ভাল করে, চেয়ে চেয়ে দেখে হরেকেষ্ট। পরিবর্তন অনেক হয়েছে। হঠাৎ থুতনীর নীচে তার দৃষ্টি থেমে যায়। সেখানে তিনটে দাড়িতে পাক ধরেছে। মুখ রক্তশূন্য হ'য়ে যায় তার। স্পষ্ট মনে পড়ে নন্দ একবার দুটো দাড়ি পাকা দেখেছিল—এই ক' মাসেই আব একটা বেড়েছে। খুদির হাতে না দিয়ে আয়নাটা আবাব যথাস্থানে রেখে দেয় হবেকেষ্ট। মাঝে মাঝে মুখখানা দেখতে হবে।

সেদিন বিকেলে হরেকেষ্ট একমনে সোনামুখীব দুধ দোহাচ্ছিল। সোনামুখীকে দুদিন হ'লো কুকুবে কামড়েছে—একটা পা বেশ জখম হয়েছে বলে চড়তে যেতে পারছে না। তাই দিনের সমস্ত কাজ শেষ করে হরেকেষ্ট তার দুধ দোহায়। রাত্রে বাছুরকে মায়ের পাশেই থাকতে দেয়। শুধু দুপুরের কয়েক ঘণ্টা একটু আটকে রাখে। সোনামুখীর দুধ বেশী হয় না বলে এখন লক্ষ্মী আর খুদি অন্য দুধ খাচ্ছে। কিন্তু প্রাণকেষ্ট অন্য দুধ মুখে তুলতে

চায় না। সোনামুখীর দুধই শুধু তার পছন্দ। বটের আঠার মত দরদরে ঘন দুধ—এক বলকেই পুরু সর পড়ে। সোনামুখীর আগে তার মায়ের দুধও প্রাণকেষ্ট মাঝে মাঝে খেতো—তার নাম ছিল চাঁদকপালী। ছোটুখাট্টো গরু, দুধ বেশী দিত না। কিন্তু যেটুকু দিত—অমৃত। ছোট গরু রেখে সুবিধে আছে। খুচ্চেক খেতে দিতে হয় না। মাঠে চড়েই পেট ভরিয়ে ফেলে। সোনামুখী কিন্তু মায়ের মত ছোট হয়নি।

সেই কবে, সরকার ইউনিয়ন বোর্ডকে একবার ষাঁড় দিয়েছিল, তারপর থেকে দেশের গরুর জাত বদলে গিয়েছে। ছোট গরু কটাই বা দেখা যায় আজকাল। ইউনিয়ন বোর্ডের সেই ষাঁড় কবে মরে গিয়েছে, কিন্তু তার সন্তান-সন্ততি সবই বাপ-ঘেঁষা। ফলে চাঁদকপালী যেমন ছিল, তেমনিটি ঝাঁপিপুর মত গরু আর দেখা যায় না বড় একটা।

হরেকেষ্ট একমনে দুধ দুইয়ে চলছিল। তাই নীলু ছুটতে ছুটতে এসে তার পাশে দাঁড়ালেও সে খেয়াল করল না। অমন কত সময়ই সে আসে, কাজের শেষে কথা হয়।

সোনামুখীর বাঁটের দুধ তার দুই হাঁটুর মধ্যে চেপে ধরা পাত্রটির ভেতরে তীরের মত এসে পড়ছিল। সে তন্ময় হ'য়ে তাই দেখছিল। ধীরে ধীরে ফেনায় ভর্তি হয়ে ওঠে পাত্রটা। রোজ দেখেও আশ মেটে না।

নীলুর মুখে রক্ত ছিল না একবিন্দু, তার চোখে নিদারুণ আতংক—মাথার চুল উসকো-খুসকো। সে হরেকেষ্টকে ধাক্কা দেয়—"হরেদা"—তার গলার স্বর আর্তনাদের মত শোনায়।

—"কিরে!" চমকে ওঠে হরেকেষ্ট।

—"সর্বনাশ হয়েছে হরেদা !"

হরেকেষ্ট পাত্রটা মাটিতে রেখে উঠে দাঁড়ায়—"কি হয়েছে রে নীলু, অমন করছিস কেন ?"

নীলু কেঁদে বলে—"কি হবে হরেদা ?"

দুহাতে তাকে কাছে টেনে নিয়ে হরেকেষ্ট বলে—"কি হয়েছে বল্ আমাকে, বলবি তো ! তুই অমন করছিস কেন ?"

—"লক্ষ্মী কেমন করছে।"

—"এঁ্যা"—হরেকেষ্ট ছোটে। ওই কথাটুকুই যথেষ্ট। আর কিছু শোনার প্রয়োজন নেই তার। দুধের পাত্র সেখানেই পড়ে থাকে, সোনামুখীর পায়ের ধাক্কায় সেটা সম্পূর্ণ উল্টে সব দুধ পড়ে যায়।

হরেকেষ্ট দৌড়ায় আর তার পেছনে নীলু।

—"কি হয়েছে লক্ষ্মীর ?

নতুন একটা লাল-পাড় শাড়ি কিনে দিয়েছিল নীলু লক্ষ্মীকে। একদিন মাত্র সে পরেছে—কাল। আজ স্নান সেরে উঠোনের একপাশে শাড়িখানাকে মেলে দিয়েছিল। কাজের ব্যস্ততার মধ্যেও সেটার দিকে তার বরাবর নজর ছিল।

বাড়িতে কাউকে আসতে দেখেনি লক্ষ্মী। কিন্তু শাড়ি শুকোলে তুলতে গিয়ে দেখে পাড়ের একটা অংশ কাটা। চিৎকার করে উঠেছিল সে। বুঝতে পেরেছিল তার সর্বনাশ করার জন্যে কোন ডাইনী কেটে নিয়ে গিয়েছে সেটুকু। তুক্‌তাক ওরকম কতলোক করে—কতলোকের সর্বনাশ হয় তাতে। ডাইনী নিশ্চয় ইতিমধ্যে টের পেয়ে গিয়েছে যে তার পেটে ছেলে এসেছে। সেই সন্তানকে মেরে ফেলে নিজের কিংবা আর কারও ছেলেকে

বাঁচাতে চায় সে। ভেবে লক্ষ্মীর হাত-পা ঠাণ্ডা হয়ে যায়। ডাইনী তার ছেলে নেবে? তার ছেলে বাঁচবে না? না বাঁচলে শাশুড়ী কি ভাববে? নীলুর কত কষ্ট হবে।

লক্ষ্মী ডুকরে কেঁদে উঠেছিল।

তারপর থেকে কান্না আর থামছে না।

হরেকেষ্ট গিয়েও তাঁকে কাঁদতে দেখল। তার পাশে বসল সে। পিঠে হাত দিয়ে কত ডাকল, কিন্তু সাড়া দিল না—শুধু কাঁদে। এই প্রথম লক্ষ্মী তার দাদার ডাকে সাড়া না দিয়ে থাকল।

ঘণ্টাখানেক পরে তার কান্না থামল। কিন্তু সে প্রলাপ বকতে বকতে সারা উঠোনময় ছোটাছুটি সুরু করে—ধরে রাখা গেল না।

ওঝা ডাকা হয়। সে বলে—"পরীতে ভর করেছে।"

অনেকক্ষণ ঝাড়ফুক্ আর মন্ত্র পড়েও উন্নতির লক্ষণ দেখা গেল না। প্রলাপ বরং আরও বেড়ে চলে।

ওঝা বলল—"পরী বড় তেজী। আমার ওস্তাদকে ডাকতি হবি।"

ওস্তাদ থাকে পাঁচ ক্রোশ দূরে বর্ডারের ওপারে। সেখানে যাওয়া অসম্ভব। কাউকে পাঠালেও সে ওস্তাদকে নিয়ে ফিরে আসতে আসতে এদিকে ভালমন্দ একটা কিছু হয়ে যাবে। হরেকেষ্ট হতাশ হয়ে বসে পড়ে। লক্ষ্মীর দাপাদাপি ক্রমেই বেড়ে চলে। সে তার দেহে কাপড়টুকু পর্যন্ত রাখতে চাইছে না, নীলু আর তার মা কোনরকমে চেপে ধরে রাখে তাকে।

লক্ষ্মী চেঁচায়—"আমার ছেলেকে খাবি? খা—খা—ছাই খা।"

—"লক্ষ্মী, থাম বোন।" হরেকেষ্টর স্বর করুণ।

—"আস্পর্ধা! আবার বড় বড় চোখ ক'রে তাকিয়ে আছিস? চোখ গেলে দেবো, হ্যাঁ। শিক্ গরম ক'রে ঢুকিয়ে দেবো ওই ড্যাবড়েবে চোখে।"

সে চিৎকার করতে করতে মাঝে মাঝে ক্লান্ত হ'য়ে এলিয়ে পড়ে ফেলীর কোলের ওপর। হরেকেষ্ট ভাবে এইবার বোধহয় ভাল হ'য়ে যাবে, আর বোধহয় চিৎকার করবে না। কিন্তু কিছুক্ষণ নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে থেকে আবার চিৎকার করে ওঠে, আবার স্থরু হয় প্রলাপ আর ছটফটানি। তার দিকে তাকাতে পারে না হরেকেষ্ট। অমন শান্তশিষ্ট চেহারার একি পরিবর্তন! অসহনীয় যন্ত্রণায় বুকের ভেতরটা মোচড় দিতে থাকে তার।

নীলু বলে—"হরেদা, আর যে পারিনে। শ্রীমন্ত ডাক্তারকে একবার ডাকো।"

তাই তো। কথাটা তার মাথায় একেবারে আসেনি। মনের ভেতরে শুধু ওস্তাদ ওঝার কথা ঘুরপাক খাচ্ছিল। সে ছোটে তখনই ডাক্তারের কাছে। ডাক্তারের বাড়িও কম দূরে নয়—এক মাইল। তবু অনেক কাছে।

সে যেন বেঁচে গেল ডাক্তারকে ডাকতে গিয়ে। কিছুক্ষণ অন্ততঃ দৃশ্যটা দেখতে হবে না। তার বোন লক্ষ্মী—এ কি সেই লক্ষ্মী!

পথে ছুটতে ছুটতে নীলুর কথা মনে হয় তার। পাথরের মত বসে রয়েছে সে লক্ষ্মীকে ধরে। চোখে জল নেই একবিন্দু—মুখে কথা নেই। শুধু মুখখানাকে মাঝে মাঝে বিকৃত করছে, যখন অসহ্য হ'য়ে উঠছে লক্ষ্মীর কষ্ট।

শ্রীমন্ত ডাক্তার আসেন। খবর পেয়ে বুড়ো পণ্ডিতও আসে। পাড়ার দু-চারজন আগেই জমা হ'য়েছিল।

শ্রীমন্ত ডাক্তর একটা ইনজেকশন দিয়ে বলেন—"ঘুমিয়ে পড়ার ইনজেকসান দিলাম। ঘুমোলে ভাল হ'তে পারে।"

সত্যিই লক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়ে—ডাক্তার চলে যাবার আগেই। যাবার সময় ডাক্তার বলেন—"রাতে দরকার হ'লে আমাকে ডেকো। তবে দরকার বোধহয় হবে না। সারা রাতই ঘুমোবে।"

জগবন্ধু পণ্ডিত নীলুর গায়ে হাত রেখে বলে—"ভাবিস না নীলু, সব ঠিক হয়ে যাবে।"

নীলু একটু নিশ্চিন্ত বোধ করে। এতক্ষণ শরীর আর মনের ওপর দিকে কম ধকলটা গেল না তার।

গ্রামের যারা জড়ো হয়েছিল তারাও সবাই স্বস্তির নিশ্বাস ফেলে। লক্ষ্মী আর নীলুর ওপর সবারই টান।

ঝড়ের পরে যেমন একটা শান্ত ভাব বিরাজ করে চারদিকে, বহুলোক থাকা সত্ত্বেও নীলুর বাড়ির অবস্থাও এখন সেরকম। এরই মধ্যে বল্লাইয়ের বাবা অবিনাশ হঠাৎ বলে বসে—"আমি তখনই সন্দ করিছিলাম, ক্ষেতি না করি ছাড়বি না।"

সবাই চমকে ওঠে একথা শুনে। সবার চোখ অবিনাশের দিকে। সবার চোখে তীব্র কৌতূহল।

—"কি সব বলছ অবিনাশ!" পণ্ডিতের ঘোলাটে চোখ তীক্ষ্ণ হয়ে ওঠে। তার মুখে বিরক্তি।

—আপনিও বোঝেন নাই, পণ্ডিতমশায়? আমি বলতিছি ফাতুর কথা। বিয়ের দিনের কথা মনে নাই?"

অবিনাশের কথা কানে ঢুকতেই হরেকেষ্টর শরীরের সমস্ত

পেশী শক্ত হ'য়ে ওঠে। মাথা কেমন ঘুরতে থাকে। সে দৃঢ়ভাবে মাটির ওপর দাঁড়ায়। অবিনাশের কথায় সবকিছু জলের মত পরিষ্কার হ'য়ে গিয়েছে তার কাছে। ও ডাইনী সব পারে। ধীরে ধীরে হরেকেষ্ট স'রে পড়তে চায় সেখান থেকে। প্রতিশোধ নেবে সে।

—"হরেকেষ্ট!" জগবন্ধু পণ্ডিতের গম্ভীর ডাক শোনে সে। পাঠশালায় যেন সে পড়া বলতে পারে নি, আর পণ্ডিত এগিয়ে আসতে বলছে বেত মারার জন্যে।

বুড়ো বয়সেও পণ্ডিতের ভুল হয়নি। অবিনাশের কথা শেষ হতেই সে হরেকেষ্টর দিকে নজর রেখেছিল। সে জানত যে এবারে হরেকেষ্ট একটা কিছু করবে। সোজা চলে যাবে ফাতুর বাড়িতে। আর সেখানে সে যেতে পারলে যে দুর্ঘটনা ঘটবে, হংসপুরে আগে তা কখনো ঘটেনি।

পণ্ডিতের ডাকে হরেকেষ্ট ফিরে তাকায়।

—"যাস্‌নে বল্‌ছি। শোন্‌"।—তার গলায় সেকালের দৃঢ়তা। এই দৃঢ়তা ছিল বলে আনন্দ রায়ের বাবার সামান্য গালাগালি সহ্য না করে, চাকরী ছেড়ে দিয়ে এসেছিল পণ্ডিত। এ দৃঢ়তা এখন লুপ্ত হ'য়েছে—রামের জন্যে আর অর্থ কষ্টে। তবু মাঝে মাঝে তার আভাষ পাওয়া যায় এখনো।

হরেকেষ্ট থেমে যায়। পণ্ডিত লাঠিতে ভর দিয়ে ঠক্‌ঠক্‌ করতে করতে এগিয়ে আসে তার কাছে। তার চোখে চোখ রেখে বলে—"লেখাপড়া খুব বেশী শিখিস নি। আমিও শেখাতে পারিনি। কিন্তু কুসংস্কার গুলো যাতে কাটিয়ে উঠতে পারিস তোরা সে চেষ্টা করেছিলাম"।

হরেকেষ্ট নীরব।

—"অবিনাশের কথা শুনে ক্ষেপে গেলি? জানতাম, বলাই এর বুদ্ধি নেই কিন্তু সেও তোর চেয়ে বুদ্ধিমান। তার বাপের মত নদীর ধারে রাতের বেলায় স্কন্ধকাটা ভূত দেখে না সে। বরং বাপের কথা শুনে হাসে"।

—"পণ্ডিত মশায়"—হরেকেষ্ট কি যেন বলতে চায়।

—"কোন কথা শুনবো না। একথা তুই বিশ্বাস করিস? এক টুক্‌রো কাপড়ের পাড় কেটে নিয়ে অন্যের ক্ষতি ক'রে, নিজের সুবিধে করা অত সহজ না রে। ফাতু যদি অতই পারত, নিজের বৈধব্যও ঠেকিয়ে রাখতে পারত। তার ভাইপো নন্দরও এ-দুর্গতি হতো না।"

হরেকেষ্ট কোন কথা বলে না। সে নিস্তেজ হ'য়ে পড়ে। তার মাংশপেশী শিথিল হ'য়ে যায়। দুটো হাত দুদিকে ঝুলে পড়ে। চোখদুটো নিষ্প্রভ দেখায়। ছেলে বেলায় পণ্ডিতকে হয় তো ততটা সুনজরে দেখেনি, কিন্তু বড় হ'য়ে বুঝতে শিখেছে পণ্ডিত গ্রামের একমাত্র মানুষ যে কিছু জানে।

সেই পণ্ডিত যখন বলেছে তুক্ তাক্ সত্যি নয়, ওটা কুসংস্কার, তখন কথাটা হয় তো ঠিকই। হরেকেষ্ট দাঁড়িয়ে থাকে নিশ্চল হ'য়ে।

সকলে চলে যায়। লক্ষ্মী শান্ত হ'য়ে ঘুমোচ্ছে—এই হ'লো আসল লক্ষ্মী।

হরেকেষ্টও এক সময় বাড়ীর দিকে চলে। সেখানে প্রাণকেষ্ট বিছানায় প'ড়ে রয়েছে। সোনামুখীর দুধ আজ আর খাওয়া হ'লো না তার। খুদি আছে। তাকে খেতে দিতে হবে।

তার কপালে আর আজ রাত্তিরে ভাত নেই। দুটো চিড়ে ভিজিয়ে দেবে তাকে।

হরেকেষ্ট চলে যাবার পর নীলুর মা উঠে পড়ে। বলে—"তোকে দুটো ভাতে-সেদ্ধ ফুটায় দি—"

—"থাক্‌গে মা।"

—"এখনি হইয়ে যাবি।"

নীলু প্রতিবাদ করে না। কথা বলতে ইচ্ছে হয় না তার। শরীর আর মন ভেঙে পড়েছে এই কয়েক ঘণ্টাতেই।

লক্ষ্মী ঘুমোচ্ছে। রোজ যেমন ঘুমোয়, তেমনি নিশ্চিন্তে, নির্ভয়ে যেন তার কিছুই হয় নি। মুখে কোন দুর্ভাবনার ছাপ নেই। এক সময় মুখে হাসির রেখাও ফুটে ওঠে—স্বপ্ন দেখছে বোধহয়। সু-স্বপ্ন, নীলু এক ভাবে চেয়ে থাকে।

দাওয়া থেকে ঘরে নিয়ে যেতে হবে লক্ষ্মীকে। আকাশে মেঘ জমেছে—বৃষ্টি হ'তে পারে। একা অনায়াসেই তুলে নিয়ে যেতে পারে নীলু। কিন্তু ভয় হয়, পাছে ঘুম ভেঙে যায় লক্ষ্মীর, ঘুম ভাঙলে যদি আবার আগের মত সুরু করে।

কিন্তু না নিয়ে গেলেও উপায় নেই। বৃষ্টি এলে ভিজে যাবে। বাচ্চা ছেলেদের ঘুমন্ত অবস্থায় তোলার মত, লক্ষ্মীকে তুলে নিয়ে সে ঘরে শুইয়ে দেয়।

ছেলেকে খেতে ডাকতে এসে নীলুর মা অবাক হয়। দাওয়ায় কাউকে দেখতে পায় না সে।

—"ওমা, তোরা ঘরে গেলি নাকি নীলু।"

—"হ্যাঁ।"

নীলুর মা তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকে বলে—"ঘুম ভাঙায়ে আনলি ?"

—"না।"

—"তুলে আনলি ? পারলি ? ধন্যি বাবা—"

মায়ের কথা শুনে নীলুর একটু লজ্জা হলো। যদিও সেটা লজ্জার সময় নয—সে অবসরও নেই।

সে বলে—"তুমি একটু বস মা। আমি খেয়ে আসছি।"

—"তাই যা—"

রাত্রে লক্ষ্মীর পাশে বসে থাকতে থাকতে নীলু কখন ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ একটা বিদঘুটে চিৎকার শুনে সে চমকে জেগে ওঠে। চিৎকার করল কে ? লক্ষ্মী তো নয়—সে তেমনি ঘুমোচ্ছে। ঘুমের মধ্যে কোন দুঃস্বপ্ন দেখেনি তো ? খোলা জানলা দিয়ে নীলু একবার বাইরে তাকায়। সেখানে ঘুটঘুটে অন্ধকার। কোথাও কোন শব্দ নেই। একবার শুধু নারকেল গাছের একটা শুকনো ডাল খসে পড়ার আওয়াজ কানে এলো।

নীলু কিছুক্ষণ জেগে আবার ঢুলতে থাকে। আবার সেই চিৎকার। এবারে স্পষ্ট। পেছনে বাগানের মধ্যে যেখানে গন্ধরাজ গাছটা আছে ঠিক সেখানে। মনের ভেতরে কেঁপে ওঠে তার। এমন বিকট চিৎকার সে জীবনে কখনো শোনেনি—কারও গলায় দা দিয়ে কোপ বসালে, সেই আহত গলা নিয়ে মৃত্যুর পূর্বের আর্ত চিৎকারের মত। আড়াই পোঁচে খাসীর গলা কাটার সময়, সেই কাটা গলা দিয়ে যেরকম শব্দ বার হয়, ঠিক সেরকম চিৎকার।

দ্বিতীয় চিৎকারের পর লক্ষ্মী চোখ বড় বড় করে উঠে বসে। তার চোখ দেখে মনে হয় সে প্রকৃতিস্থ নয়।

—"শুয়ে পড় লক্ষ্মী।"

—"কে, কে অমন শব্দ করল?"

—"শেয়ালের ঝগড়া।"

—"না না, ওরা আমার ছেলে নিতে আসছে। আমি দেবো না, কিছুতেই দেবো না।"—লক্ষ্মী তার পেট চেপে ধরে অজ্ঞান হ'য়ে যায়।

অজ্ঞান অবস্থায় এপাশে ওপাশে মাথা নাড়ায় সে। কিছুতেই মাথাটাকে স্থিরভাবে বালিশের ওপর রাখতে পারে না। নীলু মাকে ডাকে। লক্ষ্মীর পাশে তাকে বসিয়ে রেখে শ্রীমন্ত ডাক্তারের বাড়িতে ছোটে।

ডাক্তার এসে বলেন—"কঠিন রোগ। ম্যানেনজাইটিস।"

—"কি ক'রে ভাল হবে ডাক্তারবাবু?" নীলুর চোখে এতক্ষণ পরে জল দেখা দেয়। সে পরাস্ত।

ডাক্তার বাড়ি থেকে ইনজেকসান আনিয়ে লক্ষ্মীকে দেন। মাথায় শুধু ঠাণ্ডা জল দিতে বলেন। ওষুধ অন্য কাউকে দিয়ে পাঠিয়ে দেবেন বলে তিনি চলে যান। যাবার সময় বলে যান, সকাল হলেই আসবেন।

বালতি বালতি জল কুয়ো থেকে তুলে লক্ষ্মীর মাথায় ঢালা হয়।

রাত ভোর হ'য়ে আসছিল। অন্ধকার কাটেনি তখনো। নীলুর মা দুবার বমি ক'রে ঘরের মধ্যেই শুয়ে পড়েছে। বসে থাকার সামর্থ তার নেই। সামান্য অনিদ্রাও তার সহ্য হয় না।

খ্যাপা ঘোষ তার স্বাস্থ্য ভাল রাখার মতো খাবার জুটোতে পারেনি—টাকা জুটিয়ে শুধু বিয়েই করেছিল।

নীলু একা বসে লক্ষ্মীর মাথায় জল ঢেলে চলে। চারিদিকে নিস্তব্ধ। শুধু জল ঢালার শব্দ আর লক্ষ্মীর কাতরানি। ঘরের চালে একটা ইঁদুরও কি যেন কেটে চলেছে প্রাণপণে!

আবার সেই বিকট শব্দ। এবারে ঠিক নীলুর পেছনের খোলা জানলাটার কাছে। জানলায় মুখ লাগিয়ে কে যেন আওয়াজ করল। নীলুর হাত থেকে জলসমেত ঘটিটা খসে মাটিতে পড়ে। লক্ষ্মী বড় বড় চোখ ক'রে জানলার দিকে তাকায়। তার মুখ থেকে ফেনা বার হ'তে থাকে। হাত দুটো আর পা একবার সজোরে শূন্যে ছুড়ে দেয় সে—তারপরই অসার হয়ে পড়ে। শুধু তার চোখ দুটো তাকিয়ে থাকে জানলার দিকে। সে চাহনি বড় বড় অথচ ভাবলেশহীন।

নীলু চিৎকার ক'রে লক্ষ্মীকে ডাকে। তাকে গায়ের জোরে নাড়া দেয়। কিন্তু সে নীরব।

ডুকরে কেঁদে ওঠে নীলু—"ওমা, মা—দেখ না। ও কি শেষ হয়ে গেল ?"

ফেলী তবু ঘুমে বেঘোর। মাকে ঠেলে তোলে নীলু—"ওমা, ও অমন ক'রে আছে কেন।"

—"কি রকম ক'রে আছে, এঁ্যা ? এঁ্যা ? কি বলতিছিস ? ও নীলু, ব—ল। থামলি ক্যান্, এঁ্যা।"—ফেলী তাড়াতাড়ি উঠে লক্ষ্মীর কাছে ছুটে আসে।

—"বৌমা, ও বৌমা—লক্ষ্মী—।" ফেলী জোরে ঠেলা দিতে থাকে। কোন সাড়া শব্দ নেই—"ওরে নীলু, বৌমা আর

নেই রে—আমার বৌমা নেই।"

নীলু ছোটে শ্রীমন্ত ডাক্তারের কাছে—

লক্ষ্মী সত্যিই ম'রেছিল। ম'রে যাবার পরও তার ঘাড় জানলার দিকে তেমনি ফেরানো ছিল—চোখদুটো তেমনি খোলা। সেই ভাবেই শক্ত হ'য়ে গিয়েছিল সে। তার ঘাড় সোজা ক'রে দেয় নি নীলু। চোখদুটোকে বুজিয়ে দেয় নি। তার মনে ক্ষীণ আশা ছিল, হয় তো তখনো লক্ষ্মী তাকিয়ে রয়েছে। ওই চোখে আবার জীবনের চিহ্ন ফুটে উঠবে—আবার কথা বলবে সে।

আতংকে মরেছে সে। কিন্তু কিসের আতংক? যারই আতংকে হোক না কেন, নীলু তাকে উড়িয়ে দিতে পারে না মিথ্যে বলে। চোখে না দেখলেও কানকে অবিশ্বাস করতে পারে না সে।

হরেকেষ্ট ভেবেছিল প্রাণকেষ্ট শোনার পর হয়তো এক মুহূর্তও বাঁচবে না। তবু খবরটা দেওয়া উচিত। লক্ষ্মী গেল, বাবাও যাবে। সব যাবে।

কিন্তু আশ্চর্য, প্রাণকেষ্ট একটু কাঁদল না, বা আক্ষেপ করল না। বিছানায় শুয়ে স্থির হয়ে শুনল হরেকেষ্টর কথা। তার দেহে যেন প্রাণ নেই। অনেকক্ষণ পরে বিড়বিড় ক'রে আপন মনেই বলে—"গেলি? যা—আমিও যাবো।"

নীলু কেমন স্তব্ধ হ'য়ে গিয়েছে। লক্ষ্মীর চিতাভস্ম নিয়ে এসে

সযত্নে গন্ধরাজ গাছের গোড়ায় পুঁতে রাখে। তারপর থেকে, প্রায় সব সময়ই সেখানে বসে থাকে। কাজ কর্ম বন্ধ। খাওয়া-দাওয়াও প্রায় বন্ধ।

ফেলী কাঁদতে কাঁদতে এসে কথাটা প্রাণকেষ্টকে বলে। প্রাণকেষ্ট শুনে কেমন ক'রে যেন হেসে ওঠে। সে বলে—"নীলুর জন্যে দুঃখ হয়। ওকে অনেকদিন বাঁচতে হবে যে—"

—"করি কি এখন, কও।"—ফেলীর প্রশ্নে উৎকণ্ঠা।

—"তুই ভাবিস না ফেলী, সব ঠিক হ'হে যাবি।"—প্রাণকেষ্ট বহুদিন পরে ফেলীকে 'তুই' বলে সম্বোধন করে।

—"কিন্তুক কাজকর্ম না করলি খাবো কি—"

প্রাণকেষ্ট আবার হাসে। ভাবে, মেয়েরা বড় স্বার্থপর। সে বলে,—"এ বাড়িতে খাবি দুজনা। হরেকেষ্ট একা পারে না। তুই কাজকর্ম কর।"

ফেলী প্রাণকেষ্টর শীর্ণ চেহারার দিকে একবার তাকায়। কয়েকদিন সে আসতে পারে নি। আজ ভাল ভাবে দেখে চমকে ওঠে। বুঝতে পারে। আর বেশী দিন নেই। সময় ঘনিয়ে এসেছে। টুপ্ ক'রে একদিন আলো নিভে গেলেই হ'লো। এ নিভে যাওয়ায় আলোড়ন নেই—হৈ চৈ নেই। তেল-ফুরোনো-নিভে-যাওয়া।

জীবনে ফেলীর প্রথম বাঁচতে সাধ হ'য়েছিল নীলুর সংগে লক্ষীর বিয়ে দিয়ে। তার আগে কোনদিন বাঁচার ইচ্ছে ছিল না। তবে মরতে ভয় পেতো নীলুর কথা ভেবে। কিন্তু ভগবান ফেলীর সাধ পূরণ করলেন না—তাকে চিরকাল কষ্টই দিলেন। সে ভেবে পায় না মৃত্যুর পরে লক্ষীর মাকে গিয়ে কি

কৈফিয়ৎ দেবে। অমন তাজা মেয়েটা বিয়ের পরে কেন মরল।

প্রাণকেষ্টর মুখের দিকে চায় ফেলী। সে-মুখে এতটুকু অশান্তি বা দুঃখের লেশ নেই। একটা প্রশান্ত ভাব বিরাজ করছে সেখানে।

সে কেঁদে ফেলে "তুমি আমাকে শাস্তি দিচ্ছ ক্যান্।"

—"না দিই নি।"

—"দিয়েছো, এখনো দিচ্ছ। আমাকে তুাম স্বার্থপর ভাবো। নিয়ে চল সাথে ক'রে। তুমি অমন ড্যাডাং ড্যাডাং ক'রে চললে, আমার যাতি সাধ হয় না? তুমি ভোলানাথ হ'য়ে থাকবা আর যত জ্বালা বুঝি আমার। না তা হবি না। আমাকে নিয়ে যাতি হবি—

—"চুপ কর ফেলী। তুইও যাবি। ভাবিস ক্যান?"

—"কবে যাবো?"

—"তুদিন আগে আর পরে। এক সংগেও যাতি পারি। আমি শিগ্‌গির মরব না। না, মরনেও যাতি নেই; ভালই আছি।"

ফেলী অবাক হ'য়ে প্রাণকেষ্টর মুখের দিকে চায়।

রাস্তা এগিয়ে আসছে।

বুদ্ধিমান লোকের মনে এখন থেকেই সন্দেহ দেখা দিচ্ছে। তারা ভাবে কি আর এমন সুবিধে হবে! ছোট খাটো গোলমাল হয়তো অনেকটা বন্ধ হবে। কিন্তু চোরাই-চালান কি থেমে যাবে? দেশ সুরক্ষিত করার মানে চোরাই-চালান বন্ধও

বোঝায়। সব দিকে নিশ্চিন্ত হওয়া মানেই হ'লো আসল সুরক্ষিত হওয়া। আনন্দ বাবুরা এখন থেকেই বলা বলি করছেন চোরা কারবারের এতে নাকি সুবিধাই হবে। এখন মাল পাচার হয় গরুর গাড়ি বোঝাই হয়ে, তখন যাবে লরীতে ক'রে। এখন সহর থেকে বর্ডারে আসতে অনেক সময় লাগে, আর রাস্তা শেষ হ'লে লরীতে ক'রে এক ঘণ্টার মধ্যে চোরাই মাল পৌঁছে যাবে সেখানে।

হরেকেষ্টর মনেও সংশয় জাগে। শ্বশুরের গ্রামের পেট্রল লীডারের সংগে একদিন দেখা হ'লো নিশিথগঞ্জের বটতলায়। এই লোকটাই নন্দদের বাড়িতে প্রথম ক্যাম্প খুলেছিল। কথায় কথায় আনন্দবাবুর সন্দেহের কথা সে বলে পেট্রল-লীডারকে।

"লোকটি বলে—"আনন্দবাবু ভুল বলেন নি। কিন্তু সে সব বন্ধেরও ব্যবস্থা আছে।"

—"কি ব্যবস্থা।"

—"পাকা রাস্তার ওপর মাঝে মাঝে চেক-পোষ্ট থাকবে।"

—"সে আবার কি।"—হরেকেষ্ট প্রথম জানল কথাটা।

—"রাস্তার ওপরে গাড়ি থামানোর ব্যবস্থা থাকে। দু' চারজন কর্মচারী সেখানে সব সময় ডিউটি দেয়। রাস্তা দিয়ে যত গাড়ি যায় সব তল্লাসী ক'রে তবে ছাড়ে তারা।"

—"খুব ভাল ব্যবস্থা! তাহলে অত সন্দেহ "থাকা উচিত না।"

—"সন্দেহ তবু থাকে হরেকেষ্ট। পৃথিবীটা দিন দিন যেমন জটিল হচ্ছে, তেমনি লোকেদের চরিত্রও আর আগের মত সরল নেই। চেক-পোষ্ট থাকলেই যে চোরাই-চালান বন্ধ হবে সেকথা

হলফ করে বলা যায় না।"

—"কেন?"

—"লরীর মধ্যে আপত্তি-জনক কিছু পেলেও, চেক পোষ্টের লোকেরা পয়সা নিয়ে তা ছেড়ে দিতে পারে।"

—"ও, তাই তো। তাহ'লে?"—হরেকেষ্ট দমে যায়। এতটা কল্পনা করেনি সে।

—"কর্মচারীর সততার ওপর সেটা নির্ভর করে। তার জন্যে গভর্ণমেণ্ট রাস্তা তৈরী বন্ধ রাখতে পারে না। পাকা রাস্তার অনেক সুবিধে।"

—"ওসব অন্যায় বন্ধ করা যায় না?"

—"চেষ্টা চলে। আপত্তিজনক জিনিসে লরী বোঝাই ক'রে বড় কর্তারা নিজেরাই মাঝে মাঝে পরীক্ষা করতে পারেন, তাঁদের অধীনস্থ কর্মচারীদের।"

—"হ্যাঁ, তা ঠিক।"

—"দেশের সবলোক যখন তোমার মত হবে, তখনই সব অন্যায় একেবারে বন্ধ হবে। কিন্তু আসলে কি জানো, অনেকেই তোমার মত থাকে প্রথমে, তারপর সংস্পর্শদোষে, প্রলোভনে প'ড়ে বদলে যায়। যাতে সেরকম বদলে না যায় তার যদি কোন ব্যবস্থা হয় কোনদিন, তবেই সমস্যার সমাধান।"

পেট্রল-লীডারের কথায় হরেকেষ্ট বুঝল, রাস্তা তৈরী হলেই স্বর্গরাজ্য হবে না। ভেতরে অনেক গলদ। তবে সে গলদ হয়তো কোনদিন কাটিয়ে ওঠা যাবে। তবু পাকা রাস্তার অনেক সুবিধে। আনন্দবাবুর একটা কথা হরেকেষ্টর মনে সব চাইতে বেশী দাগ কেটেছিল।—খারাপ রুগীকে সদর হাসপাতালে নিয়ে

গিয়ে চিকিৎসা করানো যাবে। বড় বড় ডাক্তার দেখানো যাবে। রাস্তা তৈরি থাকলে লক্ষ্মীকেও নিয়ে যাওয়া যেত। সে তাহলে অকালে তাদের ছেড়ে না গিয়ে, সুস্থ হ'য়ে উঠত। তার কোলে আসত একটা ফুটফুটে ছেলে। কত আনন্দ হ'তো লক্ষ্মীর আর নীলুর।—হরেকেষ্টর চোখের পাতা ভিজে ওঠে।

পণ্ডিতের কথাই ঠিক। সব কুসংস্কার। ওঝা-টোঝা সব বাজে। শ্রীমন্ত ডাক্তারের একটা ইনজেকসনেই লক্ষ্মী ঘুমিয়ে পড়েছিল। সদরে নিয়ে গেলে আরও ভাল ডাক্তার দেখত তাকে, আরও ভাল ওষুধ পেত সে। সুস্থ হ'য়ে উঠত নিশ্চয়।

নীলু গন্ধরাজ গাছের নীচে বসে থাকে। ফেলী তার ভাত নিয়ে যায় হরেকেষ্টর বাড়ি থেকে। নীলু গাছতলাতেই বসে খায়। ছেলের অবস্থা দেখে তার মা কেঁদে বলে—"তুই কি আমাকে পাগল ক'রে ছাড়বি বাবা?"

—"না মা, আমার ভয় করছে—খুব ভয়।"

—"কিসের ভয় রে?"

—"ওই যে দেখা যাচ্ছে—" সে আঙুল দিয়ে সামনে দেখায়, যেখানে রাস্তার কাজ হচ্ছে।

—"ওটা তো রাস্তা।"

—"হ্যাঁ, এগিয়ে আসছে। কোথাও নাকি বেঁকে যায়নি একটুও। একেবারে সোজা আসছে। শুধু সরযেডিহির মসজিদের কাছে আর আলামপুরের ষষ্ঠীতলার কাছে একটু বেঁকেছে।

—"তাতে তোর কি বাবা।"

—"এই গন্ধরাজ থাকবে না মা।"

—"সে তো তুই জানিস।"

—"তাই ভয় পাচ্ছি। আমি দেবো না—কিছুতেই না।"

"কি দিবি না!" ফেলীর কথায় বিস্ময়।

—"এই গাছ কাটতে দেবো না।" সে গাছের গোড়ায় হাত রেখে বলে— "এখেনে লক্ষ্মী আছে।"

ফেলী আঁচলে চোখ চেপে ধরে চলে যায়। সে কিছুই বুঝে উঠতে পারে না শেষে কি নীলুকেও হারাতে হবে? সে হরেকেষ্টর কাছে যায়।

বিরাট সরীসৃপের মত হাঁ ক'রে এগিয়ে আসছে রাস্তা। সামনে যা পড়ছে সব গিলছে। খাবে, খাবে—সব খাবে। কিছু বাকী থাকবে না। নীলু চমকে উঠে গন্ধরাজ গাছটাকে দু'হাতে চেপে ধরে।

ফেলীর কাছে খবর পেয়ে হরেকেষ্ট ছুটে আসে। নীলুর পাশে গিয়ে বসে বলে—"অমন করিস না ভাই। গাছ তো ওরা কাটবেই।"

—"আমি কিছুতেই কাটতে দেবো না।"

—"তা হয় না রে পাগল, এখন আর বন্ধ করা যায় না।"

—"কেন?"

—"কত আগে থেকে ওরা মেপে গিয়েছে তা তো তুই জানিস। তুই রাজী আছিস বলে কাগজে নাম সই করেছিস।"

—"হরেদা, তাহলে কি হবে?" ভয়ার্ত অসহায় স্বর নীলুর।

—"গাছের গোড়ায় যা আছে, সেটা অন্য কোথাও পুঁতে ফেল্।" কথাটা বলতে হরেকেষ্টর গলা ধরে যায়।

—"গাছটা ?"

—"ওটা তো ওরা কেটেই ফেলবে।"

—"না না, তা হবে না—কিছুতেই না।" নীলু চিৎকার ক'রে ওঠে।

—"তোকে আর একটা গন্ধরাজ গাছ এনে দেবো। এতবড় গাছ তুলে নিয়ে লাগালে তো বাঁচবে না। এর বয়স হয়েছে ঢের।"

—"বাঁচলেও তুলব না, এখেনেই থাকবে।"

হরেকষ্ট নিরাশ হ'য়ে চলে যায়।

অবশেষে দিন এলো। গাছ কাটতে লোক আসে। নীলু গাছের গোড়ায় বসে থাকে; কিছুতেই ওঠে না। অবিনাশ এসে অনুরোধ করে, কিছু হয় না।

জগবন্ধু পণ্ডিত বাদে গ্রামের সবাই এসে জড়ো হয়। বুড়ো বয়সের পেটখারাপে পণ্ডিত শয্যা নিয়েছে।

হরেকেষ্ট রাস্তার বাবুদের কাছে বলে—"সামান্য একটু ঘুরিয়ে নেন না রাস্তাটা।"

—"তা হয় না। শেষ সময়ে আর বদলান যায় না। তাছাড়া ঘুরোতে হলে অনেক খরচ। দেখছো না—" তারা দুই পাশের নীচু জমি দেখিয়ে দেয়, যেখানে নীলু ঘট কচুর গাছ লাগিয়েছে। ওখান দিয়ে রাস্তা করতে হলে অনেক মাটির প্রয়োজন। আর সে মাটি শক্তভাবে না বসলে, তার ওপর দিয়ে রাস্তা তৈরি

নিরাপদ নয়।

হরেকেষ্ট চুপ করে থাকে।

—"উঠে যাও এখান থেকে—" একজন বাবু বলে ওঠেন নীলুকে।

—"না।"

—"তোমার জন্যে কাজ বন্ধ রাখা যায় না"

—"রাখতে বলছি না।"

—"জোর করে সরিয়ে দেবো। সেটা ভাল হবে?"

নীলু কথা বলে না। সে দুই হাতে গাছটাকে শক্ত ক'রে জড়িয়ে ধরে।

শেষে গ্রামের লোকের ধৈর্যচ্যুতি ঘটে। নীলুর এই অদ্ভুত আচরণে তারা বিরক্ত হ'য়ে ওঠে। বউ যেন আর কারও মরে না। অতই যখন ঢ়্ তখন আর একটা বিয়ে করলেই তো হয়। ওসব কোথায় উড়ে যাবে! শরীর আবার হৃষ্টপুষ্ট হ'য়ে উঠবে, মুখে হাসি দেখা দেবে। বউ মরেছে, তাতে হয়েছে কি?

সকলে মিলে নীলুকে হিড়হিড় ক'রে টানতে টানতে নিয়ে আসে গাছের গোড়া থেকে। নীলু ঘুষি চালায়, চার-পাঁচজন জখম হয় তার ঘুষিতে। হরেকেষ্ট দূরে দাঁড়িয়ে দেখছিল; নীলু যার জন্য এমন করছে সে তো তারই বোন লক্ষ্মী। কত ভালবাসে নীলু তাকে। এমন মানুষের বউ হ'য়েও বেশিদিন বাঁচার সৌভাগ্য হ'লো না তার। সে বড় হতভাগী।

নীলুকে বেঁধে ফেলা হয়। না বেঁধে উপায় ছিল না। সে একেবারে মরিয়া।

হরেকেষ্ট সেখান থেকে পালায়। নীলুর মুখের দিকে তাকিয়ে

থাকতে পারে না সে। যাবার সময় গন্ধরাজ গাছের গোড়ায় মজুরদের কুড়োলের প্রথম কোপের শব্দ শুনতে পায়, আর সেই সংগে নীলুর আর্তচিৎকার।

কতটুকুই বা গাছ। হাজার মোটা হলে শাল-সেগুন তো নয়। হরেকেষ্ট বাড়িতে এসে পৌছানোর আগে শেষ হয়ে গিয়েছে নিশ্চয়। মন তার ছটফট করে। বাড়িতে বেশীক্ষণ বসতে পারে না। বাপের কাতরানি শোনে ঘরের মধ্যে। গিয়ে দেখে খুদি প্রাণকেষ্টর মাথায় হাত বুলিয়ে দিচ্ছে। খুদি বলেই ব্যাটার বউয়ের সেবা পেলো তবু প্রাণকেষ্ট।

খুদি হরেকেষ্টকে দেখতে পাবার আগেই ঘর থেকে পা টিপে টিপে বাইরে চ'লে আসে সে। এখন আর দেখা করবে না।

আবার নীলুদের বাড়িতে উপস্থিত হয় সে। কে যেন টেনে নিয়ে যাচ্ছে তাকে। লক্ষ্মী টানছে হয়তো। তার আত্মা গুমরে কাঁদছে নীলুর তুরবস্থা দেখে। হরেকেষ্টকে যেন বলছে—তুমি থাকতে ওর এত কষ্ট দাদা। দাদা, তুমিও দেখলে না—শুধু পালিয়ে বেড়াচ্ছো।

নীলুদের বাড়ির উঠোনে পা দিতেই ফেলী ছুটে আসে তাকে দেখতে পেয়ে। কিন্তু একেবারে কাছে আসার আগেই মুখ থুবড়ে প'ড়ে গিয়ে অজ্ঞান হ'য়ে যায়। তার মাথাটা নিজের কোলের ওপর তুলে নিতে বলাই এসে বলে—"হরেদা, নীলু পালিয়েছে।"

—"সেকি! তোরা না বেঁধে রেখেছিলি তাকে?"

—"আমি বাঁধিনি। আমি খুলে দিয়েছিলাম। ওকে বেঁধে রাখতে দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল।"

—"ভালই করেছিস বলাই, তুই যে ওর বন্ধু।" হরেকেষ্ট

দীর্ঘশ্বাস ফেলে।

—"এখন কি করব হরেদা ?"

—"কোন্‌দিকে গেলো ?"

—"জংগলের মধ্যে দিয়ে ছুটল, কোথায় গেল জানিনে।"

—"তুই কাকির মাথায় একটু জল দে, আমি দেখছি।"

হরেকেষ্ট দৌড়োয়। জংগল শেষ হতেই মাঠ। মাঠের ভেতরে রাস্তা দুভাগ হ'য়ে গিয়েছে। একটানা সোজা চলে গিয়েছে তার শ্বশুরবাড়ির গ্রামে, আর একটা ডাইনে ঘুরে গিয়েছে সাগরখালি নদীর দিকে, যেখানে শ্মশান। দুটো রাস্তা ধরেই নীলু যেতে পারে। আরও দুটো রাস্তা রয়েছে—একটা বাঁশ বনের পাশ দিয়ে মা শীতলার ঠাঁই-এর কাছে গিয়ে পড়েছে। আর একটা বলহরি সরকারের পানের বরোজের ধার দিয়ে জংগলের মধ্যে হারিয়ে গিয়েছে।

হরেকেষ্ট দিশেহারা হয়। কোথায় খুঁজবে নীলুকে ?

কি ভেবে সে সোজা চলে তার শ্বশুরের গ্রামের দিকে। কেন যেন তার ধারণা হ'লো নীলু বর্ডারে যাবে—সে দেশত্যাগী হবে। নিশিথগঞ্জের বটতলা পার হ'য়ে মাঠ। মাঠের মধ্যে দিয়ে গরুর গাড়ির চাকার রাস্তা চলে গিয়েছে। হরেকেষ্ট ছোটে সেই রাস্তা ধরে।

আকাশে মেঘ জমেছে। বৃষ্টি হ'তে পারে। ভাদ্র মাস আজ দু-তিন দিন হ'লো শেষ হয়েছে। হরেকেষ্ট ভাবে, এই তো সেদিন বৃষ্টি সুরু হ'লো। প্রাণকেষ্টর হাঁপানী বাড়াতে লক্ষ্মীর কত দুশ্চিন্তা। সে বলে বসল, এখন বিয়ে করবে না। শুনে নীলুর মুখ শুকিয়ে গিয়েছিল। তারপর বিয়ে হ'লো, পেটে ছেলে এলো

লক্ষ্মীর—সব শেষও হ'য়ে গেল। হংসপুর গ্রামের একখণ্ড ইতিহাস লুপ্ত হ'লো চিরকালের জন্যে।

এসবের জন্যে দায়ী উমা। উমা না এলে বিয়ে হ'তো না অত তাড়াতাড়ি। আর তখন বিয়ে না হ'লে হয়তো এসব কিছুই ঘটতো না। রাগ করে তাই লক্ষ্মীর মৃত্যু সংবাদ উমাকে জানায় নি হরেকেষ্ট।

নিশিথগঞ্জ পার হ'য়ে মাঠের প্রায় প্রান্তে এসে পরে হরেকেষ্ট। আর কিছুদূর গেলেই আবার গ্রাম আরম্ভ। বিপরীত দিক থেকে একটা গরুর গাড়ি আসছিল—সে সেটাকে পাশ কাটাতেই গাড়ির ভেতর থেকে তার নাম ধরে কে যেন ডাকে। সে চমকে ওঠে। খুব পরিচিত গলা। কিন্তু তা হবে কি করে? সে তো মরে গিয়েছে।

হরেকেষ্ট থমকে দাঁড়ায়। পেছন ফিরে দেখে গাড়ির ভেতরে দুটি প্রাণী বসে রয়েছে—সামনের দিকে একজন পুরুষ আর একেবারে পেছনে অবগুণ্ঠিতা একটি বধূ। জমকালো শাড়ি দেখে নতুন বউ বলেই মনে হয়।

গাড়ি থেমে গিয়েছিল তার অপেক্ষায়। সে সামনে এসে দেখে নন্দ বসে রয়েছে সেখানে। বিস্ময়ে হতবাক হয় হরেকেষ্ট। মুখ দিয়ে কথা বার হয় না। এমনকি কেন যে দৌড়োচ্ছে তাও ভুলে যায় মুহূর্তের জন্যে। নন্দর মুখের দিকে ফ্যালফ্যাল ক'রে চেয়ে থাকে সে।

—"অমন ছুটে কোথায় যাচ্ছিস হরে?"—নন্দ প্রশ্ন করে।

তার কথার জবাব সহসা দিতে পারে না সে। বেশ কিছুক্ষণ সময় নিয়ে সে বলে—"কাজ আছে।"

নন্দ যেন কেমন গম্ভীর আর বিষণ্ণ। সে বলে—"আমাকে এতদিন পরে দেখেও খুসী হোসনি, তাই না ?"

হরেকেষ্ট কথা বলে না।

—"কোথায় ছিলাম জানিস ? বর্ডারের ওপারে জেলখানায়।"

হরেকেষ্ট বিস্মিত হয়। জেল খেটে এসেছে নন্দ ! এ জাতীয় লোক সে বেশী দেখেনি। গ্রামের খেতো-চোরই শুধু দু-তিনবার জেল খেটেছে। নন্দ খেতো-চোরের চেয়েও খারাপ। সে তো জেলে যাবেই।

—"চোরাই মাল চালান দিতে গিয়ে ধরা পড়েছিলাম।" ম্লান হাসে নন্দ।

—"গ্রামে ফিরছিস ?" হরেকেষ্ট এতক্ষণে বলে।

—"হ্যাঁ। আমাকে ঘেন্না করিস না ভাই। আমি সে নন্দ নেই।"

—"তোর তিনশো টাকা আমার কাছে আছে। নিয়ে নিস।" হরেকেষ্টর টাকার কথাই প্রথমে মনে হলো। পরের টাকা এভাবে রাখা কষ্টকর। প্রথম সুযোগে দিয়ে দিতে পারলে নিশ্চিন্ত।

—"ও টাকা জলে ফেলে দিস। অন্যায়ের টাকা থাকে না রে। আমি তোদের সাহায্যে দাঁড়াবো আবার। আমি ভালো হবো।"

হরেকেষ্ট বুঝতে পারে, নন্দর সত্যিই যেন পরিবর্তন হয়েছে—ঠিক আগের নন্দ আর নেই। তার এখনকার হাসি কত সরল, তার কথাবার্তা কত সুন্দর। নতুন মানুষ হয়ে ফিরেছে সে। বড় ভাল লাগে হরেকেষ্টর।

পেছনের অবগুন্ঠিতাকে দেখিয়ে নন্দ বলে—"ওকে বিয়ে করে আনলাম। ওপারের পুলিশরা আমাকে আবার বর্ডারেই ছেড়ে

দিয়ে গেল—যেখান থেকে ধরে নিয়ে গিয়েছিল। এপারে এসে আমি ওদের বাড়িতে উঠেছিলাম। সব জেনেশুনেও ও আমাকে বিয়ে করল।" কৃতজ্ঞতায় নন্দর চোখ ছল্‌ছল্‌ ক'রে ওঠে।

—আচ্ছা চলি ভাই। ভীষণ কাজ আছে। এতদিন পরে তোকে দেখেই শুধু দাঁড়িয়েছিলাম।" হরেকেষ্ট দৌড়োয়।

নন্দ আবার তাকে ডাকে। সে কাছে এলে নন্দ বলে—"ও তোর সংগে কথা বলবে।"

—"কে কথা বলবে?" হরেকেষ্ট বুঝতে পারে না।

নন্দ আঙুল দিয়ে নববধুকে দেখিয়ে দেয়।

নন্দর বউ তার সঙ্গে কেন কথা বলবে হরেকেষ্ট বুঝে উঠতে পারে না। বন্ধুকে হয়তো লজ্জা দিতে চায় নন্দ। লজ্জা পাবার মত মনের অবস্থা কি তার আছে? নন্দ তো জানে না, কী সর্বনাশ হ'য়ে গিয়েছে। সামনে নতুন বউ আছে বলেই সে বলেনি।

হরেকেষ্ট নন্দর কথায় বিশ্বাস না ক'রে চলতে সুরু করে।

—"জামাই, এদিকে একটু এসো।" অবগুণ্ঠিতা বলে। হরেকেষ্টর সামনে মাঠ-ঘাট বন-বাদার সব ঘুরতে সুরু করে। এমন একটা কিছু সে স্বপ্নেও কল্পনা করেনি। যন্ত্রচালিতের মত এক-পা এক-পা করে সে গাড়ির পেছনে গিয়ে দাঁড়ায়। সে বলে—"নন্দ বুঝি ঠাট্টা করছিল উমা?"

—"না জামাই, সত্যি বিয়ে করেছি। তোমার গ্রামের লোক যে।"

—"ও!"

—"খুদিকে চোখে চোখে রাখতে পারব। একেবারে

ছোট কিনা।"

—"ও, হ্যাঁ। খুদি একটু ছোটই বটে।" হরেকেষ্ট দাঁড়িয়ে থাকে।

—"জামাই—"

—"আমি চলি।"

—"দাঁড়াও।" উমা আঁচলে বাঁধা একটা জিনিস খুলে নিয়ে হরেকেষ্টর হাতে দিয়ে বলে—"এটা রাখো।"

—"কি আছে এর মধ্যে?"

—"কালী বাড়ির সিঁদুর! লক্ষ্মীকে দিও।"

হরেকেষ্ট বিস্ফারিত দৃষ্টিতে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থাকে। উমা এখনো কিছুই শোনেনি? সে খবর পাঠায় নি বলে কি হাটের মধ্যেও শ্বশুরের গাঁয়ের কোন লোক খবরটা জানতে পারেনি? এও বোধহয় স্বাধীন হবার ফল। আগেকার দিনে তো এমন কখনো হ'তো না। এখন গংগা আর পতিত হালদারের মেয়ের ঘটনার মত বর্ডারের এত সব চমকপ্রদ খবর হাটে গেলে শুনতে পাওয়া যায় যে, সাধারণ মৃত্যু-সংবাদ কেউ বলেও না, শোনেও না। এসব খবর খবরই না।

—"অমন চুপ করে দাঁড়িয়ে আছো কেন? উমা ঘোমটা সামান্য তুলে হরেকেষ্টর চোখের দিকে চেয়ে বলে।

হরেকেষ্ট সিঁদুরটা উমার কোলের উপর ফেলে দিয়ে বলে—"এ সিঁদুরের দরকার নেই উমা। লক্ষ্মীর মত মেয়েরা কখনো বিধবা হয় না।"

উমার মুখ ছাইয়ের মত সাদা হ'য়ে যায়। সে ধীরে ধীরে বলে—"তবু রাখো জামাই। অমন ক'রে বলতে নেই—ঠাকুরের

সিঁদুর। আমাকে ঘেন্না কর ব'লে কি ঠাকুরকেও ঘেন্না করবে ?"

হরেকেষ্ট চিৎকার করে ওঠে—"লক্ষ্মী মরেছে উমা, নীলু তাই পাগল হয়েছে। নন্দ একটু আয় ভাই, নীলু পালিয়েছে তাকে ধরতে হবে।"

হরেকেষ্টর কথা শুনে উমা পাথর হয়ে যায়। নন্দ বলে ওঠে—লক্ষ্মী নেই ?"

—"না।"

—"কি হয়েছিল ?"

—"জানিনে। তোর সাইকেলটা আছে ?"

—"না।"

—"না থাক, চল্, তুই তো ছুটতে পারিস। এপথে আর যাবো না, এদিকে নীলু গেলে তোরাই দেখতিস। শ্মশানের দিকে যেতে পারে। আয় নন্দ, আমি আর পারছি নে।"

নন্দ তবু বসে থাকে।

হরেকেষ্ট দেখে নন্দর চোখ দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ছে। সে তার হাত ধরে টেনে বলে—আসবি না ?"

নন্দ তার পায়ের কাপড় তুলে দেখায়। হরেকেষ্ট স্তম্ভিত হ'য়ে দেখে তার একটা পা নেই।

—"যদি পারতাম আজ আমি সবচেয়ে আগে ছুটতাম রে হরেকেষ্ট। নীলুর পায়ে ধরে ক্ষমা চাইতাম। লক্ষ্মীর কাছে তো চাওয়া হ'লো না।

—"এ কি ক'রে হ'লো ?"

—"ওপারের পুলিশের গুলি।"

হরেকেষ্ট রাস্তায় দাঁড়িয়ে নন্দর মাথাটা নিজের বুকের কাছে

টেনে নিয়ে বলে—"তুই বাড়ি যা নন্দ। কতদিন পরে এলি। আমি একাই যাই, নীলুকে ধরে আনি।"

সে এবার দৌড়োয় শ্মশানের রাস্তায়। উমা চেয়ে থাকে সেদিকে। নন্দও দেখে। তার বুকের ভেতরটা যেন পুড়ে যাচ্ছে—কেন অমন হচ্ছে কে জানে! বন্দুকের গুলি লাগলেও এত কষ্ট হয়নি। তার মনে হ'লো পুলিশের গুলি পায়ে না লেগে বুকে লাগলেই ভাল হ'তো।

নীলুকে শেষে সাগরখালির ধারে শ্মশানেই পাওয়া গেল। চিতার ওপর অজ্ঞান হ'য়ে পড়ে ছিল সে, আর হাতের দু-মুঠোয় ধরা ছিল চিতার কাঠকয়লা।

ধরাধরি করে বাড়িতে আনা হ'লো তাকে।

শ্রীমন্ত ডাক্তার বললেন—"ভয়ের কারণ নেই। তবে সদরে নিয়ে গিয়ে বড় ডাক্তার দেখালে ভাল হয়। সাবধানে না রাখলে এর থেকে অনেক সময় পাগল হয়ে যায় লোকে।"

ঠিক হ'লো, নন্দ পরদিন নীলুকে সদরে নিয়ে যাবে। সে ভাল চেনে সব। গরুরগাড়ি ঠিক করা হ'য়েছে। সিকি মাইল কাঁচা রাস্তার পরেই ঢালা পিচের রাস্তার ওপর দিয়ে সোজা চলে যাবে গরুর গাড়ি—কোন কষ্ট নেই, কোন ঝাঁকি নেই। নন্দ আরও ভাল ব্যবস্থার চেষ্টায় আছে। সে লোকের কাঁধে ভর দিয়ে গিয়েছে রাস্তার বাবুদের কাছে। কাজের মধ্যে অনেক লরী সদরে ফেরে, তার একটাতে যদি নীলুকে নিয়ে যেতে পারা যায়।

নীলুর বাড়ি থেকে হরেকেষ্ট নিজের বাড়িতে এলো। ভাত

রঁাধতে হবে। নীলু আর তার মায়ের ভাত নিয়ে গিয়ে খাইয়ে আসতে হবে। দুজনাই অসুস্থ। অবিনাশ আর বলাই ও-বাড়িতে রয়েছে।

সন্ধ্যা হ'য়ে আসে। বাড়ি পৌঁছোতেই ঝম্‌ঝম্‌ ক'রে বৃষ্টি সুরু হ'য়ে যায়। ভিজতে ভিজতে দাওয়ায় ওঠে হরেকেষ্ট।

খুদি ছুটে এসে বলে—"ওই দেখ, জল পড়ে পাতা নড়ে।"

বৃষ্টি পড়ছিল গাছের পাতায়, গাছের পাতা কেঁপে কেঁপে উঠছিল। হরেকেষ্ট ক্লান্ত হ'য়ে দাওয়ার ওপর বসে খুদির মত চেয়ে থাকে গাছের পাতার দিকে।

খুদি বলে—"দিদি কিছু জানে না।"

—"তোর দিদি এসেছিল?" সে ভাবে উমা বুঝি ইতিমধ্যে এসে ঘুরে গিয়েছে।

—"না, দিদি কি করে আসবে?" খুদি জানে না উমা এ গ্রামেরই বউ হ'য়ে এসেছে।

—"ও"—ভুল হ'য়েছিল হরেকেষ্টর; উমা তো নতুন বউ। নতুন বউ কি ইচ্ছে করলেই আসতে পারে? ওরকম ভাবাই অন্যায়। তার ওপর উমার পিসশাশুড়ী যে ফাতু পিসি।

সে আবার অন্যমনস্ক হয়। বৃষ্টি সমানে পড়ছে। বর্ষা আজ নিজেকে রিক্ত ক'রে দিয়ে এ-বছরের মত বিদায় নেবে।

খুদি আবার বলে—"দিদি কিছু জানে না।"

—"কেন রে?"

খুদি ঘর থেকে 'বর্ণ বোধ' নিয়ে আসে। হরেকেষ্টকে দেখায় কোথাও 'জল পড়ে' কথাটা লেখা নেই। শুধু লেখা রয়েছে 'পাতা নড়ে, ভাত বাড়।'

নিজে নিজে কখন পড়ে ফেলেছে সে।

হরেকেষ্টর নিজেরও ধারণা ছিল 'জল পড়ে' আর 'পাতা নড়ে' বুঝি পাশাপাশি লেখা রয়েছে। কিন্তু তা তো নয়। এ বই তো তারাও পড়েছে ছেলেবেলায়। তবে কি অন্য কোন বইএ রয়েছে? বিদ্যাসাগর মহাশয়ের 'বর্ণ পরিচয়ে?' বোধহয় তাই। কিংবা নাও থাকতে পারে। পণ্ডিতমশায় হয়তো কথা দুটো একসংগে বলতেন—তাই শিখেছে।

হরেকেষ্ট ভাবতে পারে না। ভাবার মত মন আর শরীরের অবস্থা নেই তার। সে খুবই ক্লান্ত।

বৃষ্টি আরও জোরে স্নুরু হয়। হরেকেষ্ট তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়ায়। বেশীক্ষণ বসে থাকলে উঠতে ইচ্ছে করবে না। হয়তো ঘুমিয়ে পড়বে। আর সে যদি ঘুমোয় খুদি কখনো ডাকবে না—না খেতে পেলেও নয়। সে জানে, হরেকেষ্ট পরিশ্রান্ত হ'লে ঘুমিয়ে পড়ে। সে জানে, পরিশ্রান্ত মানুষের ঘুম ভাঙাতে নেই।

ঘরের ভেতর প্রাণকেষ্টর হাঁপানীর টান শোনা যায়। কষ্ট হয় হরেকেষ্টর। বাবার কোন সেবাই সে করতে পারছে না। একা নির্জনে প'ড়ে রয়েছে—শেষ দিনের অপেক্ষায়—।